সুফিয়া কামালের জীবনদৃষ্টি ও সাহিত্যকর্ম

সালেহা সুলতানা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ফিল ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

সুফিয়া কামালের জীবনদৃষ্টি ও সাহিত্যকর্ম

গবেষক

সালেহা সুলতানা

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৫, শিক্ষাবর্ষ : ২০০৪-২০০৫

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ফিল ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

২০১৫

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
প্রসঙ্গ কথা		১
প্রস্তাবনা		২
প্রথম অধ্যায়	: সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত ও সুফিয়া কামালের জীবনদৃষ্টি	৩-২৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	: সুফিয়া কামালের সাহিত্যে জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন	২৯-১৯৬
প্রথম পরিচ্ছেদ	: কবিতা	২৯-৯৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	: গল্প	৯৯-১৩০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	: ভ্রমণবিষয়ক রচনা	১৩১-১৪৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	: আত্মজীবনীমূলক রচনা	১৪৬-১৬৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	: দিনপঞ্জিধর্মী রচনা	১৬৯-১৮০
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	: শিশুতোষ রচনা	১৮১-১৯৬
উপসংহার		১৯৭-১৯৯
গ্রন্থপঞ্জি		২০০-২০২

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পরিমণ্ডলে সুফিয়া কামাল এক উজ্জ্বল নাম। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রথাশাসিত সমাজ-ব্যবস্থায় বিবিধ প্রতিকূলতাকে জয় করে নারীর যোগ্য অবস্থান অর্জনে সমর্থ হয়েছেন সুফিয়া কামাল। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ যাপিত জীবনে একদিকে যেমন উদার ও পরিশীলিত মন নিয়ে সাহিত্য সাধনা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি ইস্পাত-কঠিন প্রত্যয়ে যুক্ত থেকেছেন নারী মুক্তি আন্দোলনে, মানবমুক্তির মিছিলে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এবং নানাবিধ অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে। তাঁর ব্যক্তিত্ব নক্ষত্রের দীপ্তিতে ভাস্বর। সুফিয়া কামালের সাহিত্যসাধনা ও কর্মপ্রবাহই আমার এ গবেষণাকর্মের অনুপ্রেরণা।

গবেষণাকর্মের সূচনা থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত প্রতি ধাপে যিনি আমাকে নিরন্তর তাগিদ ও কার্যকর নির্দেশনা প্রদান করেছেন তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন। তাঁর সস্নেহ পরিচর্যা, নিরন্তর উৎসাহ, বিদগ্ধ-পরামর্শ ও প্রাজ্ঞ নির্দেশনার কারণেই এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। এছাড়া অন্য যাঁরা আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন আমার পরিবারের সকল সদস্য, আমার প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান সহকর্মীবৃন্দ। এদের প্রত্যেককে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষত আমার স্বামী জনাব জাহাঙ্গীর আলমের [অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়] উদার সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতের জন্য আমি প্রধানত ব্যবহার করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার। এখানকার সংশ্লিষ্ট সবাই আমার প্রতি যে সহযোগিতা প্রদর্শন করেছেন সেজন্য সবাইকে ধন্যবাদ। বিশেষত অভিসন্দর্ভের মুদ্রণ কাজে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মী জনাব মোঃ সাইফুল হাসান শামীমকে।

পরিশেষে এ গবেষণাকর্মের মাধ্যমে সুফিয়া কামালের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছি।

সালেহা সুলতানা

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশের সাহিত্যে সুফিয়া কামালের নাম সুবিদিত। কেবল নারীমুক্তি আন্দোলনেই নয়, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেও তিনি বরাবরই ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। তাঁর মতো সনিষ্ঠ মানবসাধক আর সত্যসন্ধ ব্যক্তিত্ব আমাদের চেনা ভূগোলে দুর্লভ। রাজপথে যেমন, ঠিক তেমনি সাহিত্যসাধনায়ও তিনি ছিলেন নিরলস। বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তাঁর অবস্থান ছিল পুরোভাগে। একদিকে তিনি যেমন রাজপথে থেকে বিপুল বাঙালিকে তাদের দুর্যোগে-দুঃসময়ে সাহস জুগিয়েছেন অন্যদিকে ঠিক তেমনি সাহিত্যরচনার মাধ্যমে তাদের মানসক্ষুধা নিবৃত্ত ও পরিতৃপ্ত করেছেন। কবিতা, গল্প, শিশুছড়া, ভ্রমণ, দিনপঞ্জি কিংবা আত্মজীবনীমূলক রচনার মধ্য দিয়ে বাঙালির সারস্বত সমাজে তিনি নির্মাণ করেছেন তাঁর সুদৃঢ় আসন। তাঁর সাহিত্যকর্ম মানে ও পরিমাণে বেশ সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের সাহিত্যে তাঁর প্রকৃত অবস্থান নির্ণয়ের প্রয়োজন থেকে আমি *সুফিয়া কামালের জীবনদৃষ্টি ও সাহিত্যকর্ম* শিরোনামের এই এম ফিল গবেষণা-প্রকল্প গ্রহণ করেছি।

সুফিয়া কামালের জীবনদৃষ্টি ও সাহিত্যকর্ম দুটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। এর প্রথম অধ্যায় 'সমকালীন প্রেক্ষাপট ও সুফিয়া কামালের জীবনদৃষ্টি'। এ-অধ্যায়ে সুফিয়া কামালের সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, সেইসঙ্গে পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে তিনি কীভাবে বেড়ে উঠেছেন তা সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপিত হয়েছে। সমকালীন নারীসমাজে সুফিয়া কামাল কেন ব্যতিক্রমধর্মী, তার কার্যকারণও বিশ্লেষিত হয়েছে এ-অধ্যায়ে।

অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায় 'সুফিয়া কামালের সাহিত্যে জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন'। এ-অধ্যায়টি ছয়টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হয়েছে। এর প্রথম পরিচ্ছেদে কবিতা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গল্প, তৃতীয় পরিচ্ছেদে ভ্রমণবিষয়ক রচনা, চতুর্থ পরিচ্ছেদে আত্মজীবনীমূলক রচনা, পঞ্চম পরিচ্ছেদে দিনপঞ্জিধর্মী রচনা এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শিশুতোষ রচনার বিষয় ও শিল্পমান সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। সুফিয়া কামাল যে সাহিত্যের বিষয়-নির্বাচনে ও বয়নবিন্যাসে কতবেশি সতর্ক ও যত্নবান ছিলেন তা এ-অধ্যায়ের আলোচনার মাধ্যমে জানা যাবে।

এই অভিসন্দর্ভের সর্বশেষ অংশ 'উপসংহার'। এ-অংশে সুফিয়া কামালের জীবন ও সাহিত্যকর্মের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদর্শিত হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের পরিশেষে যুক্ত হয়েছে গ্রন্থপঞ্জি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত ও সুফিয়া কামালের জীবনদৃষ্টি

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় দুইশত বছরের ইংরেজ-শাসনে ভারতবর্ষের জনগণ নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে নিক্ষিপ্ত হয়। বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় মুসলিম সম্প্রদায় সমর্পিত হয় জটিলতর সমস্যায়। এর নেপথ্যে ক্রিয়াশীল ছিল ১৭৫৭ সালের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পট-পরিপ্রেক্ষিত। বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। অতঃপর শাসনক্ষমতা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে অর্পিত হয় ইংরেজদের হাতে। এ পরিস্থিতিতে দুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু সম্প্রদায় নির্দ্বিধায় ইংরেজদের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। কারণ তাদের দৃষ্টিতে মুসলিম শাসকরা যেমন ছিলেন বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী ও বিধর্মী, ইংরেজরাও ঠিক তদ্রূপ। সুতরাং প্রায় পাঁচশ বছরব্যাপী যদি মুসলমান শাসকদের সহযোগিতা করা যায় তবে ইংরেজদের সহযোগিতা দোষের হতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজদের কাছ থেকে ব্যাপক আনুকূল্য অর্জনে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায় সিরাজউদ্দৌলার পতনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে নিজেদের পতন; এবং ইংরেজদের প্রতি পোষণ করে বিরূপ মনোভাব। যার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজরা এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে যা প্রকৃতপক্ষে হয়ে উঠে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিকূল।

বিশেষত ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং ১৮২৮ সালের লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত আইন প্রভৃতি মুসলিম স্বার্থের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিদ্রোহও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈরিতা সৃষ্টি করে। তিতুমিরের বিদ্রোহ (১৮৩০), ওয়াহাবি (১৮২৬-১৮৭০), ফরায়জি (১৮২৮-৩০) প্রভৃতি আন্দোলন এবং ১৮৫৭ সালের অসফল সিপাহি বিদ্রোহ শাসক শ্রেণীর সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানরা চরম হতাশায় নিমজ্জিত হয়। ১৮৩৭ সালে ফারসি ভাষার স্থলে ইংরেজি ভাষা সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করলে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র চাকুরিজীবী মুসলমানদের জীবিকার পথ বন্ধ হয়ে যায়। ইংরেজ আমলে বিরাজিত এই বিরূপ-পরিবেশে মুসলমানরা ভূমি ও চাকরি হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। ইংরেজ-বিমুখ মুসলমানরা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আলো হতে নিজেদের বঞ্চিত করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে ইংরেজ-প্রবর্তিত পদক্ষেপ সমাজ-কাঠামোয় পরিবর্তনের সূচনা করে। বিশেষত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজে উদ্ভূত হয় নতুন ধনিক-বনিক শ্রেণি। নবজাগরণের ঢেউ লাগে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে। এই হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিদেশি শাসকদের ছত্রচ্ছায়ায় স্বীয় স্বার্থে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাকরিক্ষেত্রে উপযুক্ত পদে

পদায়নের অভিপ্রায়ে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করে এবং হয়ে ওঠে সরকারের সহযোগী। মুসলিমরা সে পথে অগ্রসর না হয়ে আত্মাভিমানে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখে এবং অনেকটাই পিছিয়ে যায়। কলকাতা এবং এর আশপাশের এলাকায় এই হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ১৮১৭ সালে স্থাপিত হয় হিন্দু কলেজ। হিন্দু কলেজের শিক্ষা, ডেভিড হেয়ার-ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ প্রভাব, পাশ্চাত্য দর্শন ও ভাবধারার সাথে রাজা রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম এবং সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব প্রভৃতির সমন্বয়ে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে গড়ে ওঠে একটি জ্ঞানালোকিত গোষ্ঠী। আর এই গোষ্ঠীই ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাব-বিপ্লব বা নবজাগরণের প্রণেতা। এই জাগরণমূলক কর্মকাণ্ডে মুসলমানদের কোন ভূমিকাই ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সমাজ সংস্কারক হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং কয়েকজন দূরদর্শী ব্যক্তিত্বের অবদান স্মরণীয়। সাহিত্যক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং যোগ করেন নতুন মাত্রা। মুসলমানদের সচেতন-উন্মেষের অঙ্কুরোদ্‌গম ঘটে সে সময় থেকে। ১৮৬১ সালে দিলওয়ার হোসেন আহমদ নামে প্রথম একজন বাঙালি মুসলমান হুগলি কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। ১৮৭১ সালে মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কে সরকারি সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়। মুসলিম সম্প্রদায় সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি অসহযোগিতা প্রদর্শন করছে– এ জন্য লর্ড মেয়ো দুঃখ প্রকাশ করেন।[১]

১৮৭৩ সালে পৃথক আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থায় মুসলিম ছাত্রদের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। অতঃপর প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের সাথে প্রতিযোগিতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে মুসলমানরাও ধীরে ধীরে আত্মসচেতন হয়ে ওঠে এবং ইংরেজি শিক্ষায় মনোনিবেশ করে। অবশ্য এ পর্যায়ে নারী-শিক্ষার ব্যাপারে মুসলমান সমাজে কোনো ভাবনাই তৈরি হয়নি।

প্রাগ্রসর বাঙালি হিন্দুসমাজ নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেও প্রাথমিক-পর্যায়ে নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হতে হয়। নারীশিক্ষার পক্ষ ও বিপক্ষ শক্তির তর্ক-বিতর্কে মুখর হয়ে ওঠে তখনকার সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রগুলো। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো– সমাচার দর্পণ, সম্বাদ প্রভাকর, জ্ঞানান্বেষণ, এনকোয়ারার, বেঙ্গল স্পেক্টেটর, তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি। অবশ্য হিন্দু নারীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার একক কৃতিত্বের দাবিদার কেউ ছিলেন না; সম্মিলিত উদ্যোগেই এ প্রয়াস এগিয়ে যায়। এক্ষেত্রে মিসেস উইলসন (মিস কুক), মিস মেরি কার্পেন্টারসহ গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দক্ষিণারঞ্জন

[১] মোহাম্মদ আজিজুল হক, *বাংলাদেশের মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা* (***History & problems of Muslem Educataion in Bengla, 1971***) মুস্তাফা নুরউল ইসলাম অনূদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৬৯, পৃষ্ঠা-২৩

মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ প্রমুখ ব্যক্তিত্বের অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়া 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' পুস্তক প্রকাশও এক্ষেত্রে পালন করে সহায়ক ভূমিকা।

অথচ মুসলিম নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ পদাতিকের মতো একাই যিনি লড়াই করেছেন– তিনি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)। তবে রোকেয়াও এই শিক্ষা বিস্তার প্রক্রিয়ায় প্রথম উদ্যোক্তা নন। রোকেয়ার জন্মের সাত বছর আগে ১৮৭৩ সালে কুমিল্লায় পশ্চিমগাওয়ের জমিদার ও বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণীর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অর্থানুকূল্যে স্থাপিত হয় ফয়জুন্নেছা গালর্স স্কুল। কুমিল্লা ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য কালীচরণ দে ছিলেন স্কুল স্থাপনার কাজে ফয়জুন্নেছার প্রধান সহযোগী। এ-সব প্রক্রিয়ার পূর্বে ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মুসলিম নারীদের শিক্ষার প্রয়োজনে নানাবিধ উদ্যোগ গৃহীত হয়। এসব জানা যায় বিনয় ঘোষের "বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ" গ্রন্থের 'স্ত্রীশিক্ষা' পরিচ্ছেদে :

> ১৮২২ সালে মিস কুক যখন কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছিলেন, তখন শ্যামবাজার অঞ্চলের একজন মুসলমান মহিলা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাঁর কাজে সাহায্য করছিলেন। তিনি নিজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিদ্যালয়ের জন্য বালিকা সংগ্রহ করেছিলেন এবং নিজ পাড়ায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন। তাঁর উৎসাহের জন্যই পরে স্কুলটির বেশ উন্নতি হয়েছিল এবং ছাত্রী সংখ্যাও বেড়েছিল। একজন মুসলমান মহিলার পক্ষে ১৮২২ সালে স্ত্রীশিক্ষার জন্য এই ধরনের উৎসাহ প্রকাশ করা অনেকের কাছে নিশ্চয়ই বিস্ময়কর বলে মনে হবে। কলকাতা শহরের মুসলমান পুরুষরাই যখন ইংরেজদের প্রবর্তিত নতুন শিক্ষাদীক্ষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখাননি, তখন একজন মুসলমান মহিলার পক্ষে একজন খ্রীষ্টান মহিলার প্রচারিত স্ত্রীশিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া নিশ্চয় একটি বিস্ময়কর ঘটনা। শুধু তাই নয়, একজন মুসলমান মহিলা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, মুসলমান নারীর শিক্ষার উদ্যোগে এটা আরও বিস্ময়কর বলে মনে হয়। এছাড়া মির্জাপুর, এন্টালি, জানবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের স্থানীয় মুসলমানরাও দেখা যায়, মিস কুকের (মিসেস উইলসনের) স্ত্রী শিক্ষার আদর্শে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং এইসব অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছিলেন। এগুলি সবই সত্য ঘটনা, কিন্তু এদেশে শিক্ষার ইতিহাসের বিশাল বিশাল মহাগ্রন্থের পৃষ্ঠায় কোথাও এদের স্থান দেওয়া হয়নি।[১]

নারীশিক্ষার প্রাথমিক উদ্যোগ-পর্বে নানা প্রকার পারিতোষিকের ব্যবস্থা থাকায় নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলিম মেয়েরা এসব স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করে। মুসলমান সম্ভ্রান্ত-অভিজাত ও ভদ্রঘরের নারীরা এসব স্কুলে অংশগ্রহণ করতো না। মূলত পারিতোষিকের প্রত্যাশায় অনেক ছাত্রী লেখাপড়া বা হাতের কাজ শেখায় আগ্রহী হতো। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মুসলিম পুরুষরা ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নারীশিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে। ফলে মুসলিম মেয়েরা বাংলা ও

[১] বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, প্রথম ওরিয়েন্ট লংম্যান সংস্করণ, কলকাতা ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ২১৩-২১৪

ইংরেজি চর্চার সুযোগ পায়। ১৯০১ সালের আদমশুমারির রিপোর্টে প্রায় ৪০০ জন ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিম মহিলার কথা জানা যায়। এ প্রসঙ্গে মুসলমান সম্পাদিত সাময়িকপত্র 'মিহির ও সুধাকর' মন্তব্য করে :

> আমরা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই ১৯০১ সালের আদমশুমারী আমাদের নিকট ৪০০ (চারিশত) মুসলমান স্ত্রী লোকের ইংরেজি শিক্ষার কথা প্রচার করিবে। একথা প্রচারিত হওয়ার পর আমাদের কর্তব্য কি? যদি অন্তঃপুরে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন সম্ভব, তবে স্কুল উত্থাপন করিয়া বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে আপত্তি কি? যে সব মুসলমান বালিকার প্রবেশাধিকার আছে, তথায় তাহাদের ইংরেজী শিক্ষা প্রদানে ক্ষতি কি? কলিকাতার বেথুন স্কুলে মুসলমান বালিকার প্রবেশাধিকার নাই। বিশেষ আমাদের বালিকা মাদ্রাসাগুলিতে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে সর্বোৎকৃষ্ট হয়।[১]

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রতিষ্ঠিত স্কুলটিতে বাঙালি-অবাঙালি নির্বিশেষে মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র পরিবারের মেয়েরাই ছাত্রী ছিল। রোকেয়া মুসলিম নারী-শিক্ষা স্থাপনায় অবিস্মরণীয় এই কারণে যে, এই স্থাপনায় তিনি একাই ছিলেন, তাঁর পাশে সহযোগী হিসেবে কেউ দাঁড়াননি। হিন্দু নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রটি ছিল এর বিপরীতধর্মী। রোকেয়া একাকী এ পথে হেঁটেছেন এবং সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। সামাজিক অপবাদ-নিন্দা ও রক্ষণশীল মনোভাবাপন্নদের অবিশ্বাস, সন্দেহ কটূক্তি ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। এ প্রসঙ্গে তাঁর স্মৃতিচারণমূলক স্বীকারোক্তি:

> আমি কারসিয়ং ও মধুপুর বেড়াইতে গিয়া সুন্দর সুদর্শন পাথর কুড়াইয়াছি : উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে সাগরতীরে বেড়াইতে গিয়া বিচিত্র বর্ণের বিবিধ আকারের ঝিনুক কুড়াইয়া আনিয়াছি। আর জীবনের ২৫ বৎসর ধরিয়া সমাজসেবা করিয়া কাঠমোল্লাদের অভিসম্পাত কুড়াইতেছি .....।[২]

মুসলিম নারী সমাজের জন্য গভীর দরদ এবং কর্তব্যবোধ থেকেই রোকেয়া নারীশিক্ষার প্রচলন করেন। নারী কেবল পুরুষের আজ্ঞাবহ দাস নয়, নারী তার স্বীয় মেধা ও কর্মে পুরুষের ন্যায় স্বাবলম্বী হওয়ার যোগ্যতা রাখে– এই সত্যকে রোকেয়া হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি সবার আগে নারীর শিক্ষাকেই একমাত্র প্রয়োজনীয় কর্তব্য বিবেচনা করেন। শিক্ষা কেবল স্বামী, সন্তান, সংসারের জন্য নয় বরং নারীর আত্মোন্নয়নের জন্য– এ সত্য তিনি মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছেন।

এক আবদ্ধ ও অবরুদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থায় আবর্তিত হয়েছে রোকেয়ার শৈশব ও কৈশোর। যেখানে কন্যার নিকট পিতা ছিলো অবরুদ্ধ, অবিবাহিত মেয়েদের নিকট অপরিচিত নারীরাও ছিলো অবরুদ্ধ। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া এবং বাড়ির দাসী ব্যতীত সবার সামনেই পর্দা করার নিয়ম চালু

---

[১] উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৬৯, পৃষ্ঠা-৫২

[২] 'নিবেদন', অবরোধ বাসিনী, উদ্ধৃত, আবদুল কাদির (সম্পা.), *রোকেয়া রচনাবলী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা-৪৭১

ছিল নারীদের ক্ষেত্রে। বাংলা ও ইংরেজি ছিল নিষিদ্ধ। কেবল উর্দু ও আরবিতেই শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হতো। রন্ধনবিদ্যা, সূচিকর্মের মধ্য দিয়ে নারীর যোগ্যতা যাচাই করা হতো। প্রকৃত শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হতো মেয়েদের। রোকেয়ার ভাষ্য :

> আমাদের জন্য এদেশের শিক্ষার বন্দোবস্ত সচরাচর এইরূপ– প্রথমে আরবীয় বর্ণমালা, অতঃপর কুরআন শরীফ পাঠ। কিন্তু শব্দগুলির অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হয় না, কেবল স্মরণশক্তির সাহায্যে টিয়াপাখির মত আবৃত্তি কর। কোন পিতার হিতৈষণার মাত্রা বৃদ্ধি হইলে, তিনি দুহিতাকে "হাফেজা" করিতে চেষ্টা করেন। সমুদয় কোরাণ খানি যাঁহার কণ্ঠস্থ থাকে, তিনিই "হাফেজ"। আমাদের আরবী শিক্ষা ঐ পর্য্যন্ত! পারস্য এবং উর্দু শিখিতে হইলে, প্রথমেই "করিমা ববখশা এবর্ হালেমা" এবং একেবারে (উর্দ্দু) "বানাতন নাস্" পড়। একে আকার ইকার নাই, তাতে আবার আর কোন সহজ পাঠ্য পুস্তক পূর্বে পড়া হয় নাই সুতরাং পাঠের গতি দ্রুতগামী হয় না। অনেকের ঐ কয়খানি পুস্তক পাঠ শেষ হওয়ার পূর্বেই কন্যা-জীবন শেষ হয়। বিবাহ হইলে বালিকা ভাবে, "যাহা হোক, পড়া হইতে রক্ষা পাওয়া গেল!" কোন কোন বালিকা রন্ধন ও সূচিকর্ম্মে সুনিপুণা হয়। বঙ্গদেশেও বালিকাদের রীতিমত বঙ্গভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। কেহ কেহ উর্দ্দু পড়িতে শিখে, কিন্তু কলম ধরিতে শিখে না। ইহাদের উন্নতির চরম সীমা সলমা চুমকির কারুকার্য্য, উলের মোজা ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা পর্য্যন্ত।[১]

বড় বোন করিমুন্নেসার বাংলা-পাঠে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল বিধায় তাঁকে রোকেয়ার পরিবার বলিয়াদিতে মাতামহের বাড়িতে পাঠিয়ে বিবাহের ব্যবস্থা করে। এরকম একটি পরিবারে রোকেয়ার জ্ঞান-অর্জনের পথ ছিল যথার্থই দুর্গম; বাধা ছিল প্রতিপদে। তবে এই দুর্গম পথযাত্রায় সহায়ক ভূমিকা রেখেছিলেন বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের ও বড় বোন করিমুন্নেছা। তাঁদের অনুপ্রেরণা ও সাহচর্যই রোকেয়ার মনোভূমিতে বপন করে প্রকৃত 'মানুষ' হিসেবে বেঁচে থাকার বীজ। কৃতজ্ঞ-রোকেয়া ভাই ও বোনের এ অবদানের কথা স্মরণ করেছেন বার বার :

ক. দাদা! আমি আশৈশব তোমার স্নেহ-সাগরে ডুবিয়া আছি। আমাকে তুমিই হাতে গড়িয়া তুলিয়াছ। আমি জানি না, পিতা, মাতা, গুরু, শিক্ষক কেমন হয়, আমি কেবল তোমাকেই জানি।[২]

খ. আপাজান! আমি শৈশবে তোমারই স্নেহের প্রসাদে বর্ণ-পরিচয় পড়িতে শিখি। অপর আত্মীয়গণ আমার উর্দু ও ফারসী পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাঙ্গালা পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। একমাত্র তুমিই আমার বাঙ্গালা পড়ার অনুকূলে ছিলে। আমার বিবাহের পর তুমিই আশঙ্কা করিয়াছিলে যে, আমি বাঙ্গালা ভাষা একেবারে ভুলিয়া যাইব।[৩]

---

[১] হারুনার রশিদ ভূঁইয়া (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, *বেগম রোকেয়া রচনাসমগ্র*, হাসি প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৪, পৃষ্ঠা-৩৯

[২] উৎসর্গ-পত্র, পদ্মরাগ,উদ্ধৃত, আবদুল কাদির (সম্পা.), *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩১৯

[৩] উৎসর্গ-পত্র, মতিচুর, দ্বিতীয় খণ্ড, উদ্ধৃত, আবদুল কাদির (সম্পা.), *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৬

গ. আমাকে সাহিত্য-চর্চায় তিনিই (করিমুন্নেসা) উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। বলিতে কি, তিনি উৎসাহ না দিলে এবং আমার শ্রদ্ধেয় স্বামী অনুকূল না হইলে আমি কখনই প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে লিখিতে সাহসী হইতাম না।[১]

শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়েই রোকেয়া উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন নারীর প্রকৃত মুক্তি এর মাঝেই নিহিত। বিবাহোত্তরপর্বে এই শিক্ষা গ্রহণের অন্তরায় হিসেবে স্বামী যেন দাঁড়াতে না পারে সে আশঙ্কা থেকেই বেগম রোকেয়া সম্মত হয়েছিলেন সাখাওয়াত হোসেনের মতো একজন বয়স্ক, বিপত্নীক, উদারমনা ব্যক্তিকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে। এই মহানুভব ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে বিকশিত হবার পথ পেয়েছিল রোকেয়ার আদর্শিক-চেতনা। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, দেশের অপরিহার্য-অংশ নারীকে কিংবা জনসংখ্যার অর্ধাংশকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রেখে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। তৎকালীন সমাজের এই কূপ-মণ্ডুক ধারণাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার প্রত্যয়ে তিনি লড়াই করেছেন। আর এই লড়াইয়ে তাঁকে সহযোগিতা করেছেন স্বামী খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন (১৮৫৮-১৯০৯)। সাখাওয়াত হোসেনের মৃত্যুর পর স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলের নামকরণ করেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল'। রোকেয়ার এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পূর্বে মেয়েদের জন্য আরো স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন অন্তত চারজন মহিলা। সম্পূর্ণরূপে উর্দু-মাধ্যমের এই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে বাঙালি-অবাঙালি নির্বিশেষে সকলেই পড়তে আসত। সে সময় উর্দু ভাষাই ছিল মুসলমান সমাজে অভিজাতভাষা। এই স্কুলের গুরুত্ব এবং রোকেয়ার কৃতিত্ব এখানেই যে– এই স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই তিনি নারীমুক্তি ও জাগরণের স্বপ্ন-প্রেরণা পেয়েছেন এবং এই স্কুলে পাঠদানের মাধ্যমে নির্মাণ করেছেন অসংখ্য নারী কর্মী যাঁরা পরবর্তীকালে রোকেয়ার পথ অনুসরণ করে নারী জাগরণ ও প্রগতির ক্ষেত্রে উলেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, এবং স্কুলকে কেন্দ্র করেই তাঁর কর্মপ্রবাহ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। এই স্কুলের জন্য তিনি গ্রীষ্মাবকাশে স্কুল-সংক্রান্ত রাশিকৃত **Office work** করার জন্য চাচাতো বোন মরিয়ম রশীদের কাছে শুধু বোম্বাই বেড়াতে যেতে অস্বীকৃতি নয়, বেহেস্তের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তাঁর নিজের ভাষায়–**For this girl's school and this school alone I left Bhagalpur ;** রোকেয়ার মৃত্যুর পর কবি গোলাম মোস্তফা "দুঃসাহসিকা' কবিতায় রোকেয়ার এই স্কুলকে মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র বলে অভিহিত করেন। তিনি লিখেছেন–

বাংলার যদি কোথাও মোদের তীর্থ ক্ষেত্র থাকে সে হবে তোমার এই মন্দির রেখে গেলে তুমি যাকে।[২]

স্কুল পরিচালনার পাশাপাশি রোকেয়া নিজেকে নিয়োজিত করেন সাহিত্য-সাধনায়। তাঁর লেখনি মূলত, সমাজকল্যাণের স্বার্থে; ঘুমন্ত নারীসত্তাকে জাগানোর অভিপ্রায়ে। সে সময় মীর মশাররফ

[১] 'লুকানো রতন', করিমুন্নেছা খানম সাহেবা' উদ্ধৃত, আবদুল কাদির (সম্পা.), *রোকেয়া রচনাবলী*, বাংলা একাডেমি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৮৮
[২] বেবী মওদুদ সম্পাদিত, *নারী নেতৃত্ব*, পারিজাত প্রকাশনী, ঢাকা, ১৪১৮, পৃষ্ঠা-১৩

হোসেনসহ শেখ আব্দুর রহিম, মোজাম্মেল হক, কায়কোবাদ, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মতীয়র রহমান, সৈয়দ এমদাদ আলী, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, কাজী ইমদাদুল হক, শেখ ফজলুল করিম, নওশের আলী খান ইউসফজী, আবদুল করিম প্রমুখ বিশিষ্ট মুসলমান লেখক বাংলা সাহিত্যজগতে সক্রিয় ছিলেন। নারী লেখকদের লেখা ছাপা হতো 'নবনুর' পত্রিকায়। পত্রিকাটি মুসলমানের সম্পাদিত পত্রিকা। রোকেয়া এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন এবং ১৯০৩ সালে প্রকাশিত এ পত্রিকাটিতে তাঁর সর্বাধিক লেখা ছাপা হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয়ই লেখক হিসেবে সমাদৃত হয়েছে পত্রিকাটিতে। 'নবনুর' পত্রিকার পর 'সওগাত' (১৯১৮) পত্রিকা প্রকাশিত হলে রোকেয়ার লেখা সেখানেও মুদ্রিত হতো। তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে 'নবনুর' প্রগতিশীল পত্রিকা এবং এর প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় পত্রিকার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে মুসলিম-শক্তিকে জাগ্রত হবার আহ্বান জানানো হয়। রোকেয়ার পূর্বেও কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি সমাজ-উন্নতির স্বার্থে নারীশিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। যেমন কাজী ইমদাদুল হক 'নবনুর' পত্রিকার ১৩১০ সালের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় বলেছেনঃ

> এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, শিক্ষা বিস্তার না হইলে আমাদের কোনক্রমে উন্নতি লাভ করিবার আশা নাই। বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার সত্বর না হইলে আর উপায় নাই। ... এক্ষণে মুসলমান যুবকবৃন্দের নিকট এই অনুরোধ যে, সমাজে যাহাতে শিক্ষার বিস্তার হয়, এবং স্ত্রীলোকগণ যাহাতে সুশিক্ষা বঞ্চিত না হয়, তারই জন্য যেন তাহারা আপনাপন শক্তি সর্বতোভাবে নিয়োজিত করেন।[১]

ইতঃপূর্বে ১৮৬৫ সালের মার্চ সংখ্যায় 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় (সম্পাদক : উমেশচন্দ্র দত্ত) 'বিবি শ্রীমতী' তাহেরননেছা নামক জনৈক মুসলমান মহিলার একটি পত্র মুদ্রিত হয়। এ পত্রে তিনি সম্পাদককে নারীশিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে লেখেন :

> যদি এই ধরাধামকে আপনাদের প্রকৃতই সুখধাম দেখিতে ইচ্ছা থাকে তবে অগ্রে আপনাদের স্ত্রীগণকে বিদ্যা ভূষায় ভূষিত করিতে চেষ্টা পান।[২]

বেগম রোকেয়ার 'মতিচূর' (১ম খণ্ড) গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় আটাশ বছর পূর্বে (১৮৭৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি) ঢাকা থেকে নওয়াব ফয়জুন্নেছার (ফএজন্নেসা) ৪৭৫ পৃষ্ঠার গদ্য-পদ্য মিশ্রিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'রূপজালাল' প্রকাশিত হয়। এ সময় প্রকাশিত হয় শ্রীমতী রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন'।

বেগম রোকেয়ার পূর্ববতী লেখকগণ সমাজ-শৃঙ্খল ভাঙার অভিপ্রায়ে তাঁদের লেখনি পরিচালিত করেছেন সত্য, তবে সমাজের প্রতি 'প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রচনা' নির্মাণে মুসলমানদের সারিতে বিশিষ্ট আসন স্থাপনায় রোকেয়া 'পথিকৃৎ' হিসেবে বিবেচিত। নারীমুক্তিই রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের আদর্শ। নারীমুক্তি অর্থে তিনি মূলত 'মানুষ' হিসেবে নারীর মূল্যায়নের কথাই বলেছেন। হিন্দু-

---

[১] উদ্বৃত, মোরশেদ শফিউল হাসান, *বেগম রোকেয়া : সময় ও সাহিত্য,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৮২, পৃষ্ঠা ১৭-১৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -১৮

মুসলিম খ্রিষ্টান নির্বিশেষে সবাই যে নারীকে কেবল 'আজ্ঞাবহ দাস' কিংবা 'মূর্তীমতী কবিতা' কিংবা 'বঞ্চিত প্রতিনিধি' হিসেবেই নারীকে অঙ্কন করেছেন এবং তা যে নারীর জন্য আদৌ সম্মানজনক ছিল না, এ সত্য তিনি বারবার উচ্চারণ করেছেন। রামায়ণের রাম-সীতার দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্রাঙ্কনের মধ্যে তিনি মূলত নারীর অপদশাই প্রত্যক্ষ করেছেন। 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন–

ক. নারীকে শিক্ষা দিবার জন্য গুরুলোকে সীতাকে আর্দশরূপে দেখাইয়া থাকেন। ... কিন্তু রাম সীতার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, একটি পুতুলের সঙ্গে কোন বালকের যে সম্বন্ধ, সীতার সঙ্গে রামের সম্বন্ধও প্রায় সেইরূপ। ... রামচন্দ্র স্বামীত্বের ষোলআনা পরিচয় দিয়াছেন। আর সীতা?– কেবল প্রভু রামের সহিত বনযাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারও ইচ্ছা প্রকাশের শক্তি আছে।[১]

খ. খ্রীষ্টিয়ান সমাজে যদিও স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট সুবিধা আছে, তবু রমণী আপন স্বত্ব ষোল আনা ভোগ করিতে পায় না। ... স্বামী যখন ঋণজালে জড়িত হইয়া ভাবিয়া ভাবিয়া মরমে মরিতেছেন, স্ত্রী তখন একটা নূতন টুপীর (**Bonnet** এর) চিন্তা করিতেছেন। কারণ তাঁহাকে কেবল মূর্তিমতী কবিতা হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে ...। ঋণদায়রূপ গদ্য (**Prosaic**) অবস্থা তিনি বুঝিতে অক্ষম।[২]

গ. মুসলমানের মতে আমরা পুরুষের "অর্দ্ধেক" অর্থাৎ দুইজন নারী একজন নরের সমতুল্য। ... আপনারা "মহম্মদীয় আইনে" দেখিতে পাইবেন যে, বিধান আছে, পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্ধেক ভাগ পাইবে। এ নিয়মটি কিন্তু পুস্তকেই সীমাবদ্ধ। যদি আপনারা একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোন ধনবান মুসলমানের সম্পত্তি বিভাগ করা দেখেন, কিম্বা জমীদারী পরিদর্শন করিতে যান, তবে দেখিবেন কার্যতঃ কন্যার ভাগে শূন্য (০) কিংবা যৎসামান্য পড়িতেছে। ... যিনি পুত্রের সুশিক্ষার জন্য চারি জন শিক্ষক নিযুক্ত করেন, তিনি কন্যার জন্য দুইজন শিক্ষয়িত্রী করেন কি? যেখানে পুত্র তিনটা (বি. এ পর্যন্ত) পাশ করে, সেখানে কন্যা দেড়টা পাশ (এন্ট্রান্স পাশ ও এফ. এ. ফেল্) করে কি? পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় না, বালিকাদের বিদ্যালয় সংখ্যায় পাওয়াই যায় না। যে স্থলে ভ্রাতা 'শমস্-উল-ওলামা' সে স্থলে ভগিনী 'নজম্-উল্-ওলামা' হইয়াছেন কি?[৩]

রোকেয়া মনে করেন, সংসারে পুরুষের মুখাপেক্ষিতাই নারীকে শারীরিকভাবে দুর্বল ও মানসিক দিক থেকে আত্মবিশ্বাসহীন করে চরম অবনতির পথে ধাবিত করে, তবে এই অবনতির কারণ নির্ণয়ে তিনি পুরুষের অনুদার, রক্ষণশীল মনোভাবকে দায়ী করেন। পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে তিনি প্রত্যাশা করেছেন নারীর অধিকারের স্বীকৃতিকে। রক্ষণশীল পুরুষ সমাজের কূপ-মণ্ডুক ধারণা পরিহার করে সত্য ও যুক্তি-নির্ভর পন্থায় নারীকে 'প্রভু বা স্বামী' হিসেবে নয়, প্রকৃত বন্ধু বা 'সহযোগী' হিসেবে সমাজ উন্নয়নের স্বার্থে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন রোকেয়া। মুসলমান সমাজের অবনতির মূল কারণগুলোকে তিনি চিহ্নিত করেছেন

[১] হারুনার রশিদ ভূঁইয়া(সম্পা.), *বেগম রোকেয়া রচনাসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৫
[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮
[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯

এবং তার সমাধানের পন্থাও তিনি প্রদর্শন করেছেন। বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও তথ্য পরিবেশনায় প্রকৃতি ও সমাজজীবনের উদাহরণ সহযোগে প্রমাণ করেছেন নারী ও পুরুষের সাম্য ও সৌহার্দ্যের ক্ষেত্রটিকেঃ

ক. স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্বলতাবশতঃ নারীজাতি অপর জাতির সাহায্যে নির্ভর করে। তাই বলিয়া পুরুষ "প্রভু" হইতে পারে না। কারণ জগতে দেখিতে পাই, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট কোন না কোন প্রকার সাহায্য প্রার্থনা করে, যেন একে অপরের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না। তরুলতা যেমন বৃষ্টির সাহায্য প্রার্থী, মেঘও সেইরূপ তরুর সাহায্য চায়। জল বৃদ্ধির নিমিত্ত নদী বর্ষার সাহায্য পায়, মেঘও আবার নদীর নিকট ঋণী। তবে তরঙ্গিনী কাদাম্বিনীর "স্বামী" না কাদম্বিনী তরুঙ্গিনীর "স্বামী"? এ স্বাভাবিক নিয়মের কথা ছাড়িয়া কেবল সামাজিক নিয়মে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা তাহাই দেখি। কেহ সূত্রধর, কেহ তন্তুবায় ইত্যাদি। একজন ব্যারিষ্টার ডাক্তারের সাহায্যপ্রার্থী আবার ডাক্তারও ব্যারিষ্টারের সাহায্য চাহেন। তবে ডাক্তারকে ব্যারিষ্টারের স্বামী বলিব, না ব্যারিষ্টার ডাক্তারের স্বামী? যদি ইহাদের কেহ কাহাকে 'স্বামী' বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে শ্রীমতীগণ জীবনের চিরসঙ্গী শ্রীমানদিগকে "স্বামী" ভাবিবেন কেন? [১]

মুসলিম-নারীদের অবনতির দুর্দশা উপলব্ধি করে রোকেয়া বলেছেনঃ

> আমি আজ ২২ বৎসর হইতে ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবনের জন্য রোদন করিতেছি। ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব কাহারা, জানেন? সে জীব ভারত-নারী! এই জীবগুলির জন্য কখনও কাহারও প্রাণ কাঁদে নাই। মহাত্মাগান্ধী অস্পৃশ্য জাতির দুঃখে বিচলিত হইয়াছেন; স্বয়ং থার্ড ক্লাশ গাড়ীতে ভ্রমণ করিয়া দরিদ্র রেল-পথিকের কষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। পশুর জন্য চিন্তা করিবারও লোক আছে তাই যত্রতত্র 'পশুক্লেশ-নিবারণী সমিতি' দেখিতে পাই। পথে কুকুরটা চাপা পড়িলে তাহার জন্য এংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলিতে ক্রন্দনের রোল দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের ন্যায় অবরোধবন্দিনী নারী জাতির জন্য কাঁদিবার একটি লোকও এ ভূ-ভারতে নাই। ... সুখের বিষয় এতকাল পরে 'শ্রীকৃষ্ণ' স্বয়ং হিন্দু ভগিনীদের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিয়াছেন। তাই চারিদিকে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবরোধ-বন্দিনী মহিলাদের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ... সম্প্রতি রেঙ্গুনে একজন ব্যারিষ্টার হইয়াছেন। লেডী ব্যারিষ্টার মিস ঘোরাবজীর নামও সুপরিচিত; কিন্তু মুসলিম নারীর কথা কি বলিব? তাহারা যে তিমির সে তিমিরে আছে।[২]

সমস্যাসঙ্কুল জীবন-পারাবার পেরিয়ে আলোকোজ্জ্বল তটরেখায় উত্তীর্ণ হবার দৃঢ় প্রত্যয়ে রোকেয়া মুসলিম সম্প্রদায়কে কোরান শরীফের শিক্ষা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছেন। তিনি মনে করেন, এর ফলে হয়তো তারা নারীশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হতে শিখবে–

> কিন্তু প্রশ্ন এই যে, মুসলমান– যাঁহারা স্বীয় পয়গাম্বরের নামে (কিংবা ভগ্ন মসজিদের এক খণ্ড ইষ্টকের অবমাননায়) প্রাণ দানে প্রস্তুত হন, তাঁহারা পয়গাম্বরের সত্য আদেশ পালনে বিমুখ কেন? গত অন্ধকার যুগে যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা যে ভ্রম করিয়াছেন, তাহাও ক্ষমা করা যাইতে পারে;

[১] হারুনার রশিদ ভূঁইয়া(সম্পা.), *বেগম রোকেয়া রচনাসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪০
[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩৫

> কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে যখন বারংবার স্ত্রী-শিক্ষার দিকে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে যে, কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া আমাদের প্রিয় নবী 'ফরয' (অবশ্য পালনীয় কর্তব্য) বলিয়াছেন, তবু কেন তাঁহারা কন্যার শিক্ষায় উদাসীন?[১]

মূলত, রোকেয়ার স্কুল প্রতিষ্ঠা, তাঁর কর্মপ্রবাহ, সাহিত্যজীবন সবই কেন্দ্রীভূত ছিলো নতুন সমাজ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষায়। এই একবিংশ শতাব্দীতেও তাঁর রচনা বিপন্ন নারীদের কাছে রক্ষাকবচের মতো। তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা পাঁচ। যথাঃ *মতিচূর* (১ম খণ্ড), ***Sultana's Dream***, *মতিচূর* (২য় খণ্ড), *পদ্মরাগ*, *অবরোধবাসিনী*। এছাড়াও ১৬টি প্রবন্ধ, ৭টি কবিতা, 'ছোটগল্প ও রসরচনা' শিরোনামে ৬টি বিচিত্র রচনা রয়েছে। বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের *রোকেয়া জীবনী*তে ৫টি পত্র এবং মোশফেকা মাহমুদের সম্পাদনায় *পত্রে রোকেয়া পরিচিতি*তে ১৭টি পত্র সংকলন করা হয়েছে। এই পত্রগুলোর সম্পৃক্ততা রয়েছে তাঁর কর্মমুখর জীবন-আবহে ; এবং এগুলোর গুরুত্বও অনস্বীকার্য।

রোকেয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তীকালে যারা নারীসম্প্রদায়ের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষায় তাঁদের সমস্ত প্রয়াস-প্রচেষ্টা নিবেদন করেছেন তাঁদের কয়েকজন ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মুসলিম নারী। রোকেয়ার আদর্শকে আত্মস্থ করে এবং স্বপ্নকে লালন করে এর বাস্তবায়ন-প্রচেষ্টায় কাজ করে গেছেন বিদ্যাবিনোদিনী, লীলানাগ, জোবেদা খানম চৌধুরী, বদরুন্নেছা আহমদ, ফজিলাতুন্নেছা, শামসুর নাহার মাহমুদ, মাহমুদা খানম সিদ্দিকী, সুফিয়া কামাল প্রমুখ। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের জাগরণের নেপথ্যে বেগম রোকেয়ার আদর্শ ও অনুপ্রেরণা মহৌষধ হিসেবে ক্রিয়াশীল সত্য, তার পাশাপাশি ক্রিয়াশীল ছিল পরিবার-সমাজের উদার-মহানুভব সহযোগীর আন্তরিকতা। বেগম রোকেয়ার উত্তরসূরি নূরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী (১৮৯২-১৭৫) তাঁর যাপিত জীবনসত্যকে উন্মোচন করেছেন এভাবেঃ

১. প্রাচীন ভদ্রবংশীয়া মোসলমান আয়মাদার কন্যা বিধায়ে এবং কঠিন পর্দাবগুণ্ঠনের খাতিরে আমার সামাজিক ও পার্থিব অভিজ্ঞতা খুবই কম। বলতে কি, পিত্রালয়ে অবস্থানকালে অষ্টম বর্ষ পূর্ণ হইবার পর, চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত অন্দর ও মস্তকোপরি চন্দ্রতারকা খচিত নীল চন্দ্রতাপ ভিন্ন কোনই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমার নয়নপথের পথিক হয় নাই।[২]

২. জীবনে কখনও পাঠাগারের বেঞ্চে বসার আস্বাদ পাই নাই। কখনও কোন শিক্ষকের নিকট পাঠার্থে বই খুলিয়া বসি নাই। আপন কৌতূহল নিবারণার্থে আপনা আপনি সামান্য ক ব ঠ শিখিয়া দু চারিখানি বই হাতে করিয়াছি মাত্র। .....[৩]

---

[১] হারুনার রশিদ ভূঁইয়া(সম্পা.), *বেগম রোকেয়া রচনাসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩৬

[২] ফরিদা আখতার (সম্পা.), *শত বছরের বাংলাদেশের নারী*, দ্বিতীয় সংস্করণ, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা ২০০৩, পৃষ্ঠা-৯

[৩] প্রাগুক্ত

নূরুন্নেছা খাতুন প্রথম বাঙালি মুসলিম মহিলা ঔপন্যাসিক। ১৯২৩ সালে তাঁর রচিত *স্বপ্নদৃষ্টা* উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয় বেগম রোকেয়ার *পদ্মরাগ* উপন্যাস। আইনজীবী-স্বামীর সহযোগিতায় নূরুন্নেছা সাহিত্য সাধনায় নিয়োজিত হোন। নারীশিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি তাঁর সাধনার মাধ্যমে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন।

ধর্মান্ধ সমাজের গোঁড়ামিকে উপড়ে নতুন প্রত্যয়ে সামনে এগিয়েছেন বেগম হুরায়ন্নিসা সারা তৈফুর (১৮৯৩-১৯৭১)। মুসলিম মহিলাদের ঈদের জামাত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন তিনি এবং এতে সহযোগিতা করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

সমাজ-প্রচলিত ভিত্তিহীন প্রথাগুলোকে সংস্কারের প্রয়োজনে যে সব নারী-প্রতিভা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের একজন লীলানাগ (১৯০০-৬২)। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হতে পারবেন না লীলা নাগ। কারণ মেয়েদের জন্য পড়ার ব্যবস্থা কার্যকর হয়নি। এই অসাম্যের বিরুদ্ধে লীলা নাগ সোচ্চার হলে ভাইস-চ্যান্সেলর পি জে হার্টগ সি আই ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২১ সালে সহশিক্ষা অনুমোদন করেন। ১৯২৩ সালে লীলা ইংরেজি সাহিত্যে ২য় বিভাগে এম এ পাশ করেন। নারীদের ভোটাধিকার ও সম-অধিকারের ব্যাপারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং নারী-শিক্ষার নিমিত্তে ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় (অবৈতনিক) ও ৪টি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

'অধিকার কেউ হাতে তুলে দেয় না, অধিকার নিজ থেকেই আদায় করে নিতে হয়'– এই সত্যভাষণ যিনি উচ্চারণ করেছেন তিনি জোবেদা খাতুন চৌধুরী (১৯০১-১৯৮৬)। ১৯২৭ সালে অবরোধ প্রথার অযৌক্তিক জালকে ছিন্ন করে বোরকাবিহীন অবস্থায় এক জনসভায় উপস্থিত হন তিনি। এটাই ছিলো মুসলিম-নারীর ইতিহাসে প্রথম অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং ইতিহাসের এক সাহসী অধ্যায়। বিদেশি পণ্য বর্জন, স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ, রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবি– প্রভৃতি আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা প্রমাণ করে– তিনি স্ব-অধিকার অর্জনে একজন সোচ্চারকণ্ঠ নারী। নারীশিক্ষার জন্য বাড়ি-বাড়ি ঘুরে ছাত্রী সংগ্রহ করতে গিয়ে মুখের ওপর দরজার খিল তুলে দেয়ার মতো অপমানও সহ্য করেছেন তিনি। তবুও তিনি দমেননি এবং সিলেট সরকারি কলেজটি আজও তার স্বাক্ষর বহন করছে।

মুসলিম মেয়েদের নিয়ে ১৯৪৪ সালে মির্জাপুর স্ট্রীটের আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী গার্লস হাইস্কুল মাঠে প্রথম উন্মুক্ত বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন বদরুন্নেসা আহমদ (১৯০৩-১৯৮০)। ১৯৬৫ সালে নিখিল পাকিস্তান অলিম্পিক এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত ক্রীড়ানুষ্ঠানে তিনিই প্রথম বাঙালি মুসলিম নারী যিনি হাই-জাম্পে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের বাধাকে অতিক্রম করে সফল হয়েছিলেন লীলা নাগ। তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরি ফজিলাতুন্নেসা (১৯০৫-১৯৭৭)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ডিগ্রি অর্জন করার পর বিলেতে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য যাত্রা করতে চাইলে রক্ষণশীল সমাজের ভয়ে অস্বীকৃতি জানায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অবশেষে নিজ উদ্যোগেই 'স্টেটস স্কলারশিপ' সংগ্রহ করে বিলেত গমন করেন ফজিলাতুন্নেছা। নারী প্রগতি আন্দোলনের এক বিরাট জয়যাত্রা ছিল এই সফর। এই আন্দোলনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং কবি জসীমউদ্‌দীন।

সময়ের প্রতিবন্ধতাকে জয় করে নারীরা অর্জন করেছেন তাদের অধিকার। প্রথম 'অধ্যক্ষ' হিসেবে মুসলিম নারীদের মাঝে স্মরণীয় ফজিলাতুন্নেসা। কাব্যচর্চায় সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (১৯০৬-১৯৭৭)। তিনি সনেট রচনায় মুসলিম নারীদের মধ্যে অগ্রণী। লেখাপড়ার সুযোগ তিনিও তেমন পাননি। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন তিনি। তাঁর কাব্যচর্চার মূল প্রেরণাদাতা ছিলেন *আনোয়ারা* উপন্যাস রচয়িতা নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন। এছাড়াও বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের আনুকূল্যে তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়। 'নারী জাগরণ' বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে প্রথম সাহিত্য পুরস্কার অর্জন করেন তিনি।

সমাজের বৈরী-জঠর থেকে মুক্ত হয়ে সাফল্যের জয়গাথা নির্মাণ করেছেন শামসুন নাহার (১৯০৮-১৯৬৪)। পিতার মৃত্যুর পর নানাবাড়িতে আশ্রিত হয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর রক্ষণশীল সমাজের চোখে 'বড়' হওয়ার অপবাদে লেখাপড়ার সুযোগ আর হয়নি তাঁর। কিন্তু অদম্য ইচ্ছের নিকট হার মানে সমাজ-পরিবারের অপশাসন। উচ্চ-শিক্ষার অভিপ্রায়ে শামসুন নাহারের জন্য নিয়োগ করা হয় একজন বৃদ্ধ হিন্দু শিক্ষক। কঠোর পর্দা প্রথা মেনে শুরু হয় শিক্ষা কার্যক্রম। শিক্ষক ও ছাত্রীর মাঝখানে লম্বা পর্দা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। শিক্ষক পড়া বলেন, ছাত্রী পর্দার আড়াল থেকে শোনে। লেখার কাজ দেন ছাত্রীকে, ছাত্রী পর্দার নিচ দিয়ে খাতা তুলে দেন শিক্ষকের হাতে। এই অভিনব অবরোধ প্রথায় লেখাপড়া চলে এবং ছাত্রী ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে প্রথম বিভাগে চারটি লেটার নিয়ে। এই পাশ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না শামসুন নাহার। কলেজে পড়ার ইচ্ছেকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে শামসুন নাহারকে পাত্রস্থ করা হয় একজন প্রগতিশীল উদারমনা ব্যক্তি ডাক্তার ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদের নিকট। তাঁর সহযোগিতায় কলকাতার ডায়োসেশান কলেজ থেকে বিশতম স্থান অধিকার করেন শামসুন নাহার মাহমুদ। ১৯৩২ সালে প্রাইভেটে বি. এ. পাশ করেন এবং দীর্ঘ দশ বছর পর ১৯৪২ সালে এম. এ. পাশ করেন। তৎকালীন গভর্নরের পত্নীর নামাঙ্কিত 'লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ'-এর বাংলা বিভাগে অধ্যাপক পদে তাঁকে অধিষ্ঠিত করেন এ. কে. ফজলুল হক।

কিশোর পত্রিকা 'আঙ্গুর' এবং 'নওরোজ' পত্রিকায় প্রকাশিত শামসুন নাহার মাহমুদের লেখার প্রশংসা করে রোকেয়া মন্তব্য করেনঃ

> তোমাকে চিঠি–লিখতে বসিয়া আজ অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। একবার রাত্রি বেলায় আমরা বিহারের এক নদীপথে নৌকাযোগে যাইতেছিলাম। বাইরের অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না– শুধু নদী তীরের অন্ধকার বনভূমি হইতে কেয়া ফুলের মৃদু সুরভি ভাসিয়া আসিতেছিল। ঠিক তেমনি তোমাকে কোথাও দেখি নাই, কিন্তু তোমার সৌরভটুকু জানি।[১]

নজরুল ইসলামের স্নেহপুষ্ট শামসুন নাহার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এক অনুষ্ঠানে বলেন–

> তোমরা জন্মেছ উজ্জ্বল আলোক প্লাবনের মধ্যে আর আমাদের জন্ম গভীর অন্ধকারে, অন্ধকারেই হয়েছে আমাদের যাত্রা শুরু। অন্ধকারকে ভেদ করে এসে উত্তীর্ণ হয়েছি আমরা আলোকের তীরে। আলো তোমাদের কাছে এসেছে সহজ, স্বাভাবিকভাবে। আর আমরা আলো জয় করে নিয়েছি। আলো হয়ত সেজন্যই আমাদের কাছে বেশি মূল্যবান। এইটুকু তফাৎ রয়েছে তোমাদের আর আমাদের যুগে। সে যুগের সেই আলোর অভিযানে যিনি আমাদের অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি আমাদের 'কবিদা'।[২]

স্পষ্টত বাঙালি নারীসমাজের পথচলা কোনোকালেই নির্বিঘ্ন ছিল না। বৈরী সমাজব্যবস্থায় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এবং অন্যান্য অসামান্য নারীর অবদানে যে পথরেখা সৃজিত হয়েছে, তা অনুসরণ করে পরবর্তীকালে এগিয়ে গেছেন অনেকেই। এঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন সুফিয়া কামাল। তাঁর চলার পথও কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। সমাজের ছাপ-ছাপ অন্ধকার সরিয়ে তিনি আলোর অন্বেষণ করেছেন এবং বিস্তর পথ পাড়ি দিয়ে হয়ে উঠেছেন আমাদের সমাজের এক দৃষ্টান্তস্থানীয় ব্যক্তিত্ব : 'জননী সাহসিকা'– সুফিয়া কামাল।

শায়েস্তাবাদের নবাব পরিবারের বিশাল পরিসরে কেটেছে সুফিয়া কামালের শৈশব । ঐশ্বর্য-ঔদার্য আর সম্প্রীতির মিলনমেলায় বর্ধিত হয় তাঁর মানসজগৎ। উদার সেই পরিবেশের প্রভাবে তিনি হয়ে ওঠেন বড় মনের একজন মানুষ। মানুষই ছিল তাঁর জীবনাদর্শ। সারাজীবন শান্তি ও সাম্যের জয়গান গেয়েছেন তিনি। তাঁর জীবনকথায় সে তথ্য অভিব্যঞ্জিত হয়েছে এভাবে–

> আমরা জন্মেছিলাম পৃথিবীর এক আশ্চর্যময় রূপায়ণের কালে। প্রথম মহাযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, মুসলিম রেনেসাঁর পুনরুত্থান, রাশিয়ার বিপ্লব, বিজ্ঞান জগতের নতুন নতুন আবিষ্কার, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নবরূপ সূচনা। এসবের শুরু থেকে যে অভাবের মধ্যে শৈশব কেটেছে তারই আদর্শ আমাদের মনে ছাপ রেখেছে সুগভীর করে। স্বাধীনতা চাই, শান্তি চাই, সাম্য চাই, এই বাণী তখনকার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হতো।[৩]

---

[১] ফরিদা আখতার (সম্পা.), *শত বছরের বাংলাদেশের নারী*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৪

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৫

[৩] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০০২, পৃষ্ঠা-৫৭৮

বাল্যকাল থেকেই সুফিয়া কামালের বিচরণ ছিল সাহিত্যজগতে। সাত বছর বয়সে কবিতা লেখার স্মৃতিময় ঘটনাও তিনি স্মরণ করেছেন। বারো বছর বয়সে 'সৈনিক বধূ' গল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় তাঁর সাহিত্যযাত্রা। অতঃপর স্বদেশের জল-হাওয়ায় তিনি ক্রমশ বর্ধিত হয়েছেন এবং অর্জন করেছেন জাতিক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও মর্যাদা। তাঁর সাহিত্যকর্মে বাংলার চিরায়ত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষণীয়। শায়েস্তাবাদের পারিবারিক জমিদারিতে সাংবৎসরিক নানামুখী উৎসব-অনুষ্ঠানে পরিবেশিত গানের অনুরণন কিংবা কর্মব্যস্ত কর্মচারীদের গীতগান শুনে সুফিয়া কামালের শিশুমনে উপ্ত হয়েছে কাব্যিক বোধ এবং সাংগীতিক চেতনা। পুঁথি, ভাটিয়ালি, মুরশিদি আর জারিগানের ছন্দদোলা তাঁকে করেছিল আলোড়িত। এছাড়া স্বজনদের মুখে শোনা কিংবা নিজ আগ্রহে পড়া ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্য যা বাংলা সাহিত্যের বৈভবকে করেছে সমৃদ্ধ, তার প্রভাবও তাঁর শিশুমনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। যার ফলে পরবর্তীকালে তাঁর কবিতায় যুক্ত হয়েছে ঐতিহ্যসম্পৃক্ত স্বাদেশিক চেতনা। পূর্বসূরিদের কাব্যবৈশিষ্ট্য স্বীকরণ করলেও আশৈশব গড়ে-ওঠা এ-জীবনচৈতন্যের উপস্থিতি তাঁর সৃষ্টিকর্মকে করে তুলেছে সহজ ও স্বতন্ত্র। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেছেন :

> রবীন্দ্রনাথ কি নজরুলের অনেক উপমা, বাকভঙ্গির সহজ গ্রহণ সত্ত্বেও এসব উদ্ধৃত কাব্যাংশে এবং অন্যত্র বেগম সুফিয়া কামালের আপন কণ্ঠ অনায়াসে চিনে নেয়া যায়।[১]

কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> সুফিয়া কামাল ছিলেন অমৃতের সন্তান। যারা সত্যিকার অর্থে শিল্পের ভেতর দিয়ে প্রার্থনার ভাষা খুঁজে পান। তিনি প্রাচীর ঘেরা গণ্ডির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। জীবন থেকে মুছে ফেলেছিলেন সেই গণ্ডির রেখাগুলো। এ বড় দুঃসাহসের কাজ ছিল। আমার গভীর বিশ্বাস কবিতায় অনুপ্রেরণা তাকে এমন দুঃসাহসী করেছিল। তিনি লিখেছেন কম। রচনা-সম্ভার বিশাল নয় কিন্তু সমৃদ্ধ। সমৃদ্ধ শিল্পের গুণে, সমৃদ্ধ রচনার ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যে। তাঁর কবিতার সুষমা, লালিত্য, এবং ছন্দ অন্য কারো মতো নয়। এই যে বৈশিষ্ট্য অর্জন এটা একজন কবিকে স্বকীয়তায় বিশিষ্ট করে। সুফিয়া কামাল তাঁর সাহিত্য, তাঁর কবিতায় আমাদের হৃদয়ের কথা বলেছেন।[২]

আশৈশব অর্জিত অভিজ্ঞতাকে তিনি বাণীরূপ দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যকর্মে। স্বাধীনতা ও সাম্যের জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। মূলত, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধের প্রভাব সুফিয়া কামালকেও প্রভাবিত করেছে। যার ফলে রোকেয়ার আদর্শকেই তিনি জেনেছেন এবং মেনেছেন। নারীকে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি প্রাণপন সাধনা

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০০২, পৃষ্ঠা-বার

[২] *সেলিনা হোসেন*, মৃত্যুহীন প্রাণ, উদ্ধৃত, সন্তোষগুপ্ত (সম্পা.), *বেগম সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, প্রথম প্রকাশ, সমুদ্র প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা ২০০১, পৃষ্ঠা-১০৮

করেছেন। 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে'র সদস্য হিসেবে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ্যত্বের জয়গাথা :

> সেখানে যত হিন্দু মেয়ে, খ্রিষ্টান মেয়ে, নির্যাতিতা মেয়েরা, যাদেরকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। যারা হিন্দু সমাজ থেকে বেরিয়ে গেছে, ইংরেজ সমাজে যাদের ঠাঁই নাই তারা এসে ওনার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। আর মুসলমান মেয়েদের তো কথাই নাই। ওই রকম আশ্রম করে উনি ওই নিজেদের মধ্যেই খুব লেখাপড়া জানা না হলেও ওদের দিয়ে স্কুল চালাতে শুরু করলেন। ... মায়াদি বলে একজন ছিলেন। হিন্দু সমাজের মেয়ে ডাকাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, পরে আর ওনাকে ঘরে নিত না। বাবা, মা, শ্বশুর বাড়ীর কেউই ওনাকে গ্রহণ করলেন না। সেই বেচারী ছিল সেই আশ্রমে। আর একজন ছিলেন খ্রিষ্টান মহিলা– না দুইজন ছিলেন, তাদের স্বামী তাড়িয়ে দিয়েছিল তাদের। ওদের মধ্যে আবার ডিভোর্স নিতে পারে না। কত কি সব হাঙ্গামা-টাঙ্গামা আছে ডিভোর্স নিতে গেলে। কিন্তু স্বামী অত্যাচারী মাতাল মদখোর। এই দুজন মহিলাও ওনার কাছে ছিল।[১]

এই অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধের প্রকাশ তাঁর সাহিত্যকর্মেও লক্ষণীয়। এই চেতনাবোধই তার সাহসিকতার মূলমন্ত্র। এ সম্পর্কে নারী নেত্রী আয়েশা খানম বলেন :

> শান্তির সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম– মানুষকে ধর্মের নামে বিভক্ত করা, ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ধর্মীয় উগ্র-উন্মাদনা সৃষ্টি করা, ফতোয়া জারি করা, নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার প্রগতিবাদী চিন্তাচেতনার বিরুদ্ধে মৌলবাদী পাশবিক হিংস্র অগণতান্ত্রিক অমানবিক তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংগ্রামে কবি সুফিয়া কামাল এক উজ্জ্বল নাম। আমরা তাঁকে তাই সম্বোধন করি শতাব্দীর সাহসিকা বলে।[২]

সাহিত্যবিশ্বাসে সুফিয়া কামাল ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী। ত্রিশের আধুনিক কাব্যধারা অনুসরণ করে কবিতা লিখেননি তিনি। অনেকটা সচেতনভাবেই তিনি এ-ধারাটিকে এড়িয়ে গেছেন। এজন্য অনেকে তাঁকে অনানুষ্ঠনিক কবি হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। তাঁর সম্পর্কে উচ্চারিত এইরূপ বক্তব্য অযৌক্তিক মনে করেন আবদুল গাফফার চৌধুরী। তাঁর মতে :

> সুফিয়া কামাল ছিলেন ত্রিশ-পূর্ব যুগের কাব্যধারার কবি। ত্রিশের আধুনিক কবিতা তাঁকে খুব একটা স্পর্শ করেনি। একথা বলা হলে তাকে অসম্মান করা হয় না। তিনি নিজেও একথা স্বীকার করতেন। বলতেন, 'নজরুলই যেখানে ত্রিশের যুগের কবিদের সঙ্গে মিশে, আধুনিক হলেন না, সেখানে কী করে তোরা ভাবিস আমি আধুনিক হব।
>
> তাঁর এই কথাবার্তায় আমার মনে একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, তিনি তো আধুনিক কবিতা লেখেনই না, তার ওপর আধুনিক কবিতার বোদ্ধা-পাঠকও নন। আমার এই ধারণাটি নির্মমভাবে ভেঙে যায় তাঁর একদিনের কথায়। বুঝতে পারি, তিনি রচনায় আধুনিক নন, কিন্তু মননে আধুনিক। আধুনিক কবিতা

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ*, ১ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০০২, পৃষ্ঠা-৫৮৩

[২] আয়েশা খানম, শতাব্দীর সাহসিকা সুফিয়া কামাল, উদ্ধৃত, সৈয়দ শামসুল হক সম্পাদিত, *জননী সাহসিকা বেগম সুফিয়া কামাল : শেষ প্রণতি*, প্রথম প্রকাশ, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা ২০০০, পৃষ্ঠা-৩০

তিনি পড়েনও। ... সেদিন তাঁর হাতে ছিল আহসান হাবীবের 'রাত্রিশেষ' কাব্যগ্রন্থটি। কোনো ভূমিকা না করে বললেন : 'হাবীব খুবই ভালো কবিতা লেখে রে। তার কবিতার একটা লাইন তো আমার নিজের মনের কথা– 'যুগের চিতায় জ্বলে জীবনের প্রিয় প্রভাত।' এই কবিতাটি আমারও খুব প্রিয়। কিন্তু সেদিন আমি সবিস্ময়ে সুফিয়া কামালের মুখের দিকে চেয়ে রয়েছি।

আরেকদিন তাঁর বাসায় খেতে বসেছি। হঠাৎ সেদিন বললেন, আচ্ছা তোরা তো জীবনানন্দ দাশ পড়িস। আমি পড়ি জসীমউদ্‌দীন। দুজনের মধ্যে পার্থক্য কী? আমি কোনো প্রকার ভাবনা চিন্তা না করেই বলেছিলাম একজন আধুনিক কবি, আরেকজন পল্লীকবি। কিন্তু পল্লীর চিত্র তো দুজনের কবিতার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান। ডাহুক, ধানসিঁড়ি নদী, বাঁশবাগানের জোছনা, জোনাকির রাত তো জীবনানন্দের কবিতায় দেদার পাওয়া যায়। জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় পাওয়া যায় বাঁকা গাঁয়ের পথ থেকে তার রাখাল ছেলেকে পর্যন্ত।

আমি এবার বিমূঢ় হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম তিনি স্বীকার না করলেও জীবনানন্দ দাশ পড়েন। কিন্তু তাঁর প্রশ্নটির গূঢ়ার্থ বুঝতে পারছিলাম না।

কিছুক্ষণ পর তিনি নিজেই অর্থটি পরিষ্কার করলেন। বললেন, আমার মতে বুঝলি, আমার সাধারণ বুদ্ধিতে জসীমউদ্‌দীন একজন ফটোগ্রাফার। আর জীবনানন্দ দাশ হলেন একজন পেইন্টার। জসীমউদ্‌দীন যা দেখেছেন তারই নিখুঁত ছবি একেঁছেন। জীবনানন্দ তাতে তার মনের চিন্তাভাবনার রঙ মাখিয়েছেন। একটা ফটোগ্রাফি, আরেকটা পেইন্টিং। ফটোগ্রাফিতে সাঁওতাল নারী আর জয়নুল আবেদীনের পেইন্টিংয়ে সাঁওতাল নারীর যে পার্থক্য, তার চেয়েও বেশি পার্থক্য জসীমউদ্‌দীন আর জীবনানন্দের কবিতায়।

এ-কথাগুলো নিজের কানে না-শুনলে বিশ্বাস করতাম না সুফিয়া কামাল বলেছেন। এমনকি এখন অন্য কেউ লিখলেও আমার বিশ্বাস হতো না। এই মৃদুভাষী সহজ ও সরল কথার মানুষটির নিত্যদিনের কথাবার্তায় বোঝা যেত না তাঁর চিন্তাভাবনা কত গভীর।[১]

সুফিয়া কামাল একজন নারী এবং সে সঙ্গে কবি। তাঁর অভিজ্ঞতার সীমানা কেবল 'ঘর ও পরিবার'। সীমিত পরিমণ্ডলে অভিজ্ঞতা অপুষ্ট থেকে যায়– এ ধারণায় বিশ্বাসীদের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি উঁচিয়ে সুফিয়া কামাল তাঁর স্বকীয় ধারণাকে তুলে ধরেছেন। প্রতিবন্ধকতা নয়, বরং 'ঘর ও পরিবার' অভিজ্ঞতাকে পরিপুষ্ট করে। ১৯৬৩ সালে বিবিসি বাংলা সার্ভিসের সিরাজুর রহমানকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে সুফিয়া কামালকে প্রশ্ন করা হয়–

আপনি কি মনে করেন পারিবারিক এবং সামাজিক কর্তব্যগুলো আপনার প্রতিভার আরো বেশী বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিলো?

[১] আবদুল গাফফার চৌধুরী, হে মহাজীবন, রোদনে তোমার বিদায় নয়, উদ্ধৃত, সন্তোষ গুপ্ত সম্পাদিত, *বেগম সুফিয়া কামাল স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর সুফিয়া কামাল বলেছিলেন :

> না, তা আমি মনে করি না। আমি মনে করি, এগুলো আমার জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।[১]

বিচরণক্ষেত্র যদি হয় সীমিত তবে প্রতিভা ক্ষুদ্রতায় সমর্পিত হয়– এই মতকে সুফিয়া কামাল যুক্তিযুক্ত মনে করেননি। ঘর ও পরিবারের সীমায় আবদ্ধ থেকেও যে জীবনকে গভীরভাবে বোঝার ক্ষমতা অর্জন করা যায়, সে সত্যটি তিনি অনুধাবন করেছেন এবং তার প্রকাশরূপ প্রতিভাত হয়েছে তাঁর *কেয়ার কাঁটা* গল্পে।

আধুনিক-মনস্ক সুফিয়া কামাল দেশের সকল প্রগতিশীল কর্মপ্রক্রিয়ায় ছিলেন সংশ্লিষ্ট। তিনি বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। রাজনীতির প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে এভাবে :

> কোন দলের রাজনীতি আমি কোনদিনই করিনি। কিন্তু দেশের মানুষের জীবনকে যা আঘাত করে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি যে রাজনৈতিক নীতি ও শাসনে নষ্ট হয়ে যায়, সত্য কথা প্রকাশে যা বাধা দেয়, মানবতার লাঞ্ছনা যে ক্ষেত্রে হয়, আমি তখন চুপ থাকতে পারি না। আমার বিবেক আমাকে তাড়িত করে। ... যখন যা বিবেকে আঘাত করেছে তখনই তার প্রতিবাদ করেছি।[২]

নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো বৈষম্য তিনি অনুমোদন করেননি। বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন তিনি লালন করেছেন আজীবন। নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে– এই প্রত্যাশাই করেছেন তিনি। তিনি বলেছেন–

> আমাদের লড়াই কোন পুরুষ মানুষের সাথে নয়, লড়াই অন্যায়ের সাথে। আমি 'মা', আমার ছেলেমেয়ে দুটিই আমার সন্তান। এক হাত এক পা বেঁধে রাখলে অন্য দেশের সাথে, অন্য জাতির সাথে আমরা পারবো না। দুজনে মিলিতভাবে কাজ করলে তবেই আমরা বাংলাদেশের মানুষ মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে পারবো।[৩]

তাঁর সৃজনশীলতা রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত। তিনি সেই রাজনীতির কথাই বলেছেন যা সত্যিকার অর্থে মানবকল্যাণমূলক। তাঁর কবিতা এবং রাজনীতি একই সূত্রে গাঁথা। ১৯৭৮ সালে বস্টন শহরে যখন জ্যাকি ক্যাসেন নামক একজন কবি-সাংবাদিক তাঁর কবিতায় রাজনীতির স্থান বিষয়ে প্রশ্ন করেন, তিনি উত্তর দেন :

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনা সংগ্রহ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-পনের

[২] ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *সুফিয়া কামাল*, দ্বিতীয় প্রকাশ , নারী উদ্যোগ কেন্দ্র, ঢাকা, জুন ২০০৭, পৃষ্ঠা-৩৭৯

[৩] দিলারা বেগম, কবি সুফিয়া কামাল স্মরণে, উদ্ধৃত, সেলিনা খালেক সম্পাদিত, *মহিলা সমাচার*, সুফিয়া কামাল সংখ্যা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা ২০০০, পৃষ্ঠা-৮৪

> যতদিন পর্যন্ত রাজনীতি বলতে মানবতাবোধ-এর পুনরাধিষ্ঠান, সমতার অধিকার, মানুষের ভালো থাকা এবং ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনের উপর তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা বুঝায়, আমার কবিতা আর রাজনীতি একই সূত্রে গাঁথা।[১]

মানবতাবিরোধী রাজনীতি নয় বরং মানবকল্যাণমূলক রাজনীতি তাঁর কাম্য। তাঁর কবিতায় রাজনীতির কথা এসেছে বৈরী সামাজিক-রাষ্ট্রিক প্রেক্ষাপটে। যাবতীয় অপ-শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে তিনি রাজনীতিকদের আবেদন জানিয়েছেন। আবার তীব্র ঘৃণা উদ্‌গীরণ করেছেন দেশের শত্রুদের প্রতি। ১৯৬৯ সালে আইয়ুব-বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দান করেন সুফিয়া কামাল। ১৯৬১ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'তম্‌ঘা-ই-ইমতিয়াজ' পুরস্কার তিনি প্রত্যাখ্যান করেন ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে। তাঁর রাজনীতিচিন্তা ছিল সঠিক ও নির্ভুল। এ বিষয়ে জনাব ওয়াহিদুল হকের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক :

> সুফিয়া তার পঁয়ষট্টি কি সত্তর পাউন্ডের ব্যাধিগ্রস্ত শরীরটি নিয়ে আমাদের দেশের সবচাইতে শক্তিধর মানুষটি ছিলেন। সেই শক্তির উৎস ছিল তাঁর নিহিত স্বাধীনতার বোধে অজর অজেয়। দেশের মানুষে এত এত ভাগ মানুষের পক্ষের শক্তিতেও কত ভাগ। এত শত ভাগের কেউ বলতে পারবে না সুফিয়া কামালের কোনো রাজনৈতিক ভুল পদক্ষেপের কথা, কারও প্রতি কোনো অনুদারতার কথা, সাংবাদিক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কোনো ক্ষেত্রে কোনো অযৌক্তিক অবস্থানে যাওয়ার কথা। ... মানবকল্যাণের জন্য সমাজের ভালর জন্য যা কিছু কর্তব্য মনে হয়েছে তার থেকে ভয় কিংবা অন্য শত বিবেচনায় তাঁকে সরিয়ে আনতে পারেনি কোনো দিনই।[২]

অমিত-সাহসী সুফিয়া পরিবেশের-প্রতিকূলতায় বশ্যতা স্বীকার না করে নিজ-অবস্থানে ছিলেন দৃঢ় ও অকুতোভয়। ১৯৬৫ সালে ঢাকায় গভর্নর হাউসে বুদ্ধিজীবীদের সাথে মিলিত হন তৎকালীন স্বৈরশাসক আইয়ুব খান। সেখানে সুফিয়া কামালও উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্পর্কে আলোচনা চলাকালে সুফিয়া কামাল আইয়ুব খানকে বলেছিলেন, আপনি এতোবড় সমস্যার (তাসখন্দ শান্তি চুক্তি) সমাধান করলেন, এখানে ছাত্রদের সমস্যার সমাধান করতে পারছেন না কেন? তার উত্তরে আইয়ুব খানের জবাব ছিল–

> 'হিঁয়া তো সব হাইওয়ান (জানোয়ার) হায়'

উপস্থিত সবার সামনে এর যথার্থ উত্তরও সুফিয়া কামাল ছুঁড়ে দিয়েছেন–

> 'আপ তো সব হাইওয়ানোকো প্রেসিডেন্ট'

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনা সংগ্রহ,* প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-পনের

[২] ওয়াহিদুল হক, সংগ্রামী মমতাময়ী জীবনে মরণে,উদ্ধৃত, সৈয়দ শামসুল হক সম্পাদিত, *জননী সাহসিকা বেগম সুফিয়া কামাল : শেষ প্রণতি,* প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২২-২৩

এই উত্তর শুনে আইয়ুব খান স্তম্ভিত হয়ে যান এবং সভা ভঙ্গ হয়ে যায়। স্বৈরশাসকের বিবেককে এভাবেই আঘাত করার সাহসী প্রত্যয় তাঁর ছিলো। এ প্রসঙ্গে কথা সাহিত্যিক আবুল ফজলের মন্তব্য স্মরণীয় :

> আইয়ুবীয় সামরিক শাসনের যাঁতাকলে অনেক ডাক-সাইটে বুদ্ধিজীবীকেও ভেঙ্গে চুরমার হতে দেখেছি, দেখেছি বহু সংগ্রামী বিপ্লবীকে মাথা নুইয়ে মুচড়ে ত্রিভঙ্গ মুরারী হতে। প্রলোভনের ইন্দুরকলে ধরা পড়েনি এমন বান্দা খুব কমই ছিল সেদিন। কিন্তু সুফিয়া কামাল থেকেছেন সবসময় উন্নত শির। ঘুষা বা ঘুষি কিছুতেই এত ক্ষুদ্রদেহী নম্র স্বভাবা মানুষটাকে নোয়াতে পারেনি। একখানি ক্ষুদ্র কোমল দেহের অন্তরে যে এমন শক্ত এক অনন্য মেরুদন্ড বিরাজ করছে তা সত্যিই অকল্পনীয়।[১]

তাঁর জীবন-দর্শনের সঞ্চালক তাঁর বিবেক। বিবেকের প্রণোদনায় তাঁর জীবন ও কর্মপ্রবাহ ছিল স্বচ্ছ ও মুক্ত। এ-ব্যাপারে তাঁর ভাষ্য :

> 'আমার জীবন দর্শন বলে কিছু নেই, আমি আমার বিবেকের কথাই বলি।'

বিশেষ কোনো গোষ্ঠী বা দলভুক্ত হয়ে নয় বরং মুক্ত-বিবেক নিয়ে তিনি বিচরণ করেছেন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে।

মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব ও আবেগকে কেন্দ্র করে যেমন, ঠিক অন্য সম্প্রদায়ের আবেগকেও মূল্যায়ন করেছেন সুফিয়া কামাল। কেননা তিনি তাঁর আবাল্য লালিত জীবন-পরিবেশে হিন্দু-মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধকেই অবলোকন করেছেন। শায়েস্তাবাদের জমিদার মহলে মুসলিম ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি হিন্দু ব্যক্তিবর্গের যাতায়াত ছিলো অবাধ ও স্বচ্ছন্দ। সেখানে কোরান আর পুরাণ সবই আলোচিত হতো।

ধর্মাচরণে সুফিয়া কামাল ছিলেন স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁর এই স্বচ্ছ জীবনদৃষ্টি তৈরি হয়েছে রোকেয়ার আদর্শবোধ থেকে। যে বোধের কথা রোকেয়া বলতেন :

> ইসলামে আছে যে, মেয়ে এবং পুরুষ দুজনকে সমান শিক্ষা দাও। ... যে স্বাধীনতা আমাদের ইসলাম দিয়েছে সেই স্বাধীনতাটুকু আমাদের মেয়েদের থাকবে। লেখাপড়া শেখা একসাথে, মেয়ে ছেলের সমতা, সমান অধিকার থাকবে, সমান দায়িত্ববোধ, এইটাত ইসলামের কথা– এটাই আমরা চাই।[২]

মানবতার প্রতি তাঁর সুমহান চেতনাবোধের পরিচয় পরিস্ফুটিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যকর্মে। তাঁর ভ্রমণবিষয়ক রচনা *সোভিয়েতের দিনগুলি*তে সে চেতনার বহিঃপ্রকাশ সুস্পষ্ট। তিনি বিশ্বাস করতেন– 'আল্লাহ সেই জাতিকেই সাহায্য করেন, যে জাতি তার মানবতাকে মর্যাদা দেয়।'

---

[১] *সুফিয়া কামাল : স্বনির্বাচিত কবিতা*, প্রথম প্রকাশ, সময় প্রকাশন, ঢাকা, নভেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা-১২

[২] *সুফিয়া কামাল রচনা সংগ্রহ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮৫-৮৬

মানুষকে মানবাধিকার দানের যে মহান বাণী আমাদের মহানবী পৃথিবীতে এনেছিলেন, তাঁর সেই বাণীকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করেছে আজ সোভিয়েট রিপাবলিক।

সুফিয়া কামাল মাতৃত্বের অনুপম ভালোবাসায় এদেশের সন্তানদের ছায়াশীতল আশ্রয়দানে সচেষ্ট ছিলেন। লিঙ্গ-বৈষম্য মুক্ত এক কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন তিনি। এ লক্ষ্যেই তিনি আন্দোলনে থেকেছেন। মাতৃত্ব ও নারীত্বের অবমাননায়, এদেশের সংস্কৃতি-বিরোধী উচ্চারণে, আগ্রাসন প্রতিরোধে লড়াই করেছেন তিনি। তাঁর কর্ম পরবর্তী প্রজন্মের প্রেরণা। মুস্তাফা নূরউল ইসলামের মতে-

> দুঃসময়ের এই পটভূমিতে পুনরায় মাতা তুমি সুফিয়া কামাল। বিশ্বাসে জানি, সন্তানের জন্য বরাভয়ের নিঃশঙ্ক ভূমিকা তোমার। স্মরণ করি, যখন দানবের রাহুগ্রাস, মাতা তুমি বারংবার আমাদেরকে দুঃসাহসী করে তুলেছ। ... ভয়ঙ্কর দুর্যোগের কালে এখন আমাদের বসবাস। মাতা লালন করবেন, তাঁর অঞ্চল ছায়ায় আমাদের আশ্রয়। পুনরায়, মাতাই ত পাঠাবেন সন্তানকে লড়ে নেয়ার ফ্রন্টিয়ারে। ... আমাদের জন্য আশার আর শক্তির শেষ প্রতীক অবলম্বনের বড়ো প্রয়োজন আজ।[১]

নারীর অবমাননায় তিনি গভীর বেদনাবোধে আক্রান্ত হতেন। বিশ্বাস করতেন, 'নারীমুক্তি মানেই মানবমুক্তি'। দীর্ঘ ৩০ বৎসর মহিলা পরিষদের নেতৃত্ব দিয়েছেন, নারী অধিকার আন্দোলনে যুক্ত থেকেছেন। নারায়ণগঞ্জ টানবাজার পতিতালয় উচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে অসহায় নারীদের প্রতি মানবেতর আচরণের প্রতিবাদও করেছেন তিনি :

> কোন পরিকল্পনা নেই, কোন দূরদৃষ্টি নেই, নারী সংগঠনগুলোর সাথে কোন আলাপ আলোচনা নেই, দুম করে একটা কাজ করলেই হলো? এতই সহজ? মেয়েগুলোর উপর এতো অন্যায় করা হল। একটা পুরুষ মুখ খুলল না?[২]

সমাজের চোখে যারা অস্পৃশ্য ও ঘৃণিত সেইসব মানুষদের প্রতিও তিনি অনুভব করেছেন মমত্ববোধ। হীন ও ক্ষুদ্র অর্থে মানবতাকে তিনি বিভক্ত করেননি, একই পরিমাপক দণ্ডে সবাইকে মূল্যায়ন করেছেন তিনি।

সমাজকে ভেঙে-গুঁড়িয়ে নতুন করে গড়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল। সংস্কারমুক্তিই ছিল তাঁর ব্রত। বরিশালে গান্ধীজীর আগমনে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে চরকায় সুতো কাটায় অংশ নিলে সুফিয়া কামালও তাতে অংশ নেন। এই সময় তিনি মুসলিম-বিধিবিধান-সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে বাঙালি হিন্দু নারীদের অনুকরণে কপালে লাল-টিপ পরেন। তিনি প্রথম ভারতবাসী নারী যিনি

---

[১] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, শতাব্দীর শেষ প্রতিভূ : স্মৃতি তর্পণ, উদ্ধৃত, সৈয়দ শামসুল হক(সম্পা.), *জননী সাহসিকা বেগম সুফিয়া কামাল : শেষ প্রণতি*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫-২৬

[২] ড. হামিদা বানু, সুফিয়া কামালকে শ্রদ্ধাঞ্জলি, উদ্ধৃত, সেলিনা খালেক সম্পাদিত, *মহিলা সমাচার*, সুফিয়া কামাল সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮২

উড়োজাহাজে ভ্রমণ করেন। নতুন যুগের নতুন দাবীকে তিনি সপ্রাণে গ্রহণ করেছেন। ১৯৫১ সালে চট্টগ্রামে পশ্চিম বাংলা থেকে আগত শিল্পী-কুশলীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও এদেশের অনেক বিখ্যাত শিল্পীই অংশগ্রহণ করেননি । কারণ সরকারি-মহলের নজরে পড়ে চিহ্নিত হওয়ার ভয় ছিল তাদের। কিন্তু সুফিয়া কামাল সব নিষেধকে অগ্রাহ্য করে সেই সম্মেলনের প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেছেন। সেদিন তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন–

> বিশ্বের সঙ্গে, সকল জাতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় যত নিবিড় হবে, ততই আমাদের মনের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি দূর হবে। ফলে আমাদের সাহিত্য হবে সুদূরপ্রসারী ও বহু বিস্তৃত।[১]

পাকিস্তানবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাঁর সাহসী উচ্চারণ তাঁকে একজন প্রগতিবাদী, আধুনিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এতৎপ্রসঙ্গে সন্তোষ গুপ্তের মন্তব্য স্মরণীয় :

> যেখানে অশুভ শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সেখানেই তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বেগম সুফিয়া কামাল এগিয়ে গেছেন। ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় নারীশিক্ষা মন্দিরের (বর্তমান শেরে বাংলা কলেজ) প্রতিষ্ঠাত্রী লীলা রায়-এর সঙ্গে মহিলাদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন শান্তি কমিটি। ... স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে ঢাকায় করনেশন পার্কে মহিলা সমিতির সমাবেশে পুলিশের লাঠিচার্জ, মহিলা নেত্রীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদ করেছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল। যুঁই ফুল রায় ও নিবেদিতা নাগের সঙ্গে গড়ে তুলেছিলেন পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি। ... বহু নারী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদসহ আরও বহু সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন বেগম সুফিয়া কামাল। ... প্রতিকূল সময়ে বেগম সুফিয়া কামালকে দেখা গেছে পুরোভাগে। নিষেধের ভ্রুকুটি, ভয়ের শাসন ভাঙা সকল আয়োজনে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন পুরোভাগে। রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালন, ছায়ানট প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান ও ভূমিকা ছিল অগ্রবর্তী সেনানীর মতো। স্বাধীন বাংলাদেশেও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে কোথাও আপোস করেননি।[২]

স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রেম ছিল তাঁর সত্তাজাত। কায়েদে আযমকে স্মরণ করে একসময় কবিতা লেখেন কিন্তু যখন মাতৃভাষার ওপর আঘাত এলো, পুলিশের গুলিতে সালাম, রফিক, জব্বার প্রমুখ ভাষাসৈনিক মৃত্যুবরণ করলেন, তখন তিনি কায়েদে আযমকে শ্রদ্ধা নয়, ঘৃণা প্রকাশ করেন এক মুহূর্ত কালক্ষেপণ না করেই। ১৯৫৩ সালে প্রভাত-ফেরির নেতৃত্ব দান করেন তিনি। নেতৃত্ব দেন ৬৯-এ পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদ আসাদের শোক-মিছিলে। দেশ ও দেশের

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৪৫

[২] সন্তোষ গুপ্ত, বেগম সুফিয়া কামাল:শতাব্দীর শেষ সূর্য অস্ত গেল, উদ্ধৃত, সৈয়দ শামসুল হক(সম্পা.), *জননী সাহসিকা বেগম সুফিয়া কামাল : শেষ প্রণতি*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৮

সংকট তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করতো। জীবনাবসানের কিছুদিন পূর্বেও দেশকে নিয়ে ছিল তাঁর অন্তহীন ভাবনা :

> এই দেশটার কি হবে? দেশটাকে নিয়ে কেউ চিন্তা করে বলে মনে হয় না। সমাজে যে অবক্ষয় হচ্ছে। আমাদের নতুন প্রজন্ম হচ্ছে সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, মাস্তান ও মাদকাসক্ত। রাজনীতি একটা ব্যবসা হয়ে গেছে। রাজনীতিবিদরা ছাত্র সমাজটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।[১]

হতাশচিত্তে তিনি আরও বলেছেন :

> এমন সময় আর বাঁচতে চাই না যখন দেশে কোন মনীষী নেই, সৎ রাজনীতিবিদ নেই।[২]

দেশ-ভাবনায় জাগ্রত কবি স্বপ্নময় আশাবাদের কথাও জিইয়ে রাখতেন হতাশাকে প্রশ্রয় না দিয়ে। তাই সবাইকে উৎসাহিত করে তিনি বলেছেন :

> পাষাণ ভেদ করে যেমন নির্ঝর বের হয়ে আসে তেমনি সাহস নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে অধিকার আদায়ের দাবিতে।[৩]

অধিকার শব্দটির গুরুত্ব ও প্রয়োগের বীজমন্ত্র তিনি মানুষের অন্তরে রোপণ করে দিতে চেয়েছেন। শতভাগ অধিকার প্রয়োগ করে একজন মানুষ কীভাবে বিত্তহীন হয়েও নিজেকে সবল ও অস্তিত্ববান মানুষ রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তা সুফিয়া কামাল প্রমাণ করেছেন। তাঁর বিরলপ্রজ ব্যক্তিত্ব এদেশের নারীদের জন্য হতে পারে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। সুফিয়া কামালের কন্যা মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামালের ভাষ্য এক্ষেত্রে উদ্ধৃতিযোগ্য :

> কবে, কোনকালে স্তরে স্তরে প্রোথিত কঠিন অচলায়তনের মধ্যে বসেই কোনো এক কোমল নতুন কিন্তু অসম সাহসে বলীয়ান রমণী হাতে তুলে নিয়েছিলেন সুচ-সুতো। নিজের জন্য অর্জন করে নেবেন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, তা যত তুচ্ছ আকারেই হোক না কেন। বই হাতে তুলে নিয়ে বলিষ্ঠ হাজির হয়েছেন বিদ্যালয়ে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হবেন না কিছুতেই। সেই আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন আরো অনেকের মনে। সকলের সাথে এক সারিতে দাঁড়িয়ে প্রয়োগ করেছেন ভোটের অধিকার তা যত সাধারণ অধিকারই হোক না কেন। এই পথ বেয়ে আজ আমরা পেয়েছি রাজপথের সন্ধান, মাথা উচুঁ করে দাবি করতে পারি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক ক্ষমতার আরোহণের যোগ্যতা, সংসার-জীবনে সম-অধিকার, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা থেকে মুক্তি। নেতৃত্ব দিতে পারি গণতান্ত্রিক আন্দোলন, স্বৈরাচারের পতনের দাবিতে, যুদ্ধাপরাধের বিচারের উদ্যোগে। এসব তো হঠাৎ করে উড়ে আসা ঘটনা নয়, দিনে দিনে এক এক করে এর ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। সেখানেও তারা আমাদের প্রথম স্তরটি গেঁথে দিয়েছেন, বুনে গিয়ে আড়াল করে রেখেছেন শত বিপদের আশঙ্কা থেকে, হৃদয়ের কঠিনতা

---

[১] নাহার আহমেদ, সুফিয়া খালার ছবি আর তোলা হবে না, উদ্ধৃত, সেলিনা খালেক সম্পাদিত, *মহিলা সমাচার*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৪

[২] বেলা নবী, অনন্ত প্রেরণার প্রতীক 'জননী সাহসিকা'র প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৮

[৩] প্রাগুক্ত

> দিয়ে এগিয়ে দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে, কোমলতা দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছেন পথের ক্লান্তি, অসফল শ্রমের ব্যর্থতার গ্লানি। উদ্দীপিত করেছেন নতুন শক্তিতে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে।
>
> নদী আর উৎসমুখে ফিরে যায় না কখনো। কিন্তু সেই উৎসের কাছেই তার জন্মের ঋণ। আমরাও উৎস ছেড়ে চলে এসেছি বহুদূরে। তাদের অনেককিছুর সাথেই হয়তো আজ আমাদের অনেককিছুর অমিল। কিন্তু জন্মের ঋণ তো সেই উৎসের কাছেই ঋণস্বীকারের তাগিদেই ফিরে চাই তাদের দিকে বারে বারে। তারা আমাদের সকল কর্ম সকল যজ্ঞে মিশে আছেন আলোর মতো, নিঃশ্বাসের মতো। তাদের কাছেই শিক্ষা আমাদের কঠিনে-কোমলে অশুভ, অমঙ্গল, অসত্যকে প্রত্যাখ্যান করে মঙ্গল, শুভ কল্যাণ আর সত্যকে কাছে টেনে নেয়ার।[১]

কেবল পাকিস্তানের অপশাসন নয়, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়েও অপশাসনকে সমূলে উৎপাটিত করার এক ইস্পাতদৃঢ়-প্রত্যয়ে সোচ্চার ছিলেন তিনি। সমাজকর্মী ও রাজনীতিক বেবী মওদুদ তাঁর প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতায় তুলে ধরেছেন সুফিয়া কামালকে :

> তিনি আইয়ুব, ইয়াহিয়া, জিয়া ও এরশাদের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সাহসী উচ্চারণ করেছেন। তাঁকে ভয় দেখিয়ে কখনও কেউ এতোটুকু নীতিভ্রষ্ট করতে পারেনি, তাঁর সাহস ও ধৈর্য ছিলো অসীম। লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতি এতোখানি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন কখনও কাউকে তোয়াক্কা করতেন না। নির্লোভ, বিনয় ও সৌজন্যবোধ তার ব্যক্তিত্বকে সবকিছু চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছিলো। তিনি আমাদের জীবনের এক উজ্জীবনী শক্তি ছিলেন, ঘুম ভাঙানিয়া গান গেয়ে জাগাতেন। ওঠ জাগো, সমাজ ও দেশের জন্য কিছু কাজ করো। মানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করো। দুঃখ-কষ্ট মলিনতা মুছে ফেলো।[২]

ধর্মীয় গোঁড়ামিকে তিনি বরাবরই প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের নিন্দা করতেন তিনি, ধর্মের নামে যারা অধর্ম করে। বায়তুল মোকাররমের ইমাম মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিলেন বলে তাঁর মাধ্যমে জানাজা না পড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন সুফিয়া কামাল। এমনকি তাঁর জানাজা পড়াতে কেউ অস্বীকার করলে লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্তও সবাইকে জানিয়ে দেন। এমন অনমনীয় দৃঢ় ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন তিনি। কঠোর কথা না বললেও শত্রুপক্ষ তাঁকে আশ্চর্য রকম ভয় পেতো। তাঁকে কখনও 'মুরতাদ' হিসেবে আখ্যা দিতে মৌলবাদীরা দুঃসাহসী হতে পারেনি। ১৯২৯ সালে তিনি 'সওগাত' সম্পাদক নাসির উদ্দিনকে লিখেছিলেন–

> আমি খবরের কাগজ পড়ি না। দুনিয়ার কোন কোন খবর আমার একেবারেই অজ্ঞাত আছে। যেটুকু পাই সাপ্তাহিক সওগাতে। তাতেই কিছু কিছু জ্ঞান আমার হচ্ছে। এই যে যুগের ধর্মে যুগ জাগরণের চাঞ্চল্য– এই অন্ধকূপসম মোসলেম ঘরের নারীদের মনেও মুক্তির আলোর রেখাপাত করতে শুরু করেছে। কিন্তু সে আলোর উপরও গোনাহগারীর বিভীষিকাময় পর্দা টেনে দিচ্ছেন শরীফ খান্দানের পুরুষেরাই। আমি

---

[১] সুলতানা কামাল, আমার সকল কর্মে সকল যজ্ঞে আলোর মতো মিলে আছেন আমার মা, উদ্ধৃত, সন্তোষ গুপ্ত সম্পাদিত, *বেগম সুফিয়া কামাল স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩০-১৩১

[২] বেবী মওদুদ, মা চলে গেলেন, উদ্ধৃত, সৈয়দ শামসুল হক(সম্পা.), *জননী সাহসিকা বেগম সুফিয়া কামাল : শেষ প্রণতি*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৪-৫৫

> পথের কাঁটা সরিয়ে যাব– এরপর যারা আসবে যেন কাঁটা না ফুটে তাদের পায়, তাঁরা যেন কন্টকবিদ্ধ পদে পিছিয়ে না পড়ে। ওইটুকু আমি করব আমার যতটুকু শক্তি আছে তা দিয়ে।[১]

সুফিয়া কামালের কবিতায় দুর্মুখ সময় যেমন চিত্রিত হয়েছে তেমনি প্রতিবিম্বিত হয়েছে শান্ত-সৌম্য পরিশীলিত রূপচিত্র। 'উদাত্ত বাংলা', 'আমরা নেমেছি সংগ্রামে', 'ঊনসত্তরের এই দিনে', 'বাহান্ন থেকে চৌষট্টি পরিক্রমা', '৮ই মার্চ, নারী দিবস', 'ম্যান্ডেলা', 'মিছিল', 'অরণ্য কন্যারা জাগে', 'মায়ের গর্কি', 'হে মানুষ! জেগে ওঠো' প্রভৃতি কবিতায় দেশ, মানুষ, স্বাধীনতা, রাজনীতির প্রসঙ্গ উপস্থাপনে কবির স্বাদেশিক চেতনাবোধ যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি 'ফাল্গুনরাত্রি', 'মধুগন্ধা', 'বৈশাখ', 'কুসুমের মাস', 'আকাশ-মৃত্তিকা', 'নীড়', 'সমুদ্র হৃদয়', 'সূর্যমুখী', 'মুগ্ধা', 'ধান শালিকের দেশ' কবিতায় প্রকৃতি-চেতনাও এক অ-জাগতিক অনুভবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই ঐক্যবোধের সমন্বয় তাঁর কবিতাকে দিয়েছে অনন্য মাত্রা। সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ আবুল ফজল তাঁকে মূল্যায়ন করেছেন এভাবে :

> আমাদের কবিতার ক্ষেত্রে সুফিয়া কামাল এক অবিস্মরণীয় নাম। এত দীর্ঘকাল ধরে একটানা আমাদের অন্য কোন মহিলা কবিতা চর্চা করেছেন কিনা সন্দেহ। কবি কেন, সব লেখকেরই রয়েছে দ্বৈত ভূমিকা– একটি নিজের প্রতি, আর একটি নিজের দেশ আর সমাজের প্রতি অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে মানুষের প্রতি। সর্ব অবস্থায় সুফিয়া কামাল যুগপৎ এই দুই ভূমিকাই পালন করে এসেছেন।[২]

জীবনকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তাঁর অসীম এবং সে ক্ষমতার প্রকাশ তাঁর রচনাকর্মে অসাধারণ নৈপুণ্যে প্রতিফলিত।

সুফিয়া কামালের পরিচ্ছন্ন জীবনবোধ ও সূক্ষ্ম-পর্যবেক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সাহিত্যকর্মে। জীবনকে তিনি দেখেছেন ইতিবাচক-দৃষ্টিতে। তিনি মানুষকে সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন। মানুষের কল্যাণই ছিলো তাঁর সারাজীবনের সাধনা। তাঁর সংগ্রামশীল জীবনক্ষেত্রে যারা তাঁকে আনুকূল্য দিয়েছেন, তাদের যেমন কল্যাণ কামনা করেছেন তেমনি তাঁর বিরুদ্ধাচরণকারীরও কল্যাণ কামনা করেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল কাঁচের মতোই স্বচ্ছ ও নির্মল। সে-নির্মলতায় শত্রুকেও তিনি ক্ষমাশীল অনুভবে সিক্ত করেছেন। তবে এ মনোভাব তাঁর নিজস্ব পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু দেশ ও মানুষের ক্ষতিকারী বা ধ্বংসকারীদের তিনি ক্ষমা করেননি। ড. আনিসুজ্জামান সুফিয়া কামালকে মূল্যায়ন করেছেন এভাবে :

> সবার কথা তিনি ভেবেছেন, সবার মঙ্গল তিনি চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গানের কথার মতো একবার তিনি বলেছেন, যাঁরা তাঁর আনুকূল্য করেছেন, তিনি তাঁদের কল্যাণ চান, যাঁরা তাঁর প্রতিকূলতা করেছেন, তাঁদেরও কল্যাণ চান তিনি। এ কেমন হলো? শত্রুমিত্র নির্বিশেষ হয়ে গেল? সেটা তার

---

[১] রাখীদাশ পুরকায়স্থ, সুন্দর সমাজ-স্বপ্নের এক অপরাজেয় প্রতীক, উদ্ধৃত, সেলিনা খালেক সম্পাদিত, *মহিলা সমাচার*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৬

[২] *সুফিয়া কামাল : স্বনির্বাচিত কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২

> নিজের ক্ষেত্রে। যারা দেশের ক্ষতি করেছে, মানুষের ক্ষতি করেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম কিন্তু থেমে থাকেনি। ... সে সংঘাত আদর্শের, তাকে তিনি ব্যক্তিগত করে দেখেননি। আবার আদর্শগত মিল যাঁদের সঙ্গে, তাঁদের ভুলত্রুটি দেখিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হননি।[১]

সুফিয়া কামালের অন্তর্লোকে স্নেহ-মমতা ছিল ফল্গুধারার মতো সতত বহমান। এদেশের সন্তান প্রতিম মানুষের প্রতি তাঁর মাতৃস্নেহ ছিল বরাবরই অটুট। এর পরিচয় নিহিত রয়েছে তাঁর সাহিত্যকর্মে, বক্তব্যে, সাক্ষাৎকারে, আলাপ-চারিতায়। ১৯৯২ সালে 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ' তাঁকে 'বঙ্গজননী' উপাধিতে ভূষিত করে। এ বিরল সম্মান তিনি অর্জন করেন দেশমাতৃকার প্রতি যথার্থ অবদানের জন্য। তিনি 'জননী সাহসিকা'। আবদুল গাফফার চৌধুরী তাঁকে বলেছেন, 'বাংলা সাহিত্য জননী'। এ সম্পর্কে সুফিয়া কামালের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবনত মনোভাব তুলে ধরা হলোঃ

> নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে লন্ডনে এক সাহিত্যসভার মঞ্চে উপবিষ্ট বেগম সুফিয়া কামালকে লক্ষ করে আমি বলেছিলাম, 'আপনি বাংলা সাহিত্য জননী। তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন 'যাহ্' তুই খুব বাড়িয়ে বলছিস। আমি অত বড় নই।' ওই একটি ছোট্ট কথাতেই প্রকাশ পেয়েছিল, তিনি কত বড়! ... আমি কারো সঙ্গে তাকে তুলনা করব না। তবু বলব খণ্ডিত বাংলায় বেগম রোকেয়ার পর এমন মহীয়সী নারীর নাম আমার মনে আসে না। দশক ধরে বাংলা কবিতার প্রতিটি যুগের উৎরাই পেরিয়ে নিজেকে এবং নিজের কবিতাকে সজীব গতিময় রেখেছেন তা আমার কাছে বিস্ময়। শুধু কবিতায় নয়, সমাজচিন্তার ক্ষেত্রেও এমন অগ্রসরমনা এই বয়সের এক ব্যক্তিত্ব এ যুগে বিরল। ... শুনেছি, মস্কোতে এক সংবর্ধনা সভায় বেগম সুফিয়া কামালকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে এক রাশিয়ান তরুণ কবি বলেছিলেন, 'আপনি গোর্কির মা উপন্যাসের জননী'। এমন নিরহঙ্কার, অসাম্প্রদায়িক, মুক্তমনা, সাহসী ব্যক্তিত্ব, এমন সৃজনশীল প্রতিভা এবং স্নেহময়ী নারী শুধু এ যুগে নয়, সম্ভবত আগের যুগেও দুর্লভ ছিল। ... আমার মাতৃস্বরূপার মৃত্যু হলেও আমি জানি, আমার মায়ের মৃত্যু নেই।"[২]

এ দেশের নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সুফিয়া কামাল ছিলেন বরাবরই সোচ্চার। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান বেশ দুর্বল। যে নারী অসংখ্য ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে অর্জন করে মাতৃত্ব, সেই মাতৃত্বের স্বীকৃতিও নেই সমাজব্যবস্থায়। সন্তানের অভিভাবক হিসেবে পিতৃত্বের অবস্থান যেখানে অগ্রগণ্য, সেখানে মাতৃত্বের অবস্থান অস্বীকৃত। এ বৈষম্যময় সমাজ-প্রাকার ভাঙার অস্ত্র তুলে নিয়েছেন সুফিয়া কামাল। তিনি উপলব্ধি করেছেন- নারীর অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সর্বস্তরে। তিন তাঁর সন্তানদের বলতেন–

---

[১] আনিসুজ্জামান, তিনি যে তিনিই, উদ্ধৃত, সৈয়দ শামসুল হক(সম্পা.), *জননী সাহসিকা বেগম সুফিয়া কামাল : শেষ প্রণতি,* প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮-১৯

[২] সেলিনা হোসেন, মৃত্যুহীন প্রাণ, উদ্ধৃত, সন্তোষ গুপ্ত সম্পাদিত, *বেগম সুফিয়া কামাল স্মারক গ্রন্থ,* প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০৮

> কখনও কোন কাজে নিরাশ হবি না। লেগে থাকবি ফল আদায়ে। আর মেয়েদের স্বার্থের কাজ–বাধা তো দেবেই পুরুষরা।[১]

তিনি বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নারী-নেতৃত্বের পক্ষেই এ-অধিকার আদায় করা সম্ভব। হিংসা-বিদ্বেষ- সংঘাত নয়, মানবধর্ম বিকশিত হোক, জাগ্রত হোক সর্বস্তরের বাঙালির বিবেক– এই ছিলো তাঁর অন্তরতম কামনা।

জীবনকে তিনি দেখেছেন সত্যের আলোকে। উজ্জ্বল ও হিরণ্ময় জ্যোতিতে বিকশিত হোক মানুষ, শুদ্ধতার পরিমণ্ডলে পূর্ণ হোক জীবন– এই মন্ত্র-ব্রতে ব্রতী ছিলেন সুফিয়া কামাল। তাঁর দৃষ্টিতে সবার উপরে ছিল মানবতা; ধর্ম নয়, বর্ণ নয়, কোন দল বা গোষ্ঠী নয়। মনুষ্যত্বের প্রয়াণে তিনি দুঃখবোধ করেছেন, কাতর হয়েছেন; ঝাঁপিয়ে পড়েছেন অসুরের বঙ্কিম ও সর্বনাশা রূপের বিরুদ্ধে। প্রকৃতির তুচ্ছ উপকরণও তাঁর নিকট সৌন্দর্যের সারল্যে যেমন রূপময়, তেমনি আধুনিক শিল্পভিত্তিক রাষ্ট্রের উৎপীড়ন ও যন্ত্রণার অবসানে তিনি সতত নিরলস আবেদনরত। তাঁর এই চেতনাবোধই তাঁকে করে তুলেছে কালোত্তীর্ণ, বিশ্বপ্রসারিত, মৃত্যুঞ্জয়ী ও চিরঞ্জীব।

---

[১] বেবী মওদুদ, সুফিয়া কামাল : শতাব্দীর সাহসিকা জননী, উদ্ধৃত, বেবী মওদুদ (সম্পা.), *নারী নেতৃত্ব*, প্রথম প্রকাশ, পারিজাত প্রকাশনী, ১৪১৬, পৃষ্ঠা-৪৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ
কবিতা

কবি সুফিয়া কামালের কাব্যগ্রন্থ ১১টি। এগুলো হচ্ছে : *সাঁঝের মায়া* (১৯৩৮), *মায়াকাজল* (১৯৫১), *মন ও জীবন* (১৯৫৭), *উদাত্ত পৃথিবী* (১৯৬৪), *ইতল বিতল* (১৯৬৫), *দীওয়ান* (১৯৬৬), *প্রশস্তি ও প্রার্থনা* (১৯৬৮), *অভিযাত্রিক* (১৯৬৯), *মৃত্তিকার ঘ্রাণ* (১৯৭০), *মোর যাদুদের সমাধি 'পরে* (১৯৭২), *নওল কিশোরের দরবারে* (১৯৮১)। এগুলোর মধ্যে দুটি গ্রন্থ শিশুতোষ; একটি *ইতল বিতল* অন্যটি *নওল কিশোরের দরবারে*। সুফিয়া কামাল বহুরৈখিক সৃজনশীলতায় সম্পৃক্ত থাকলেও তাঁর সৃজনকর্ম উজ্জ্বলভাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে কবিতা রচনায়। তিনি সহজ-সরল ভঙ্গিতে সর্বসাধারণের বোধগম্য করে কবিতা লিখেছেন। সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত ধারা, বিশেষত রবীন্দ্র-নজরুলের কাব্যধারায় সিঞ্চিত হয়ে তিনি রচনা করেছেন কবিতা। দেশজ উপকরণ ও প্রকরণের প্রতি অসন্দিগ্ধ বিশ্বাস ও মর্যাদাবোধই তাঁকে খাঁটি বাঙালি কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আরোপিত বোধ-বুদ্ধির পরিবর্তে ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকার ও স্বকীয় উপলব্ধিকে সম্বল করে সুফিয়া কামাল তৈরি করেছেন নিজস্ব এক কবিতার জগৎ। অবশ্য কবিতাচর্চার প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্র-নজরুলকে অনুসরণ না করার জন্যে অনেকেই তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশে সুফিয়া কামালের জবাব ছিল এরকম :

> কেন আমি তা করতে যাবো? আমি কি একজন বাঙালি কবি নই? বাংলা ভাষায় আমি লিখছি না? রবীন্দ্র-নজরুল কি আমাদের কাব্যধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ নন? আমাদের বাঙালি কবিদের প্রথমেই নিজেদের কাব্য-সত্তাকে জানতে ও পড়তে দিতে হবে এবং তারপরেই অন্যদের কাছ থেকে জানা ও গ্রহণ করার কাজটা করতে হবে।[১]

তাঁর এ উক্তিতে পুর্বসূরি কবিদের প্রতি আনুগত্য, স্বভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও দায়িত্ববোধের আস্থাশীল প্রকাশ লক্ষণীয়। পূর্বসূরির প্রভাব স্বীকরণ করে তিনি যে কবিতাচর্চায় মনোযোগী ছিলেন তা তাঁর এ উক্তির মাধ্যমে স্পষ্টই অনুভব করা যায়।

সুফিয়া কামালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *সাঁঝের মায়া*। এর প্রকাশকাল ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে। এ-কাব্যে মোট ২৮টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। *সাঁঝের মায়া* কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ভূমিকাটি নিম্নরূপ :

> কয়েক বৎসর আগের কথা কল্যাণীয়া কবি সুফিয়া এন. হোসেন তখন হেরেমের বন্দিনী বালিকা। তাঁর স্বর্গত স্বামী আমার অনুজ প্রতিম বন্ধু সৈয়দ নেহাল হোসেন সাহেব আমায় কয়েকটি কবিতা দেখতে দিলেন। আমার বিশ্বাস হল না যে, সে কবিতা কোন মুসলিম বালিকার লেখা। আমারই

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ : প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩

> উৎসাহে অনুরোধে বোরকা-নেকাবের অন্ধস্তূপ থেকে সেই কবিতার মুকুলগুলি সলজ্জ শংকায় আত্মপ্রকাশ করল।
>
> আজ কবি সুফিয়া যখন স্বনামধন্যা তখন সবচেয়ে আনন্দিত হতেন, গৌরববোধ করতেন যিনি সেই শ্রীমান নেহাল হোসেন নাই। তাঁরি উৎসাহ দখিন-হাওয়ার মত সুফিয়ার কবিতার দলগুলি বিকাশে সহায়তা করেছিল। ঘেরা- টোপ-ঢাকা পিঞ্জরের বুলবুলকে তিনিই মুক্তি দিয়েছিলেন, বুঝি এই অপেক্ষা তিনি করেছিলেন। বদ্ধ বুলবুলের কণ্ঠ যখন অবগুণ্ঠনের বাধা অতিক্রম করে দিগ্‌দিগন্তে ধ্বনিত হ'ল, তখন মুক্তিদাতারও মুক্তিক্ষণ এল। কিন্তু সেই বিদায় 'সাঁঝের মায়া'য় শাশ্বত হয়ে রইল! তার অবেলায়-বিদায় নেওয়া বন্ধুকে, প্রিয়তমকে স্মরণ করে বুলবুলের কণ্ঠে সে সকরুণ সুর অনুরণিত হয়ে উঠল। তার তুলনা যে কোন সাহিত্যে বিরল। বেদনার এই ঘন বর্ষণ না হলে বুঝি গানের পাখী এ গান গাইত না, বনের চোখে যুঁই ফুলের অশ্রু ঝরত না।
>
> 'সাঁঝের মায়া'র কবিতাগুলি সাঁঝের মায়ার মতই যেমন বিষাদ-ঘন, তেমনি রঙ্গীন-গোধূলীর রঙের মত রঙ্গীন। এ সন্ধ্যা কৃষ্ণা-তিথির সন্ধ্যা নয়, শুক্লা চতুর্দ্দশীর সন্ধ্যা।
>
> প্রতিভার পূর্ণচন্দ্র আবির্ভাবের জন্য বুঝি এমনি বেদনা-পুঞ্জিত অন্ধকারের, বিষাদের প্রয়োজন আছে। নিশীথ-চম্পার পেয়ালায় চাঁদনীর শিরাজী এবার বুঝি কানায় কানায় পুরে উঠবে। বিরহ যে ক্ষতি নয় 'সাঁঝের মায়া'ই তার অনুপম নিদর্শন। এমনি কবিতার ফুল ফোটাতে পারলে কাব্যমালঞ্চের যে কোন ফুলমালি-কবি নিজেকে ধন্য মনে করতেন। সুফিয়া এন. হোসেন বাঙলার কাব্যগগনে নবোদিতা উদয়তারা। অস্ত তোরণ হতে আমি তাঁকে যে বিস্মিত মুগ্ধচিত্তে আমার অভিবন্দনা জানাতে পারলাম। এ আনন্দ আমার স্মরণীয় হয়ে থাকবে।[১]

সাঁঝের মায়া কাব্যগ্রন্থটির মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুফিয়া কামালের কবিত্ব-শক্তির প্রশংসা করে বলেছেন :

> তোমার কবিত্ব আমাকে বিস্মিত করে। বাংলা সাহিত্যে তোমার স্থান উচ্চে এবং ধ্রুব তোমার প্রতিষ্ঠা। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো।[২]

রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের আশীর্বচন নিঃসন্দেহে সুফিয়া কামালের জন্য হয়ে উঠেছে ইতিবাচক ও প্রেরণাসঞ্চারী। তাঁর কবি হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে এর মূল্য অশেষ।

সুফিয়া কামালের কবিতার বিষয় বৈচিত্র্যময়। প্রেম, বিরহ, প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ের পাশাপাশি তিনি যেমন স্মৃতিচারণমূলক কবিতা লিখেছেন, ঠিক তেমনি ব্যক্তিস্মৃতি, দেশপ্রেম ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি অবলম্বন করেও কবিতা নির্মাণ করেছেন। অবশ্য তাঁর বিরহবিষয়ক কবিতাগুলো শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। প্রেম- প্রকৃতি- বিরহের মিলিত দ্যোতনায় তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে নান্দনিক সৌন্দর্যে সুশোভিত। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মজির উদ্দীনের মন্তব্য স্মরণীয় :

> বাংলার শ্যামল প্রান্তর, তার বনে-কান্তারে প্রস্ফুটিত কুসুম-রাজি, কুঞ্জে কুঞ্জে দোয়েল-শ্যামার প্রাণ-মাতানো সঙ্গীত-লহরী, 'সমুদ্র-মেখলা-নদী পরিবৃতা পালল প্রভৃতি দিগন্তবিস্তৃত সুনীল আকাশ',

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ : প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৫৯-৬৬০

[২] ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *সুফিয়া কামাল*, ২০০৭, পৃষ্ঠা-১৮২

> ষড়ঋতুর বিচিত্র সমারোহ, প্রভাতের অরুণরাগ, সন্ধ্যাকাশের ইন্দুধনুচ্ছটা কবির প্রাণে সহজ স্বাক্ষররূপে প্রতিভাত হয়েছে। এদেশের পথে প্রান্তরে নদী খাল বিলের গানের যে আনাগোনা তাই-ই কবিকে গান গাইয়েছে। তাঁর কাব্যে প্রকৃতি কথা বলে উঠেছে।[১]

প্রেমের শাশ্বত ও চিরন্তনী রূপ-বিভায় ঔজ্জ্বল্য পেয়েছে তাঁর প্রেম-বিষয়ক কবিতাগুলো। প্রকৃতির অনুষঙ্গে বর্ণিত প্রেমের বহ্নিশিখা পেয়েছে মনোহারী ঔজ্জ্বল্য। কখনো বা 'কস্তুরী মৃগসম' প্রেম মুগ্ধ করে মনকে। তাঁর প্রেম কখনো বর্ণহীন শুভ্র রজনীগন্ধার মতো, কখনো বৈষ্ণব পদাবলির প্রেমের মতো বিরহবোধে আচ্ছন্ন, কিংবা প্রকৃতির অনুষঙ্গে দীপ্তিময়। *সাঁঝের মায়া* কাব্যগ্রন্থে কবির প্রেমানুভূতি নিবিড়-সৌন্দর্যে হয়ে উঠেছে মূর্ত। এ গ্রন্থের 'এ নিশি অনন্ত হোক বঁধু', 'অনন্ত পিপাসা', 'রজনীগন্ধা', 'পুষ্পিত উৎসব', 'পুনর্মিলনের রাতে', 'আমি আর চাহিব না তবে', 'তুমি আর আমি' প্রভৃতি কবিতায় প্রেমানুভবই মুখ্য। প্রত্যাশা ও অচরিতার্থতার দ্বন্দ্বময়তায় তাঁর প্রেমবোধ হয়ে উঠেছে একান্তই রোমান্টিক :

> তৃতীয়া সন্ধ্যাকাশে এল চাঁদ স্নিগ্ধ হাসি নিয়া।
> সিন্ধুতে লাগিল দোলা; চিত্ত-তীরে মরে আছাড়িয়া,
> সে কি ক্ষুব্ধ উত্তরোল! চাঁদ নহে! ছায়া মাত্র তার,
> তাহারি লাগিয়া এত! এত তার শক্তি দুর্নিবার !
> (অনন্ত পিপাসা : *সাঁঝের মায়া*)

স্পষ্টত রোমান্টিক ভাবপ্রবণতা সুফিয়া কামালের কাব্যিক সৌন্দর্যের মৌল অনুষঙ্গ। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের মন্তব্য লক্ষণীয় :

> বেগম সুফিয়া কামালের মূল প্রবণতা রোমান্টিক। বিশেষ করে প্রথম দুটি গ্রন্থের কবিতায় তার প্রচুর স্বাক্ষর বিদ্যমান। ... প্রথম পর্যায়ের কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতি বেগম সুফিয়া কামালের কাব্যধ্যানের প্রধান উৎস। তাঁর মধ্যে প্রেমানুভবই মুখ্য। বাংলাদেশের ঋতু বৈচিত্র্যে তিনি অভিভূত। কিন্তু প্রকৃতির চিত্র তাঁর কবিতায় প্রধানত আসে প্রেমের সহচর হয়ে।[২]

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের বক্তব্যই যেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিম্নোক্ত চরণগুচ্ছে–

> শুনিনু শ্রাবণ ভরি, নাসারন্ধ্র ভরিল সুবাসে
> বহুদূর বনান্তের প্রান্ত হতে ভেসে যেন আসে
> তোমার আহ্বান লয়ে কণ্টকিতা কেতকীর বাস।
> হেরিণু শ্রাবণ-স্বপ্ন লভিলাম পরম আশ্বাস।
> আবার আসিবে বহি শ্রাবণের সিক্ত সমীরণ

[১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৭
[২] ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *সুফিয়া কামাল*, ২০০৭, পৃষ্ঠা-১৬১

তোমার আহ্বান । দেখো যেন ব্যর্থ না হয় সে-ক্ষণ।

(শ্রাবণ স্বপ্নে : *মায়া কাজল*)

সুফিয়া কামাল তাঁর কাব্যসাধনার প্রথম পর্যায়ে নিদারুণ বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত ছিলেন, যার প্রভাব তাঁর কবিতায় নানাভাবে পড়েছে। দাম্পত্যজীবনের অকস্মাৎ ও অনাকাঙ্ক্ষিত দুঃখ ও বেদনাবোধকে তিনি একজন জীবনমুখী কবির মতোই অতিক্রম করতে পেরেছেন। আত্মগত বেদনা ও যন্ত্রণাকে তিনি শিল্পিত ভঙ্গিতে রূপায়িত করেছেন কবিতার শব্দমালায়। উপমা-উৎপ্রেক্ষা- রূপক- চিত্রকল্পে সে অভিজ্ঞতাকে সার্থক ও সুন্দর করে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর ব্যক্তিক প্রেমোপলব্ধি হয়ে উঠেছে সর্বসঞ্চারী :

তোমার আকাশে দাও মোর মুক্ত বিচরণ-ভূমি,
শিখাও আমারে গান। গাহিব, শুনিব শুধু তুমি।
মুক্ত-পক্ষ এ-বিহগী তোমার বক্ষেতে বাঁধি নীড়
যাপিবে সকল ক্ষণ স্থির হয়ে, চঞ্চল অধীর।
আঁধার গুণ্ঠন টানি কানে কানে কব সেই কথা
যে-কথা গুমরে বক্ষে প্রকাশের কত ব্যাকুলতা!
তব শান্ত স্নিগ্ধ স্পর্শ লভি'
এ দেহ-ধূপের ধুম বিথারিবে মৃদুল সুরভি।
অজস্র নক্ষত্রপুঞ্জে অনির্বাণ উৎসব দেয়ালী
তোমার আকাশে শোভে ; হেথা মোর প্রতিদিন খালি
চিত্ত করে নিত্য অভিসার
তোমাতে মিশায়ে যেতে, প্রিয়তম নিশীথ আমার!

(আমার নিশীথঃ *সাঁঝের মায়া)*

কবির প্রেমানুভূতি কখনও কখনও হয়ে উঠেছে প্রাকৃতিক অনুষঙ্গবাহী :

খুলিনু অর্গল মোর। বাহিরের কোলাহল সনে
প্রদীপ্ত দীপের আলো লুটাইল আমার অঙ্গনে,
আনন্দে অধীরা জুঁই, জবা তার রক্তরাঙা রাগে,
যেন তারা সম্পূর্ণতা মাগে।

(পুষ্পিত উৎসব : *সাঁঝের মায়া*)

সুফিয়া কামালের দাম্পত্য-প্রেম কবিতার গভীর উৎস হিসেবে ক্রিয়াশীল। এ প্রেমকে কবি হাসান হাফিজুর রহমান 'অশ্রুকণা'র কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী এবং 'নতুন খাতা'র কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একাকার করে প্রত্যক্ষ করেছেন–

গিরীন্দ্রমোহিনীতে এই প্রেম আবরণমুক্ত ও প্রত্যক্ষ; উপরন্তু তিনি একে জীবনজিজ্ঞাসার এবং সৃষ্টিরহস্য ও দর্শনের উৎস স্বরূপও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সুফিয়া কামালের নিকট এই প্রেম আচরিত

সৌন্দর্যানুভূতিমূলক। তাঁর কাছে এর ভিত্তি জীবন জিজ্ঞাসা নয়, জীবনাবেগ। অপরপক্ষে কিরণধন অনেকক্ষেত্রে চটুল, গভীর দুঃখ সহজ করে দেখেছেন, বিয়োগের অবধারিত সত্য স্বাভাবিক শোকে স্বীকার করেছেন, সুফিয়া কামালের কাছে অবস্থাটা তেমনভাবে গৃহীত হয়নি। তিনি বরং সম্পৃক্তিতে, হতাশায়, ক্ষতিতে অনেক বেশি একাগ্র, আহত, আকুল এবং উৎকণ্ঠিত। ... তবে সুফিয়া কামালের বৈশিষ্ট্য এই যে, পাওয়ার আনন্দে কিংবা বিয়োগব্যাথাতেই মাত্র তিনি নিঃশোষিত নন। পৃথিবীর ব্যাপ্তির মধ্যে তিনি জীবনের মূল্য খুঁজতে চেয়েছেন পরিশেষে। তাঁর এই অন্বেষা প্রতিক্রিয়াজাত নয়, বাঁচার তাগিদে নিজস্ব পাথেয় খোঁজার প্রচেষ্টাও এ নয়। বস্তুত তিনি মজ্জাগতভাবে প্রেমানুভূতির কবি। এই প্রেমানুভূতি যেমন প্রকৃতি ও ব্যক্তি-প্রেমের ভোগ ও বিরহের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, পরবর্তী সময়ে তেমনি তা মানুষের কল্যাণ প্রচেষ্টার সমর্থনে ও সহানুভূতিতে জীবনকে ভালোবাসার মধ্যে মূর্ত।[১]

সুফিয়া কামালের কবিতায় প্রেমানুভব ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু বিরহবোধই সর্ববিস্তারী। তাঁর অনুভূতিলোকে যুগ- যুগান্তরের প্রেম-প্রণয়ের অবিনশ্বর ভাবনা কাব্যিক ব্যঞ্জনায় হয়ে উঠেছে মূর্ত :

তোমার হৃদয় জানি সুগভীর সাগরের অতলের মতো,
সেখানে জাগায় ঢেউ আমার চাঞ্চল্য অবিরত? ...
থালিকা সম্পূর্ণ হয় আনমনে গাঁথা মালিকায়
কখন স্মরণে আনো কোন রূপে, হে প্রিয় আমায়!
মদির বসন্ত রাত্রে, অথবা কি নিদাঘের তপ্ত তীব্র দিনে
বরষার ধারা সিক্ত পুষ্পপূর্ণ বিপিনে বিপিনে!
অথবা শরত প্রাতে সোনা ঝরা রোদমুঠি ধরে
আচম্বিতে মোরে মনে করে
প্রসন্ন তোমার দৃষ্টি প্রশান্ত অন্তরখানি ভরে
মৃদু হাস্য স্ফূরে ওষ্ঠাধরে।
হেমন্তের পত্র ঝরা মর্মরিত গানে
অপরাহ্নে পূরবীর তানে,
নহে ত শীতার্ত রাত্রি ভরি,
ভাব কি কেমন করি কাটিছে আমার এই দীর্ঘ বিভাবরী?

(সংলাপ : *দীওয়ান)*

ভানুসিংহঠাকুরের পদাবলীতে রবীন্দ্রনাথ মরণকে কৃষ্ণ-রূপে কল্পনা করে যেমন বলেছেন– 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান' ঠিক তেমনি সুফিয়া কামালের কবিতার পঙ্‌ক্তিমালায় অভিব্যঞ্জিত হয়েছে–

প্রহর-পক্ষিণী সম প্রিয় তব চরণ আশ্রয়ে
মৃত্যুরে সঁপিতে দেহ দ্বিধা নাই পরম প্রশ্রয়ে।

(এসেছ এসেছ তুমি *: দীওয়ান*)

[১] ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *সুফিয়া কামাল*, ২০০৭, পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৭

সম্রাট শাজাহানের কালজয়ী প্রেম-কীর্তিগাথা বর্ণিত হয়েছে 'তাজ' কবিতায় :

হে বন্ধু বিরহী !
প্রণয়-প্রতীক হয়ে প্রেম-বেদনায় রহি রহি
মর্মের মর্মর তব নিঃশব্দ ক্রন্দন
ব্যাকুলিয়া তুলিয়াছে এই মরু-তীর্থের পবন।
প্রেমিক সম্রাট তার প্রেমস্বপ্ন বেদনা-বিলাসে
রচিয়া গিয়াছে ছবি, হেরি যারে অন্তর উদাসে।
এ তাজমহল–
বিরহ-বেদনা-নীল-সিন্ধু-নীরে শুভ্র শতদল।
(তাজ : *মৃত্তিকার ঘ্রাণ*)

কবিতার শেষ দুটি চরণের সঙ্গে তুল্যমূল্য পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'সা-জাহান' কবিতার নিম্নোক্ত চরণদ্বয় :

শুধু থাক
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।
(সাজাহান : *বলাকা*)

সুফিয়া কামাল মূলত বাংলা রোমান্টিক কাব্যধারার অনুসারী। যে রোমান্টিক বেদনা-বিষণ্নতার সূচনা বাংলা কাব্যে প্রথম পরিলক্ষিত হয় বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্যে। পরবর্তীকালে তা শতধারায় পরিব্যাপ্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কাব্যধারা অবলম্বনে। ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা, আকাঙ্ক্ষা ও অচরিতার্থতার যে বহুমাত্রিক উপলব্ধি বাংলা রোমান্টিক কবিতাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে, তারই অনুরণন সুফিয়া কামালের কবিতায় স্পষ্ট।

সুফিয়া কামাল রোমান্টিক প্রেমের কবি। রোমান্টিক কবির বৈশিষ্ট্য তাঁর কবিতায় বৈচিত্র্যময়তায় প্রকাশিত। *সাঁঝের মায়া* (১৯৩৮), *মায়া কাজল* (১৯৫১), *মন ও জীবন* (১৯৫৭), 'দীওয়ান' (১৯৬৬), *মৃত্তিকার ঘ্রাণ* প্রভৃতি কাব্যে প্রেম ও সুন্দরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা যেমন প্রকাশিত অন্যদিকে তেমনি প্রকাশ পেয়েছে নৈরাশ্য, যন্ত্রণা ও অচরিতার্থতার মর্মবেদনা। রোমান্টিক প্রেমানুভবের প্রকাশ লক্ষণীয় নিম্নোক্ত কবিতায় :

পাষাণের বক্ষ ভেদি উৎসারিত করিল যে প্রেম–
অন্ধকারে বিচ্ছুরিত হেম–
রশ্মি-রাগ-রেখা তার অর্পিল যে বসন্তের ভালে
সেই আজি রহিল আড়ালে !

নীরব সে পূজারিণী তারে তো সে ভুলিতে পারে না,
পুষ্পিত বসন্ত বুকে বাজিবে সে কাঁটার বেদনা।
(আর সে আসিবে কবে : *সাঁঝের মায়া*)

সুফিয়া কামালের রোমান্টিক ভাবনাকে হাসান হাফিজুর রহমান বলেছেন 'আটপৌরে ব্যবহারিক রোমান্টিকতা'। এর কারণ 'প্রকাশনার সহজ স্বভাবের দরুণ তাঁর কবিতার ভাষা ও কাব্যগঠন রীতি ব্যবহারিক কথন প্রণালীর কাছাকাছি। ... তাঁর রোমান্টিক মনের ভাবনা ও ভাষা উপরোক্ত কারণেই আমাদের জীবনের আটপৌরে ব্যবহারিক রোমান্টিকতায় একটা পরিচয় তুলে ধরে।'[১]

সুফিয়া কামালের স্বভাবসুলভ নম্র-কোমল ব্যক্তিসত্তার প্রভাব তাঁর কবিতায় স্পষ্ট। এই কোমল-কমনীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর স্বভাবে আরোপিত নয় বরং তা সহজাত কাব্যসৌন্দর্যের সহায়ক হয়েছে। তাঁর প্রেমানুভূতি ও বিরহবোধ পাশাপাশি অবস্থান করে প্রেমের চিরন্তন মহিমাকেই করে তুলেছে মূর্ত :

১. অন্তর-মন্দিরে তার হ'ল যত পূজা আয়োজন
চিত্ত-তীর পরাজিত, সিন্ধু জলে জাগিল প্লাবন।
অবশেষে এল লগ্ন ! জীবনের পূর্ণিমার রাতে
একটি নিশীথ শুধু ! কাটল সে পূর্ণ চন্দ্র সাথে।
অপূর্ব পূর্ণতা লভি দেহ-সিন্ধু সশব্দ কল্লোলে–
ভাঙ্গিয়া চিত্তের তীর লুটাইল চন্দ্র রশ্মি তলে
আকুল প্রণয়াবেগে উচ্ছ্বসিয়া ব্যাকুল চুম্বনে–
ক্ষণ স্পর্শ লাভ করি বহি চলে আপনার মনে।
(অনন্ত পিপাসা : *সাঁঝের মায়া*)

২. শ্রাবণ ঘন গগন হেরিয়া কেতকী ফুটিল সুখে
শত কন্টক আঘাত ব্যথায় ক্ষত বিজড়িত বুকে,
চুমিল তাহারে প্রেমে
শ্রাবণ নিশির সুন্দর চাঁদ ছায়া পথ বাহি নেমে।
স্নিগ্ধ অমিয় পরশ দানিল, কন্টকাঘাত জ্বালা
নিমেষে ভুলিল কেতকী আপন কেশরে রচিয়া মালা
জড়াইতে গিয়া হায়
পলকে পলকে জড়াইয়া গিয়া
ঝরিয়া যে যেতে চায়।
(আমি চাহিব না তবে: *সাঁঝের মায়া*)

[১] ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *সুফিয়া কামাল*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৯

উদ্ধৃত কবিতাংশে প্রেমিক-সত্তাকে প্রকৃতির অনুষঙ্গে চিত্রায়িত করেছেন সুফিয়া কামাল। তাঁর এ প্রকাশ-প্রকরণ জসীমউদ্‌দীনের কবিতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলার প্রকৃতি ও নিসর্গ দুজনের কবিতাকে দিয়েছে সমৃদ্ধি। কখনো কখনো তাদের প্রকাশভঙ্গির মধ্যেও এ সঙ্গতি লক্ষ করা যায়। যেমন :

তুমি তীর, আমি উর্মির মতো বার বার আঘাতিয়া
তব পদ-বেলাভূমে চুমে যাব প্রেমাবেগ উছলিয়া।
(তুমি আর আমি : *সাঁঝের মায়া*)

একই উপমা ও চিত্রকল্পে প্রেমের সম্পর্কের নিবিড়তাকে জসীমউদ্‌দীন একেঁছেন এভাবে, যা সুফিয়া কামালের উলিখিত চরণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ :

সোজন যেন বা তটিনীর কূল, দুলালী নদীর পানি
জোয়ারে ফুলিয়া ঢেউ আছাড়িয়া করে কূল টানাটানি।
(*সোজন বাদিয়ার ঘাট* : তিন)

দ্বিধা-সঙ্কোচ-ভয়, লজ্জা ও বিরহকে অলম্বন করেই পূর্ণতা পায় প্রেম। প্রেমের এই রূপ সুফিয়া কামাল উন্মোচিত করেছেন তাঁর প্রেমবিষয়ক 'সঙ্কোচ' কবিতায় :

বিচ্ছেদ ব্যথার রাত্রি অতন্দ্র নয়নে করি ভোর
সান্নিধ্যের সুখে সুখী নয়নে ঘনায় ঘুমঘোর।

সে যবে প্রবাসে থাকে, প্রতি মুহূর্তেই পথ চাই,
গৃহে থাকে, আঁখি তুলে চাহিতে সঙ্কোচে মরে যাই।

সে যবে রহে না কাছে গৃহে কাজে নাহি লাগে মন,
রহিলে নিকটে সখী কেটে যায় কর্মব্যস্তক্ষণ।

অনেক দিনের পরে আসিলে প্রিয়ের প্রসাদন
করিতে কল্পনা শুধু, আসিলে সে রহি যে উন্মন।

শূন্য শয্যা ভরি রাখি পেলব পুষ্পের আচ্ছাদনে
মিলন শয্যায় পুষ্প বিথারিতে নাহি থাকে মনে।

বিরহে বিষণ্ন থাকি, মিললেও ঝরে অশ্রুজল
আমারে লইয়া সখি কী করি যে বল্ মোরে বল্ !

প্রিয়েরে তুষিতে করি মনে মনে যত আয়োজন
সবি যায় বৃথা হয়ে ব্যথানন্দে হইয়া মগন।
(সঙ্কোচ : *উদাত্ত পৃথিবী*)

উদাত্ত পৃথিবী কাব্যে 'তোমার সে প্রেম', 'রজনীগন্ধা', 'শেষদান', 'শূন্যের সম্পদ', 'অনিমিষ' প্রভৃতি কবিতায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে কবির প্রেম-প্রত্যাশা। প্রেমাস্পদের নিকট প্রেম-নিবেদনের অভিলাষ অঙ্কিত হয়েছে 'শূন্যের সম্পদ' কবিতায় :

এত দিন পরে আজিকে আবার প্রভু আসিবেন ঘরে
স্মরিতে কী সুখ ! অন্তর মন কী পুলকে যে শিহরে।
এ তনু আমার তরু হয়ে যদি থাকিত পথের পাশে,
যে পথে আসিবে প্রিয়তম মোর, বিকশিত ফুলবাসে
সে পথের বায়ু করিত মধুর, সে পথে দানিয়া ছায়া
খর বরিতাপ ক্লান্তি মুছায়ে ধন্য হত এ কায়া। ...
শামাদানে যদি মোমবাতি সম পুড়িত এ মোর দেহ,
উজ্জ্বলি শিখা হেরিতাম প্রিয় উজলি তুলেছে গেহ।
(শূন্যের সম্পদ : *উদাত্ত পৃথিবী*)

দীওয়ান কাব্য গ্রন্থে রূপকের আবহে কবি তাঁর প্রেমাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। এখানে নিবেদনের ভঙ্গিও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল ও ব্যক্তিত্বময়।

১. খনির মাঝে জন্মে হীরক, না হয় আছে অন্ধকার
চারপাশেতে, মধ্যখানে তার ঔজ্জ্বল্য চমৎকার। (১৮)

২. সব ছাড়িয়ে, মূল্য নিয়ে কিনবে যে – সে সাধ্য কি !
আঁধার গুহায় জন্ম বলেই যেমন –তেমন সে হয় কি ? (১৯)

৩. আঁধার জীবন-গুহার মাঝে তোমার চাওয়ায় আমার প্রাণ
নবীন জন্ম নিয়েই হ'ল মহামূল্য হীরকখান। (২০)

দেহজ প্রেমের স্বীকৃতি মেলে নিম্নোক্ত কবিতায় :

পিয়াসা আমার মিটে নাই সাকী !
পেয়ালা তোমার পূর্ণ কর
রঙিন সুরায় লীলায়িত হাতে
তৃষিত আমার অধরে ধর।...
শরাবে শুধুই জমে না ত নেশা
নেশা জমে তব স্পর্শ সুখে
শরাবের চেয়ে মধুর মরণ–
মরি যদি চাহি তোমার মুখে।
(তৃষ্ণা : এক : *দীওয়ান*)

প্রেম তার মনোদৈহিক বেদনা-যন্ত্রণা নিয়ে এ কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে :

এখনতো তৃষ্ণা আছে বাকী–
প্রাণের প্রদীপ মোর নিভিল না, দেহ মোর হয়নি ত লয়,
নয়নে তোমার স্বপ্ন এখনও তো তেমনি অক্ষয়!
গগনের গ্রহ তারা, মৃত্তিকার মর্মের সুরভি–
মিলাইয়া যায় নাই– তেমনি ত রয়েছে সে সবি,
তুমি শুধু মিলাইলে প্রাণ হ'তে দেহের প্রতিটি তন্ত্রী মাঝে
কী আনন্দ অনুভূতি! প্রাণে মনে এ দেহের অণুতে বিরাজে!
(এসেছ এসেছ তুমি : *দীওয়ান*)

সুফিয়া কামাল অত্যন্ত শিল্পময় করে তাঁর পার্থিব প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে অপার্থিব ব্যঞ্জনায় মূর্ত করে তুলেছেন। তাঁর প্রেম যেন জাগতিক চাওয়া-পাওয়াকে অতিক্রম করে বিস্তৃত হয়েছে প্রকৃতির রাজ্যে। এরূপ প্রকাশ নিম্নোক্ত কবিতায় লক্ষণীয়ঃ

আমার অন্তর হতে সবটুকু প্রেম
তোমাকে দিলেম।
তবু আমি নিঃস্ব নহি, আমার রয়েছে তুমি। আর
এখনও রয়েছে বিশ্বে বিপুল সম্ভার।
বিরহ ব্যথার মতো উদার আকাশ নীল ঘন–
ও যেন তোমার মুক্ত মন।
(পুনর্ণবা : *দীওয়ান*)

একই অনুভব প্রকাশমান *সাঝের মায়া* গ্রন্থের 'সে কোথায়' কবিতায়,

বিশ্ব ভুবনে অন্বেষি' ফিরি দিঠির দেয়ালী জ্বালি
গৃহ হতে গৃহে, বনে, রাজপথে ... কোথা সে যে সব খালি।
সে কোথায়? সে কোথায়?
কত দিন ধরে হেরি নাই তারে নয়ন চাতক চায়।
সহসা পুলক-বিস্ময় ভরে হেরি অন্তর মাঝে
অন্তর মাঝে হৃদি শতদলে সে রাজাধিরাজ রাজে!
কস্তরী মৃগী প্রায়–
আমারি গরবে আমার মনের মানস-আকাশ ছায়।

সুফিয়া কামাল কবিতা রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-নজরুলের অনুসারী ছিলেন। তাঁর স্বীকারোক্তিও এক্ষেত্রে স্পষ্ট। অবশ্য তিনি যে কবিতায় স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের মন্তব্য স্মরণীয় :

> রবীন্দ্রনাথ কি নজরুলের অনেক উপমা, বাক্‌ভঙ্গির সহজ গ্রহণ সত্ত্বেও এসব উদ্ধৃত কাব্যাংশে এবং অন্যত্র বেগম সুফিয়া কামালের আপন কণ্ঠ অনায়াসে চিনে নেওয়া যায়।[১]

সুফিয়া কামালকে রবীন্দ্র-নজরুলের কাব্য বলয় থেকে সরে আসার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁর কাব্যানুরাগীরা, কিন্তু তিনি তা মেনে নেননি, বরং রবীন্দ্র-নজরুলের কাব্যধারাকে স্বীকরণ করে কখনো কখনো রচনা করেছেন তাঁর কবিতার চরণ বা চরণাংশ। দুটি দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

১. সুফিয়া কামালের কবিতাংশ–

বিহঙ্গ! ওগো বিহঙ্গ। কত খেলিবে নিঠুর খেলা
(এই নীড় এই মাটির মমতা : *দীওয়ান*)

রবীন্দ্রনাথের কবিতাংশ–

ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।
(দুঃসময় : *কল্পনা*)

২. সুফিয়া কামালের কবিতাংশ–

সেই দুর্দিনে যাত্রীদল দুর্গম প্রান্ত হয়ে পার
তিমির নিশীথ রাত্রে পাড়ি দিল দীর্ঘ পারাবার।
ডুবে মরে কারা? সন্তান মা'র... কাণ্ডারী তব তরী
দুস্তর সেই সিন্ধুর বুকে ভাসাইয়াছিলে, ...
(হে মৌন হিমালয় : *দীওয়ান*)

নজরুলের কবিতাংশ–

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি-পণ!
"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!
(কাণ্ডারী হুশিয়ার : *ছায়ানট*)

দীওয়ান কাব্যগ্রন্থের প্রেমমূলক কবিতা- 'স্বপ্নভঙ্গে', 'সংলাপ', 'স্পর্ধিতা', 'এসেছ এসেছ তুমি', 'এই নীড় এই মাটির মমতা', 'পুনর্ণবা', 'ঐশ্বর্য' প্রভৃতি কবিতায় প্রেমের অনিন্দ্য সৌন্দর্য ও বিরহব্যথা উপস্থাপিত হয়েছে।

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-বার

মায়া কাজল কাব্যগ্রন্থের 'সে কি প্রভু জানে?' কবিতায় নিঃস্বার্থ ভালোবাসার প্রকাশ অনুরণিত হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে সমীকৃত করে কবি তাঁর প্রেমানুভব ব্যক্ত করেছেন–

সিন্ধুর তরঙ্গাঘাতে শুক্তিবক্ষে মুক্তা যে গো ফলে,
আবরি অন্তর পুটে পিয়াইয়া শত বিন্দু নয়নের জলে
মুক্তার মাধুর্য শুক্তি দানে–
যার কণ্ঠে শোভা পেল, এ সন্ধান সে কি কভু জানে?
(সে কি কভু জানে : *মায়া কাজল*)

একই সুর প্রতিধ্বনিত 'নিশিগন্ধা' কবিতার ভাবমাধুর্যে। কখনো কখনো কবি পরিপূর্ণ প্রেমানুভবের মধ্যেও প্রকাশ করেছেন তাঁর তীব্র বিরহবেদনা। 'স্মৃতির সৌরভ' কবিতায় এ অনুভবেরই মনোময় প্রকাশ লক্ষণীয় :

হিমাদ্রি গলিয়া এলে ঝর্ণারূপে মোরে ভালোবেসে।
অবগাহি সে ধারায় ধন্য মোর জীবন-যৌবন
দু'য়ে মিলি এক হয়ে হেরেছিনু সে সুখ-স্বপন–
আজিও ভাঙেনি প্রিয়! রহিয়াছে সে প্রেম গৌরব,
না-ই যদি এলে আজও রবে সেই স্মৃতির সৌরভ।
(স্মৃতির সৌরভ : *মায়া কাজল*)

'বসন্তলিপি' কবিতাটিতে কবিজীবনের প্রতিচ্ছায়া লক্ষণীয়। কবির প্রথম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনকে স্মরণ করে কবিতাটি রচিত। *সাঁঝের মায়া* কাব্যগ্রন্থের 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি স্বামীকে 'মাঘের সন্ন্যাসী'র প্রতীকরূপে চিত্রায়িত করেছেন। *মায়াকাজল* কাব্যের 'বসন্তলিপি' কবিতায় স্বামীকে বলেছেন 'উদাসী সন্ন্যাসী'। এই সন্ন্যাসী মূলত তাঁর হৃদয়েশ্বর সৈয়দ নেহাল হোসেন। তাঁকে হারানোর তীব্র বেদনা প্রতিধ্বনিত হয়েছে কবিতার প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে। বসন্তের আগমন বার্তা-লিপি 'উদাসী সন্ন্যাসী'-ই কবিকে পাঠিয়েছেন। এ বার্তা, এ প্রেম, এ আনন্দ কবি তাঁর রোমান্টিক অনুভূতির রঙে রাঙিয়ে তুলেছেন। বসন্তের সুরভিত আবির্ভাব কবিচিত্তকে যেন অজানা আবেশে পূর্ণ করে তুলেছে–

কখন হয়েছে শুরুবসন্তের পুষ্প সমারোহ
কেটে গেছে শিশিরের ব্যথাঘন কুয়াশার মোহ,
বুঝি নাই–ছিলাম উন্মনা! ...
উদাসী সন্ন্যাসী মোরে পাঠায়েছে লিপি
সূর্য-করে মুকুল সুরভি-স্নিগ্ধ নবপত্রভারে,
লিখেছে লিখন খানি, আনমনে, ভুলেনি আমারে! ...
হে সন্ন্যাসী ! তব লিপি নিলাম ভরিয়া
যুগ্ম দুই করে মোর। পড়িলাম, করিলাম পান

দুই আঁখি ভরি মোর–লভিলাম আনন্দ মহান।
আজিকার বসন্ত প্রভাত
প্রথম সম মনে হয়। সবি অকস্মাৎ
আজিকে লাগিল মোর ভালো
যত হাসি, যত গান, যত রূপ- যত কিছু আলো।
লভিয়া পরশ তব আমার ভুবন হলো সুন্দর মধুর,
অপূর্ব এ আনন্দ, বিধুর।
(বসন্তলিপি : *মায়া কাজল*)

১৩৪৭-এর ফাল্গুন সংখ্যা 'সওগাত'-এ সুফিয়া কামালের 'বসন্ত-লিপি' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এ সময় কামালউদ্দীন খানের সাহচর্যে ব্যাহত কাব্যচর্চা ধীরে ধীরে সংহত রূপ পরিগ্রহ করে। সুফিয়া কামাল পৃথিবীকে নতুন করে ভালোবাসলেন। তাঁর এ ভালোবাসা নিবেদিত হয়েছে দেশ ও মানুষের প্রতি। সুফিয়া কামালের এ প্রেমভাবনা প্রসঙ্গে দ্বিধাবিদ্ধ আবুল ফজল। তাঁর মতে–

বাংলাদেশের মাটি, প্রকৃতি নদ-নদী, ফল-পুষ্প, পরব-উৎসব সব কিছুই কবি সুফিয়ার মনে সাড়া জাগিয়েছে। তাঁর অসন্দিগ্ধ পরিচয় পাঠক এ সংকলনে দেখতে পাবেন। জানতে ইচ্ছা হয় প্রেমের কবির এ প্রেম নিবেদন কি কোন দয়িতের প্রতি না দেশের প্রতি :
মৃত্তিকার ভাণ্ড ভরি উচ্ছ্বসিত তোমার যে প্রেম
তারে আমি ভরিয়া নিলেম।
আমার নয়ন ভরে, আমার হৃদয় ভরে
আর ভরে আমার দু'কর
কী দুঃসহ সে আনন্দ, সেই প্রেম কী যে তীব্রতর !
হিরন্ময় জ্যোতি তার শর সম লেগে
বিকাশে অন্তর কুঁড়ি,. শম্পসম বেগে
উদ্ভাসিয়া চিত্তে মোর এনে দেয় বিত্ত মণিময়,
তাই তো ঐশ্বর্যময়ী আমি, মোর আনন্দ অক্ষয়
তোমার সে প্রেম।[১]

সুফিয়া কামালের প্রেমবোধ উপ্ত হয়েছে দেশ, মাটি ও মানুষের মনোভূমিতে। প্রেম তাঁর কবি-সত্তার মূল সুর–আর এ সুরেরই অণুরণন ঘটেছে তাঁর কবিতায়। *মায়া কাজল* কাব্যগ্রন্থের 'মায়া কাজল' কবিতায় সে সুরেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। আকাঙ্ক্ষিত সে প্রেমের বাঙ্ময় প্রকাশ সীমা ও অসীমার অভিব্যঞ্জনায় প্রকাশ পেয়েছে নিম্নোক্ত চরণসমূহে–

সে দিন অনেক রাত্রে কুলায়ে গুটায়ে পাখি পাখা,
স্নিগ্ধ চন্দ্রকর তলে তরুরা মেলেছে শ্যাম শাখা,

[১] সুফিয়া কামাল, *স্ব-নির্বাচিত কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩

এলো সে গোপন মৃদু পায়
নির্বাপিত দীপ মোর অন্ধকার গৃহ আঙিনায়।
দ্বার প্রান্তে বসি বুঝি প্রতীক্ষায় ছিনু আমি তারি
আপনারও অগোচরে কবে হতে বুঝিতে না পারি।
চমকি উঠিনু হেরি তারে
সে শুধু প্রসারি বাহু আগুলিয়া লইল আমারে। ....
রোমাঞ্চন জাগে দেহে। মন জাগে আরও অভিমান,
নয়নে ঘনায় জল, আনন্দে আ কণ্ঠ হয় প্রাণ,
হৃদি দেহ কাঁপে থর থর–
সে শান্ত প্রসন্ন মুখে বুলাইয়া দিলো তার কর।
যামিনীর শেষ যাম। মধু স্বপনের হয় শেষ,
বাঁশরী বাজিয়াছিল, শেষ হয়ে এলো তার রেশ।
(মায়াকাজল)

মন ও জীবন কাব্যগ্রন্থে প্রেম পবিত্র ও শুভ্ররূপে উপস্থিত। এখানে প্রেম দেহজ নয়, দেহোত্তর। এ প্রেম শুদ্ধ অনুভবে-উপলব্ধিতে ভাস্বর। রবীন্দ্রনাথের *মানসী* কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতার ভাব-বিষয়ের প্রভাব পড়েছে *মন ও জীবন* কাব্যগ্রন্থের কবিতায়। ভোগের সীমায় প্রেম বেঁচে থাকে না, ত্যাগের মাহাত্ম্যে প্রেম হয়ে ওঠে শাশ্বত ও চিরন্তন; এরূপ ভাবনার অন্তর্ময় প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কবিতায় :

তোমার প্রথম প্রেম তুচ্ছ নয়– আজি তাহা মিথ্যা হয় হোক্ –
সেদিন সে সত্যরূপে ভরেছিল মোদের দ্যুলোক।
তারপর এল ক্ষণ অপার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা জাগা,
শুরু হল ব্যবধান, ভোগের বিলাস ভিক্ষা-মাগা।
প্রেমের প্রদীপ তলে বাসনার ঘন অন্ধকার
রচিল কখন যেন বিচ্ছেদের বিপুল পাথার।
ব্যর্থ কামনার ক্ষোভ। তৃপ্তি নাহি শুধু ভালোবাসি–
আমার নয়নে অশ্রু, তোমার অধরে তীব্র হাসি !
কোথায় হারায়ে গেল কণ্ঠভরা প্রণয়ের গান,
আমার বন্দনা স্তুতি-বক্ষভরা ক্ষুব্ধ অভিমান !
তোমারে দেইনি সুখ, অতৃপ্ত বুভুক্ষা বহ্নিজ্বালা
সুতীব্র দহন দানি শুকাইয়া দিল পুষ্পমালা। ...
সহিতে পারোনি আর, দূর হতে দূরে গেছি সরে,
দানিয়া আমার প্রেম তব শূন্য রিক্ত চিত্ত ভরে। ...
তোমার স্মৃতিতে মোর মন প্রাণ পরিপূর্ণ আজও,
অন্তর আকাশ ভরি প্রেমময় রূপ ধরি রাজো।
(সিন্ধু ও দিগন্ত : *মন ও জীবন*)

'দিগন্ত' কবিতাতে একই বিষয় ও ভাবের পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়। অবশ্য *মন ও জীবন* কাব্যগ্রন্থে 'দিগন্ত' নামে দুটো কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। একটি কবিতার বিষয়ে প্রাধান্য পেয়েছে প্রেম, অন্যটিতে প্রকৃতি।

মৃত্তিকার ঘ্রাণ কাব্যে সুফিয়া কামালের পরিণত জীবনদৃষ্টি প্রেমকে শান্তির আশ্রয় রূপে চিহ্নিত করেছে। সকল বৈরিতা, রুক্ষতা থেকে পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ তিনি অবলম্বন করেছেন প্রেমকে। এ কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে প্রেমের কবিতা। একটি অনুপম ও নিটোল প্রেমের কবিতার অংশবিশেষ লক্ষণীয় :

কি হেরিছ ? এখনো দূরের ওই নদী, ওই মাঠ ?
হে সম্রাট ?
চাহ ফিরে চাহ,
জুড়াইবে ওই হৃদি দাহ !
দীপ্ত যবে দিনের আলোক, হেরিছিলে- রৌদ্র-দুগ্ধ ধরা
অনন্ত নীলিমা ধু ধু আঁখি দগ্ধ করা–
জুড়ায়ে দিয়াছে দেখ এবে সন্ধ্যা টানি তার শ্যামল অঞ্চল
হে চঞ্চল!
এসো তবে মোর পাশে দিবা-দগ্ধ শ্রান্ত ক্লান্ত
দেহ মন নিয়া,
তব রিক্ত ব্যথা- তিক্ত প্রাণ আমি প্রেম-স্পর্শে
দিব জুড়াইয়া।
(চেয়ে দেখ মোর পানে : *মৃত্তিকার ঘ্রাণ*)

'বাসনা' কবিতায় প্রেমের সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে :

তুমি যদি হতে প্রভাতের আলো
আমি হইতাম বালুকা রাশি,
সাগরের পারে লুটিয়া থাকিয়া
প্রথমই পেতাম তোমার হাসি।
তুমি যদি হতে স্তব্ধ দুপুর
কপোত-কূজন আমি গো তার–
মুখর করিয়া প্রেমিক- পরাণ
ঢালিয়া দিতাম হৃদয়-ভার। ...
তুমি যদি হতে বাদলের ধারা
আমি হইতাম দীর্ঘ পথ,
তোমার শীতলে অবগাহি' মোর
পূর্ণ হইত এ মনোরথ।

তুমি যদি হতে প্রদীপের শিখা
পতঙ্গ যে গো হ'তাম আমি–
উল্লাসে প্রাণে আহুতি দিতাম
সকল বাসনা যাইত থামি।

এ-কাব্যের 'বুকে করে সে চির তিমির', 'বিজয়িনী', 'মনে মনে', 'সূর্যমুখী', 'কি দিব তোমারে', 'এইত নয়ন দুটি', 'সমুদ্র হৃদয়', 'বিদায় বাঁশরী', 'তাজ', 'মুক্তধারা', 'বসন্তের শেষ', 'বিভাবরী' প্রভৃতি কবিতায় মানুষের অতৃপ্ত জীবনপ্রবাহে শান্তিময় স্নিগ্ধ পরশরূপে প্রেমের জয়গানই ধ্বনিত হয়েছে। দাম্ভিক ব্যক্তিসত্তা প্রেমের মাহাত্ম্য অনুভবে অপারগ, আর সরল ব্যক্তিচিত্ত রোমান্টিক অনুভব থেকে মিস্টিসিজমে উন্নীত হয়ে অপার্থিব প্রশান্তময় অনুভবে সিক্ত। 'সূর্যমুখী' কবিতায় কবি সেই বক্তব্যকেই রূপায়িত করেছেন :

আমারে বেসেছ ভালো, দাম্ভিক ! দর্পিত অহংকারে
তোমার অন্তর বারে বারে
সংকুচিত হয়ে আসে। আর মোরে তোমার সে
উপেক্ষা-দহন
বিদগ্ধ করিয়া করে নিকষিত স্বর্ণের মতন।
তুমি পলাতক, ভীরু। তবু তব স্বর্ণলুব্ধ মন
আমারে ঘিরিয়া ফিরে, তাই তীব্র প্রণয়-দহন
ভুলিতে দেয় না মোরে, সে তোমার নহে অপরাধ।
সহজ প্রশান্ত হও, এস কাছে, কত মোর সাধ !
আমারে বেসেছ ভালো ! এতো ভালো ! করিয়া স্বীকার
মিটায়ে দহন জ্বালা প্রসন্ন হইয়া ওঠো ! ঘুচুক বিকার।
প্রেমের পরশমণি ছোঁয়াইয়া কঠোর অন্তর
করে নাও মমতা সুন্দর।
এসো কাছে, লহ মোর হৃদয় হইতে কিছু ঋণ,
বাসো ভালো, বল 'বাসি' এ ভুবন করিয়া রঙিন,
রাঙাইয়া মন
স্নিগ্ধ হও পূর্ণ হও পূর্ণ প্রেম করিয়া অর্পণ।

সুফিয়া কামাল সহজ-সরল আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে প্রেমের সার্থকতাকে উপলব্ধি করেছেন। এ সম্পর্কে আবদুস সাত্তারের মন্তব্য স্মরণীয় :

> ব্যাপক অর্থে প্রত্যেক কবিই প্রেমিক, জীবনপ্রেমিক, যে প্রেম তাদেরকে সকল বিষয়ে প্রেরণা যোগায় এবং এটার অভাবে ঘটলে মানুষ নিস্প্রাণে পরিণত হয়। চৈতন্যগত উপলব্ধিরও কোন প্রয়াস থাকে না। ... যে আবেগ-সারল্য এবং আত্মসমর্পণ নিয়ে শান্তি ও আশ্রয়ের দিকে তার অভিযাত্রা প্রেমকেই আশ্রয় করে, এ প্রেমের লজ্জা নেই, দ্বিধা নেই, কেননা এ প্রেম জৈব, সৃষ্টির প্রাথমিক নিয়মের মতোই স্বতঃসিদ্ধ এবং এ প্রেমই জীবনের নিয়তিবোধ। এই প্রেমের বৃত্তেই আবর্তিত হচ্ছে মানুষের

শিক্ষা, অভিজ্ঞান, ক্ষমা, মহত্ত্বের পরীক্ষা ইত্যাদি। এ কারণেই বেগম সুফিয়া কামালের কবিতা আমাদেরকে কাছে টানে। কেন না, সেখানে রয়েছে বৈচিত্র্যময় শিক্ষা এবং জীবনবোধের দুর্নিবার আকর্ষণ। ... সংঘাতময় জীবনবৈচিত্র্যে কবি যে আঘাত পেয়েছেন তা শেষ পর্যন্ত 'সে আঘাত-চিহ্ন হল ললাটে আমার জয়টীকা' রূপে দেখা দিয়েছে কবির কাছে। কোথাও তিনি ভেঙে পড়েন নি। কারণ তিনি পরম সত্য উপলব্ধি করেছেনঃ

কত সত্য লভেছি জীবনে,
সে ত নয় তুচ্ছ, তাই সেই স্বপ্ন ভরিয়া পরানে
জীবনের স্বপ্ন হেরি নব নব রূপে প্রতিদিন
কোথায় বেদনা, সে যে জীবনের রূপ অমলিন।[১]

প্রেম-বিষয়ক কবিতা প্রসঙ্গে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের বক্তব্য স্মরণীয় :

প্রেমানুভবের কবিতায়, কবিচিত্ত যার উদ্দেশ্যে নিবেদিত তাকে তিনি, অনেকটা নজরুল ইসলামের ভঙ্গিতে অধিকাংশ সময়ে 'সুন্দর' এবং কখনো 'সন্ন্যাসী' আর কখনো বা 'রাজাধিরাজ' বা 'মহারাজা' বলে আহ্বান করেছেন। যেমন :

১. মুক্তি লভে বন্দী আত্মা–সুন্দরের স্বপ্নে, আয়োজনে,
নিঃশ্বাস নিঃশেষ হোক পুষ্প বিকাশের প্রয়োজনে।
(সাঁঝের মায়া *: সাঁঝের মায়া)*

২. সহসা পুলক বিস্ময়ভরে হেরি অন্তর মাঝে
অন্তর তলে হৃদি শতদলে সে রাজাধিরাজ রাজে !
(সে কোথায়? : *সাঁঝের মায়া*)

৩. দখিন দুয়ার খুলি আসিবেনা আজো সে সন্ন্যাসী ?
(আর সে আসিবে কবে?: *সাঁঝের মায়া*)

৪. আমি সুন্দর !
রাত্রি ভরি কাঁপি থর থর !
কত ভুল-ভ্রান্তি ভরা পথচলা শেষে বসে আজ
হে সুন্দর ! মোর মহারাজ
(পৃথিবীর পথ : *সাঁঝের মায়া*)[২]

সুফিয়া কামাল প্রেমের কবি। প্রকৃতির অনুষঙ্গে তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর প্রেম-ভাবনা। প্রেমের কবিতায় তিনি কৃতিত্ব সম্পাদন করলেও একথা সত্য যে তাঁর প্রেমভাবনায় বিরহানুভূতিই প্রধান। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মজির উদ্দীনের মন্তব্য- "সুফিয়া বিরহের কবি– মনোবেদনার মূর্তিমতী ছবি। তাঁর কবিতার প্রতি ছন্দে অন্তরের স্নিগ্ধ ব্যথা বিলসিত হয়ে উঠে। এ ব্যথা ব্যক্তিসীমা অতিক্রম করে সর্বজনীনতায় ব্যাপ্তি লাভ করেছে। বাংলা সাহিত্যে বিরহের কবিতা

[১] ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *সুফিয়া কামাল*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৩-১৭৫
[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬২

কম নেই। অক্ষয় বড়ালের *এষা,* দ্বিজেন্দ্রলালের *আলেখ্য* ইত্যাদি বিরহের কাব্য হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে– এদের সাথে সুফিয়ার *মায়াকাজল, সাঁঝের মায়া* ইত্যাদির কবিতাও সমপর্যায়ে দাঁড়াতে সক্ষম। জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্যের মূল উৎসই হলো বিরহ–কাব্য গাম্ভীর্যের দিক থেকে অন্যান্য ভাবের মধ্যে বিরহই সর্বাধিক মর্যাদা পেয়েছে, সে জন্যই প্রেম সৌন্দর্য ও দুঃখ ব্যথার কবি শেলী বলেছেন :

We look before and after
We pine for what is nought,
Our sweetest songs are those
That tell of saddest thought.

সুফিয়ার কাব্যে হৃদয়-বেদনা সর্বত্র একটি দীর্ঘশ্বাসের মতো মনে হয় সৌন্দর্যমূলক কবিতায় এমন কি প্রকৃতিমূলক কবিতাতেও এই চাপা বেদনার সুর মর্মরিত।

বিরহ বেদনা তাঁর কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে বটে কিন্তু কোন নৈরাশ্য তাতে নেই বরং সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত। জীবন সংগ্রামের কঠিন আঘাত তাঁকে দুঃখ দিয়েছে সত্য, কিন্তু তাতে তিনি দুর্বল নন। তিনি কখনো নেতিয়ে পড়েননি। তিনি কোন শীতের আঘাতে ভীতা বা নিরাশ নহেন, তাই পাতা-ঝরার নিরাশার মধ্যে দেখেছেন অনাগত বসন্তের সম্পদ সম্ভার :

এ ঋতু জয়তী নহে পঞ্চঋতু প্রদীপের বুকে
জ্বালি সৌভাগ্যের আলো শিহরায় প্রচ্ছন্ন পুলকে (মন ও জীবন)।[১]

সুফিয়া কামালের বিরহবোধ গভীরভাবে ছায়া ফেলেছে তাঁর *সাঁঝের মায়া* কাব্যগ্রন্থে। এ কাব্য রচনাকালে কবির যাপিত জীবন ছিল বেদনার্ত। সৈয়দ নেহাল হোসেনের মৃত্যু-শোকই তাঁর কাব্যের বিরহ-মূলক কবিতার উৎস। এ গ্রন্থের 'আর আসিবে কবে', 'তাহারেই পড়ে মনে', 'ভিখারিণী', 'ভালো লাগা ভালোবাসা নহে', 'আশান্বিতা', 'মধুরের ধ্যানে' প্রভৃতি কবিতায় প্রেমের অপ্রাপ্তিজনিত মর্মজ্বালা, বেদনাবোধ, বিরহের দহনজ্বালা প্রকাশ পেয়েছে। প্রিয়-বিচ্ছেদে আক্রান্ত কবি বিরহবোধে আচ্ছন্ন হলেও তাঁর অনুভবে ও উপলব্ধিতে সেই প্রিয় মানুষেরই নিরন্তর উপস্থিতি–

ধরণীর অঙ্গ হতে বাসরের সজ্জা পড়ে খুলি–
গভীর বেদনাশেষে ঊর্ধ্বে চাহে দুটি আঁখি তুলি ঊর্ধ্বে
'চৈত্রের পূর্ণিমা রাত্রি এল ফিরি'– এল না সে ফিরে?

[১] ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *সুফিয়া কামাল,* প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৮-১৬৯

অন্তত জিজ্ঞাসা ভরি' এ প্রশ্ন শুধায় কেহ ধীরে
অন্তরে অগ্নিদাহে আলো জ্বালি অশ্রুহীন চোখে,
নিশীথ প্রান্তর পথে অন্বেষিয়া ফিরে লোকে লোকে,
অঙ্গেতে গন্ধের মতো, বক্ষ মাঝে হয়ে আছে প্রাণ
আঁখির অন্তর মাত্র। অভিশপ্ত তীব্র ব্যবধান !
তাহারি আর্ততা- তিক্ত আজি চৈত্র পূর্ণিমার নিশি
বিরহে আচ্ছন্ন হলো, ম্লান হলো নীল নভে শশী।
(চৈত্র পূর্ণিমার রাত্রি : *সাঁঝের মায়া*)

মহাকালের গর্ভে পার্থিব সত্তা বিলীন হলেও স্মৃতিসত্তায় তার নিরন্তর আনাগোনা। তারই প্রকাশ নিম্নোক্ত চরণে লক্ষণীয় :

কুহেলী উত্তরীতলে মাঘের সন্ন্যাসী
গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে
রিক্ত হস্তে! তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোনমতে।
(তাহারেই পড়ে মনে : *সাঁঝের মায়া*)

বিরহের ঋতু বর্ষা। বাংলা কাব্যধারায় বিরহবেদনার প্রকাশে কবিরা বর্ষাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সুফিয়া কামালও এ বহমান ধারাকে অনুসরণ করে রচনা করেছেন বিরহের কবিতা :

মায়ার কাজলে আঁখি সজল করিয়া যে আষাঢ়
বিদগ্ধ কেয়ার হিয়া জুড়াতে শ্রাবণে
বহাইয়া এনেছে প্লাবনে
বিশ্বের বিরহী হিয়া হতে কণা কণা।
মধুর মিলন ক্ষণে অলখিতে বাজে যে বেদনা
মেদুর আকাশ তলে আচম্বিতে ছায়া পড়ে কার
কে যেন সাথীরে তার খুঁজে নাহি পেয়ে বার বার
দ্বারে দ্বারে ফিরে অন্যমনা,
ঘন কৃষ্ণ সিক্ত কেশ এলাইয়া দিয়া
দিগন্তের পানে সে চাহিয়া
যুগ যুগ ধরে ধরে থাকে প্রতীক্ষায় অধীরা উন্মনা
বিশ্বের বিরহী হিয়া তার তারে রচিছে বন্দনা।
(বর্ষার প্রতীক্ষা : *উদাত্ত পৃথিবী*)

উদাত্ত পৃথিবী কাব্যগ্রন্থের বিরহমূলক অন্যান্য কবিতা যেমন- 'বর্ষারাতে', 'রাত্রি তপস্যা', 'প্রতীক্ষা' প্রভৃতিতে বিরহবোধের তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে প্রেম-প্রত্যাশা, অন্যদিকে অচরিতার্থতা ও তজ্জাত বেদনা ও বিক্ষোভ প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'প্রতীক্ষা' কবিতায়–

প্রিয়তম
প্রতীক্ষার দীর্ঘকাল মুহূর্ত তরঙ্গে হয় লয়
অধীর আশ্বাসে জাগি প্রতি পল; হবে মধুময়–
এ নিশীথ পুষ্পবাস। এ অধীর প্রতীক্ষা আমার
জীবনে পরম লগ্ন দিয়ে তুমি আসিবে আবার।
আসিলে না। মোর অভিশাপ যেন তুমি
এমনি নিশীথ জাগো তব প্রিয় নাম চুমি চুমি।
(প্রতীক্ষা : *উদাত্ত পৃথিবী*)

প্রত্যাশিত প্রেমিকের অনাদর-অবহেলাই কবির এই বিষোদগারের কারণ। কবির প্রেম ও বিরহভাবনায় এ ধারণা একান্তই আকস্মিক। তবে তাঁর বিরহ-ব্যথার প্রকাশ হিংসা বা অভিশাপে নয় বরং নীরব প্রকৃতির অপার স্নিগ্ধতায় সমাহিত, এবং তা সর্বজনীনতায় পরিব্যাপ্ত। সুফিয়া কামালের বৈশিষ্ট্য নিরূপণে হাসান হাফিজুর রহমানের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> সুফিয়া কামালের বৈশিষ্ট্য এই যে, পাওয়ার আনন্দে কিংবা বিয়োগ ব্যথাতেই মাত্র তিনি নিঃশেষিত নন। পৃথিবীর ব্যাপ্তির মধ্যে তিনি জীবনের মূল্য খুঁজতে চেয়েছেন পরিশেষে। তাঁর এই অন্বেষা প্রতিক্রিয়াজাত নয়, বাঁচবার তাগিদে নিজস্ব পাথেয় খোঁজার প্রচেষ্টাও এ নয়। বস্তুত তিনি মজ্জাগতভাবে প্রেমানুভূতির কবি। এই প্রেমানুভূতি যেমন প্রকৃতি ও ব্যক্তি-প্রেমের ভোগ ও বিরহের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, পরবর্তী সময়ে তেমনি তা মানুষের কল্যাণ প্রচেষ্টার সমর্থনে ও সহানুভূতিতে জীবনকে ভালোবাসার মধ্যে মূর্ত।[১]

বস্তুত সুফিয়া কামালের কবিতায় বিরহের মাঝেও প্রেম নিকষিত হেমের মতোই মূর্তিময়তায় উজ্জ্বল :

আহত হৃদয় এখন খুঁজিছে–
সে নিঠুর প্রিয় কোথা ?
আঘাত হানিতে যাইয়া তাহার
হাতে ত লাগেনি ব্যথা ? ...
আঘাত ব্যথায় আঁখি মুদে আসে
তবু কহে "সে বয়ান–
দেখিবারে চাই, মারিয়া আমারে

[১] ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *সুফিয়া কামাল*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৭.

হয়নি তো শ্রমে ম্লান ?"
মৃত্যুর বিষে নীল হল দেহ
তবু কহে– "দেখ আরো
বয়েছে চেতন এখনও এ দেহে
খুশী হও যদি মারো !"
ভাষা ডুবে গেল মৃত্যু পাথারে
তবু ওষ্ঠের হাসি
ইঙ্গিতে কহে- এখনও এখনও
তোমারেই ভালবাসি।"
(তৃষ্ণা : তিন : *দীওয়ান*)

ব্যক্তিজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে 'অধমার মিনতি' কবিতায় :

–এ কি সখি বল ছল
দখিনা মলয় অহেতুক কেন দিয়ে যায় ব্যথা দোল ?
কি রচিবে ছায়া ! শূন্য এ শাখা, পাতা ঝরে গেছে যার
দুর্দিন ঝড়ে ঝরায়ে দিয়েছে ফোটা ফুল সম্ভার !
কী রচিবে মায়া, রিক্ত লতিকা– সবই যার অবশেষ !
নিঠুর নিয়তি রিক্ত করিয়া দিয়াছে শোভার লেশ।
সুবাস কাড়িয়া উত্তরী বায়ু উধাও হইয়া গেছে।
নিঠুর কালের কঠোর পীড়নে শ্যাম শোভা মুছে নেছে।
(অধমার মিনতি : *দীওয়ান*)

দীওয়ান কাব্যের 'তৃষ্ণা : দুই', 'তৃষ্ণা : তিন', 'হাসিয়া কহিবে', 'অধমার মিনতি', 'কথা' প্রভৃতি বিরহমূলক কবিতায় বেদনা-যন্ত্রণার শাশ্বত ও বিষাদময় রূপচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সে বিষাদ কখনো মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিতার বিরহের সাথে একীভূত হয়ে প্রকাশিত, কখনো চাপা দীর্ঘশ্বাসের মতো *মেঘদূত*-এর যক্ষপ্রিয়ার বেদনায় অন্তর্লীন। বৈষ্ণব কবিতার রাধার বিরহ বেদনার সঙ্গে একাকার করে পঙ্‌ক্তি রচনা করেছেন বিরহী কবি :

প্রাণপুষ্পের পরাগ ঝরিল, আসিলে না আজো বঁধু।
শুকায়ে উঠিল মরমের দল, শেষ হয়ে এল মধু।
জানো না কি তুমি– তোমার লাগিয়া কাঁদিয়া কাটিছে দিন
পথ পানে চাহি– যে পথে তোমার রেখে গেছ পদ চিন্।
(হাসিয়া কহিবে :*দীওয়ান*)

এবং

যৌবনে মাধুরীক্ষরা রাত্রিদিন ছিল ঝঙ্কারিত
অন্তরে মধুর স্বপ্নে প্রাণ ছিল ফুল অকুণ্ঠিত।
বাসন্তী পূর্ণিমা রাত্রে বৈশাখের প্রবল ঝঞ্ঝায়

নিবিড় আষাঢ় রাত্রে আমার অন্তর অলকায়
পাঠিয়েছে মেঘদূত আমার বিরহী প্রিয়তম
মনোরমা! মোর কাছে যে আমার চির মনোরম
পুষ্প উপহারসহ অনেক গানের সুরে সুরে
সেদিন চলিয়া গেছে দূরে।
(কথা : *দীওয়ান*)

মৃত্তিকার ঘ্রাণ (১৯৭০) কাব্যের 'দীপ্ত দ্বিপ্রহরে', 'বিজয়িনী', 'বিদায় বাঁশরী', 'বঞ্চিতা' 'সান্ত্বনা কোথায় ?' প্রভৃতি কবিতায় পূর্বোক্ত কাব্যের বিরহের সুর অনুরণিত হয়েছে। সুফিয়া কামাল প্রকৃতির মধ্যে বিরহের বিবর্ণসত্তাকে অবলোকন করেছেন। তাই তাঁর কবিতায় প্রকৃতির অনুষঙ্গে প্রেম-বিরহের আবেগময় প্রকাশ লক্ষ করা যায় :

বুভুক্ষিতা তৃষ্ণাতুরা সৃষ্টির আদিম প্রাতে জাগি,
শ্যামলিয়া চেয়েছিল প্রথম প্রভাত সূর্যে প্রেম ভিক্ষা মাগি !...
সৃষ্টির প্রভাত হতে আজিও না কত উষা গেল গো আসিয়া
গাঁথি কত মিলনের মালা, কত গাঁথা মালা গেল গো ছিঁড়িয়া।
শুধু আসিল না আজো ধরণীর বুকে তার সূর্যের চুম্বন।
দূর–দূর নীলিমায় থেকে শুধু নিতি তারে করিছে দহন।
তবুও তাহার লাগি ধরণী জাগিয়া নিত্য প্রাতে
চিরন্তনী আশার ছলনে হায় ! চেয়ে থাকে মুগ্ধ নেত্র পাতে ॥
(দীপ্ত দ্বিপ্রহরে : *মৃত্তিকার ঘ্রাণ*)

অন্তর্লোকের জ্যোর্তিময় প্রভায় বিরহও হয়ে উঠেছে জীবনশক্তির সহায়ক এবং অনুভববেদ্যতায় ঋদ্ধ :

মন
মোর অনুক্ষণ
স্বপ্ন রচে তোমারেই ঘিরে
দেহের অতীত মোর স্বপ্ন- তীর্থ অন্তর–মন্দিরে–
নীত
তুমিই অতীত
ভবিষ্যের প্রতিষ্ঠ দেবতা
বিরাজিছ পূর্ণ গর্বে। তাই মোর ঘুচিল দীনতা।
(বিদায় বাঁশরী : *মৃত্তিকার ঘ্রাণ*)

সুফিয়া কামালের কবিতায় মানবত্মার চিরবিরহী রূপই মূর্ত হয়ে উঠেছে। কেবল সুফিয়া কামালই নন, আবহমান বাংলা কবিতা কবিচিত্তের বিরহের প্রতিফলনে সমৃদ্ধ। বাংলা গীতিকবিতার উদগাতা বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতায় বিরহের সার্থক রূপায়ণ লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের কবিতায় বিরহের চিরন্তন ও শাশ্বত রূপ অঙ্কিত হয়েছে। বিহারীলাল চক্রবর্তীর দুটি চরণ মানবাত্মায় বিরাজিত দুঃখবোধকেই উন্মোচিত করে :

সর্বদাই হু হু করে মন
বিশ্ব যেন মরুর মতন।
(*বঙ্গসুন্দরী*)

সুফিয়া কামালের কবিতার প্রতিচরণে বিরহের এই সুরই প্রতিধ্বনিত। জীবনানন্দ দাশ এই বিরহবোধকেই বলেছেন 'বিপন্ন বিস্ময়', যা মানুষের মনোজগতকে করে ক্লান্ত ও অবসন্ন। তবে জীবনানন্দ দাশের দুঃখবোধ ইউরোপ- উদ্ভূত সাহিত্যতত্ত্ব আশ্রিত। কেননা এই দুঃখবোধ মূলত নৈরাশ্য, হতাশা ও শূন্যবাদকে অবলম্বন করে বর্ধিত, যা মানুষের সংগ্রামী চেতনাকে বিনাশ করে। এ প্রসঙ্গে আবুল কাসেম ফজলুল হকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> শিল্প সাহিত্যের জগতে আধুনিকতাবাদের মর্মকথাটা হল : গভীর দুঃখের অনুভূতি ছাড়া কেউ কোন সার্থক শিল্প কিংবা সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন না। একথা অবশ্য শিল্প-সাহিত্যের সকল তত্ত্বেই কোন না কোনভাবে স্বীকৃত। তবে সেটা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নিঃসৃত দুঃখ। আধুনিকতাবাদীরা অভিজ্ঞতার প্রশ্ন বিবেচনায় আনেন না। তাঁরা বিশেষভাবে বলতে চান যে, দুঃখই জীবনের শেষ কথা–পরম সত্য। শিল্প সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁরা সজ্ঞানে দুঃখের চর্চা করেন, দুঃখকে মহিমান্বিত করেন। দুঃখের সমস্যাকে তাঁরা বিচার-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চান না। তাঁদের দুঃখচর্চার ব্যাপারটা কৃত্রিম।[১]

উপর্যুক্ত বক্তব্যের আলোকে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, শিল্পীর জীবনাদর্শ অনেকটা তাঁর লালিত দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সুফিয়া কামালের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। কল্লোল যুগের কবিদের রচনায় বিপন্ন, ব্যর্থ, পরাজিত, রুগ্ণ, বিকৃত ও হতাশ জীবনের অসহায়ত্ব ও যন্ত্রণাই গাঢ়-রেখায় অঙ্কিত হয়েছে। সেখানে নেই মানুষের আশাবাদের কথা, নেই দুঃখ থেকে উত্তরণের ইঙ্গিত। এ প্রসঙ্গে সমালোচক আরও বলেন :

> নৈরাশ্যবাদের বাস্তব ভিত্তি তো মানুষের জীবনে এবং পরিবেশে থাকেই। তবে সেই বাস্তব ভিত্তির মধ্যে আশাবাদের বিস্তৃত পরিসরও একই সঙ্গে বিরাজ করে। উপনিবেশবাদীরা এবং তাদের স্থানীয় সহযোগীরা আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন নৈরাশ্যবাদকে জয়ী করে মানুষকে অদৃষ্টবাদী করে মানুষের সংগ্রামী চেতনাকে বিনাশ করে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় ভীতিকে বহাল রাখার অন্যতম কর্মনীতি রূপে।[২]

---

[১] আবুল কাসেম ফজলুল হক, *আধুনিকতাবাদ ও জীবনানন্দের জীবনোৎকণ্ঠা*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃষ্ঠা-১৭

[২] আবুল কাসেম ফজলুল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬১

কল্লোল-পর্বের কবিদের সঙ্গে সুফিয়া কামালের অনৈক্য এক্ষেত্রে যে, সুফিয়া কামাল নৈরাশ্যকে অতিক্রম করে আশাবাদের চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছেন, ক্রমশ হয়ে উঠেছেন জীবনবাদী ও মানবমুখী। অপর পক্ষে আধুনিকবাদীরা ছিলেন অবক্ষয়বোধে কাতর, নেতিচেতনায় সমর্পিত।

সুফিয়া কামাল বিরহের স্মৃতিকে জীবনের পাথেয় হিসেবে নিয়েছেন। বিরহই তাঁকে দিয়েছে দুঃখ- অতিক্রান্ত শক্তি ও সাহস :

হে শান্ত ! অশান্ত রুদ্রতালে
আমারে বাসিলে ভালো- অভিসারে সে নিশীথকালে
অস্থির অধীর হ'লে স্থৈর্য, ধৈর্য ভুলিয়া নিমেষে,
হিমাদ্রি গলিয়া এলে ঝর্ণারূপে মোরে ভালোবেসে।
অবগাহি সে ধারায় ধন্য মোর জীবন-যৌবন
দু'য়ে মিলি এক হয়ে হেরেছিনু যে সুখ-স্বপন–
আজিও ভাঙেনি প্রিয় ! রহিয়াছে সে প্রেম গৌরব,
না-ই যদি এলে আজও রবে সেই স্মৃতির সৌরভ।
(স্মৃতির সৌরভ : *মায়া কাজল*)

কবি প্রার্থিত প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনের প্রত্যাশা করেন, কিন্তু বিরহও অপার শুদ্ধতায় তাঁর কাছে ধরা দেয়। কবির যন্ত্রণা-অতিক্রমী সত্তা তাই উচ্চারণ করে–

এ মরুজীবনে তুমি নিশীথের স্নিগ্ধ চন্দ্রকর,
বিহনে তোমার মানি প্রতিক্ষণ দীপ্ত দ্বিপ্রহর।...
হাসি কান্না দুঃখ-সুখ তোমারে লইয়া আজো যার,
অকরুণ ! অকারণে এখনও রয়েছে দূরে তার !
এস এস লয়ে এস মোর তরে তব যুগ্ম অঞ্জলিতে করি
আমার তৃষ্ণার শেষ, আনন্দের অনন্ত মাধুরী–
সুন্দরের হস্ত হতে মৃত্যুর অমৃত করি পান,
প্রিয় মোর ! এই প্রাণ তোমারে করিব শেষ দান।
(একদা : *মন ও জীবন*)

মানসপ্রিয় অধরা, অন্তরের মাঝেই তাকে অনুভব করতে চান কবি। কবিতায় সেই উপলব্ধির সত্যতা প্রকাশিত:

মন বিহঙ্গ খুঁজে ফিরে সখী সন্ধ্যা গগন ভরি–
পাইনি খুঁজিয়া, মিলাইয়া যাও হে আমার বিভাবরী !
আমার প্রভাত ! আমার দিবস ! আমার মানস-প্রিয়া !
হে অ-ধরা মোর ! ধরা নাহি দিলে, ভরিয়া রহিলে হিয়া।
(প্রিয় বিরহের নিশি : *মন ও জীবন*)

নজরুল ইসলাম সুফিয়া কামালের *সাঁঝের মায়া* কাব্যগ্রন্থের বিরহধর্মী কবিতা সম্পর্কে বলেন :

> সাঁঝের মায়া'র কবিতাগুলি সাঁঝের মায়ার মতই যেমন বিষাদ-ঘন, তেমনি রঙ্গীন; গোধূলির রঙের মত রঙ্গীন। এ সন্ধ্যা কৃষ্ণা-তিথির সন্ধ্যা নয়, শুক্লা চতুদর্শীর সন্ধ্যা। প্রতিভার পূর্ণ-চন্দ্র আবির্ভাবের জন্য বুঝি এমনি বেদনা-পুঞ্জিত অন্ধকারের, বিষাদের প্রয়োজন আছে। নিশীথ-চম্পার পেয়ালায় চাঁদনীর শিরাজী এবার বুঝি কানায় কানায় পুরে উঠবে। বিরহ যে ক্ষতি নয়, 'সাঁঝের মায়া' ই তার অনুপম নিদর্শন। এমন কবিতার ফুল ফোটাতে পারলে কাব্যমালঞ্চের যে কোন ফুলমালি-কবি নিজেকে ধন্য মনে করতেন।[১]

সাঁঝের মায়া কাব্যগ্রন্থের 'সাঁঝের মায়া' কবিতাটি বিরহের পূর্ণ প্রভায় বিচ্ছুরিত; নিবেদনের মহিমায় উজ্জ্বল। অস্তাচল রবির মতোই যে প্রিয়জন লোকান্তরে চলে গিয়েছে তার জন্য বেদনাঘন হৃদয়-আকুতি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে এ কবিতায়। প্রিয়জনের সান্নিধ্যলাভে ধন্য হতে চান কবি; তবে তা পার্থিব জীবনের কর্ম-কোলাহলের অবসানে। প্রকৃতি ও নিসর্গের সৌন্দর্যদৃশ্য আস্বাদনের আগে কবি এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে চান না। যখন কবির গৃহে আর দীপ জ্বলবে না, সকল কর্ম সারা হয়ে আসবে তখনই যেন তাঁর প্রিয়জন গোধূলি লিপিতে তার আমন্ত্রণ পাঠায়; অর্থাৎ সে সময়েই কবি মৃত্যুকে বরণ করে নিতে চান। একদিকে প্রিয়সান্নিধ্য কামনায় মৃত্যু-ইচ্ছা, অন্যদিকে জাগতিক মঙ্গল কামনায় কর্মপ্রবাহ পরিচালনার দায়িত্ব-কর্তব্যভার এই দ্বিবিধ মানসিকতার উপস্থাপন কবিতাটিকে বিশেষ মাত্রায় উন্নীত করেছে। মূলত, সুফিয়া কামালের বৈধব্যদশা ও সংসারযাত্রায় সন্তানের দায়িত্বভার– রূপকাকারে চিত্রিত হয়েছে এ কবিতায়। এ প্রসঙ্গে আয়েশা নবীর মন্তব্য :

> বেগম সুফিয়া কামাল ঝর্ণাধারার মত আপন গতিতে কবিতা সৃষ্টি করে চলেছেন প্রাণের তাগিদে। তাঁর এক একটি কবিতা এক একটি অনুভূতি প্রখর মুহূর্তের খণ্ডচিত্র।[২]

সাঁঝের মায়া কবিতাটিও একটি অনুভূতিপ্রখর মুহূর্তের খণ্ডচিত্র। সুফিয়া কামালের এই দ্বিবিধ মানসিকতার ছায়াপাত তাঁর কবিতা ও রচনাসমূহে দীপ্যমান। এ প্রসঙ্গে আবুল ফজলের বক্তব্য:

> সুফিয়া কামালের দুই সত্তা : কবি হিসেবে তিনি এক সুকোমল নারী, প্রেম ভালোবাসা আর সুকুমার অনুভব-অনুভূতির মূর্তিমান প্রতীক তাঁর কবিতাও তাই। ... তাঁর মধ্যে এক অনন্য সংগ্রামী সত্তা রয়েছে। আমাদের ইতিহাসের আবর্তন-বিবর্তনে সব সময় তাঁর মন দিয়েছে সাড়া। জাতীয় জীবন ও মানসে তাঁর সে সত্তার মূল্য ও অবদান কখনো ভুলবার নয়। এক অসাধারণ সংগ্রামী সত্তার অধিকারী তিনি, তাঁর চরিত্রেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ– এ চারিত্র্য শক্তিতে তিনি একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।[৩]

---

[১] সুফিয়া কামাল, *সাঁঝের মায়া*, প্রথম প্রকাশ,সময় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০ নভেম্বর ২০০০, পৃষ্ঠা-১০

[২] ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *সুফিয়া কামাল*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬৮

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৭১

সাঁঝের মায়া তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ এবং প্রথম কবিতার নাম। এ কাব্যের সূচনায়ই কবি জীবনের লক্ষ্য স্থির করেছেন– এক সংগ্রামী কর্মযজ্ঞ তাঁর জন্য অপেক্ষমান, সকল প্রতিকূলতার মুখে করি দৃঢ়পদে দাঁড়াতে চান। এরকম একটি ইঙ্গিতময় সম্ভাবনার কথা কবিতায় উল্লেখ করেছেন তিনি। মৃত্যু নয়, পৃথিবীর পাঠ তিনি সাঙ্গ করতে চান। পৃথিবীকে সুন্দর করার অঙ্গীকারবদ্ধ কবি তারপরই মৃত্যুকে গ্রহণ করে চলে যাবেন প্রিয়ের সান্নিধ্যে :

সাঙ্গ হলে সব কর্ম, কোলাহল হলে অবসান,
দীপ-নাহি-জ্বালা গৃহে এমনি সন্ধ্যায় যেন তোমার আহ্বন
গোধূলি-লিপিতে আসে। নিঃশব্দ নীরব গানে গানে,
পূরবীর সুরে সুরে, অনুভবি তারে প্রাণে প্রাণে
মুক্তি লভে বন্দী আত্মা– সুন্দরের স্বপ্নে, আয়োজনে,
নিঃশ্বাস নিঃশেষ হোক পুষ্প বিকাশের প্রয়োজনে।
(সাঁঝের মায়া : *সাঁঝের মায়া*)

সুফিয়া কামাল প্রকৃতির কবি। প্রকৃতি তাঁর কবিতায় এসেছে বিচিত্র বৈভবরূপে। যন্ত্র-তাড়িত অস্থিরতায় জীবন যেখানে বিপন্ন ও বেদনার্ত সেখানে সুফিয়া কামাল প্রকৃতির নিবিড় শ্যামলিমায় উপ্ত করেছেন পরিস্রুত-জীবনের মন্ত্রবীজ। তিনি তাঁর মনোবেদনা ও অতৃপ্তির ক্ষতকে পূর্ণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন প্রকৃতির সাহচর্যে। প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে তিনি প্রেম-বিরহ-আনন্দ বেদনার চরাচরে নিমগ্ন হয়েছেন। *সাঁঝের মায়া*, *মায়া কাজল*, *মন ও জীবন*, *উদাত্ত পৃথিবী*, *দীওয়ান* ও *মৃত্তিকার ঘ্রাণ* প্রভৃতি কাব্যে মানবজীবনের মনন-ক্রিয়ায় প্রকৃতি যে সজীব উদ্দীপক, তার পরিচয় বিধৃত হয়েছে। মানুষ প্রকৃতিরই অংশীভূত, প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন সত্তা বিকারগ্রস্ত ও বিধ্বংসী। তাই পৃথিবীর সকল কবির মতো সুফিয়া কামালও বার বার ফিরে গেছেন প্রকৃতির কাছে; আত্মশুদ্ধি ও পরিতৃপ্তির পাঠ নিয়েছেন প্রকৃতির কাছ থেকে। আ-শৈশব তিনি বেড়ে উঠেছেন বরিশালের অবারিত ও বিস্তীর্ণ-প্রকৃতির-শ্যামলিমায়। ফুল-পাতা-লতা ঘেরা অন্তঃপুরে তার প্রথম নিবিড় পরিচয় প্রকৃতির সাথে; যা আত্মস্থ ও লালন করেই তিনি বিকশিত হয়েছেন। তাই তাঁর কবিতা প্রকৃতির সহজ-সরল লালনভূমি। এ প্রসঙ্গে আবুল ফজলের উক্তি স্মরণযোগ্য :

> তিনি বাংলাদেশের কন্যা, বাংলাদেশের আবহাওয়া আর পরিবেশে গড়া তাঁর কবিসত্তা। তাঁর কবিতার গায়ে এখানকার শ্যামল প্রকৃতির সুকোমল ছায়া ছড়িয়ে আছে, অন্তরেও প্রকৃতির স্নিগ্ধতাই প্রতিবিম্বিত। ... আমাদের চারদিকের প্রকৃতিতে 'জল-পড়া, পাতা নড়া' দেখে তিনি মুগ্ধ হন, মুগ্ধ হন ঈদের চাঁদ দেখে। তাঁর কবিতা সে মুগ্ধ মনেরই প্রকাশ। বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ–

বাংলাদেশের প্রধান ও অপ্রধান কোন কবিই এ ঋতুর বিচিত্র আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুফিয়ার মনও প্রতি ঋতুতে উদ্বেলিত ও শিহরিত হয়েছে।[১]

সুফিয়া কামাল প্রকৃতিকে তাঁর কবিতায় নানাভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর কবিতায় শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত ঋতুর প্রভাব সর্বাধিক। বর্ষার প্রসঙ্গ ব্যাপকাকারে বর্ণিত হয়নি তাঁর কবিতায়। *সাঁঝের মায়া*তে প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলো যেমন : 'শরৎ আবার যেদিন আসিবে', 'ঝড়ের আগে', 'ঝড়ের শেষে', 'চৈত্র-পূর্ণিমা', 'কেতকীর ব্যথা', 'শেষের সম্ভার' 'শ্রাবণের রাত্রি হয় শেষ', 'অনন্ত পিপাসা' প্রভৃতিতে প্রকৃতির বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। প্রেম-বিরহের প্রতীকরূপে নিসর্গের ব্যবহার রয়েছে তাঁর কবিতায়। প্রকৃতিকে ইন্দ্রিয়জ সত্তারূপে উপস্থাপন করেছেন সুফিয়া কামাল তাঁর কবিতায় :

চৈত্র-পূর্ণিমার রাত্রি। মাধবী বিতান মধুক্ষরা,
মধুর আনন্দাশেষে আজি রাত্রে জাগে বসুন্ধরা।
মুকুল সৌগন্ধ ভারে শথগতি দখিনা পবন
নৃত্যের সুচ্ছন্দে চলে, মর্মরিয়া ঘন বেণুবন।
তটিনী-উমির মালা শত ভঙ্গে চন্দ্রে নিবেদিয়া,
অক্লান্ত লীলায় লাস্যে তটপ্রান্তে পড়িছে মূর্ছিয়া
দুর্নিবার প্রেমোচ্ছ্বাসে, অবিরাম কণ্ঠ-কলগীতে
বিজ্ঞাপিছে প্রেম তার উদ্বেলিত তরঙ্গ-সঙ্গীতে।
মধুর মাধবী নিশি! পূর্ণপাত্র হস্তে যেন সাকী–
জ্যোৎস্নার মদির-স্বপ্নে মুকুলিত মাধবীর আঁখি,
গোলাবের স্নিগ্ধ-গন্ধে বসন্তের অস্থির অন্তর
আজি রাত্রে সমাহিত, হাসিছে প্রসন্ন সুমন্থর!
(চৈত্র-পূর্ণিমার রাত্রি : *সাঁঝের মায়া*)

কখনও কখনও প্রকৃতিকে নিষ্ঠুর রূপে প্রতীকায়িত করেছেন তিনি :

নিষ্ঠুর দস্যুর সম সুকঠোর ঝঞ্ঝা প্রহরণ;
আকাশ বাতাস ব্যাপি হেরিতেছি তারি আয়োজন।
হেরিনু সুন্দর পরে অসুন্দর অসুর পীড়ন
কোমল কঠোর নিষ্পেষণ।
(ঝড়ের আগে : *সাঁঝের মায়া*)

প্রকৃতির ধ্বংসলীলার মধ্যেও রয়েছে সৃজনের সম্ভাবনা– নজরুলের মতো সুফিয়া কামালও তা বিশ্বাস করেন :

[১] সুফিয়া কামাল, *স্বনির্বাচিত কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩.

এ ধ্বংস-লীলার শেষে নব সৃষ্টি আসিবে সে জানে,
তাহারি আশ্বাসে তৃপ্তি নামিয়াছে স্নিগ্ধ দু'নয়নে।
(ঝড়ের শেষে : *সাঁঝের মায়া*)

সাঁঝের মায়া তে প্রকৃতি বিদায়-ব্যথায় যেমন ব্যথিত, তেমনি আবার নতুন ঋতুর আগমনে উৎফুল্ল। এ-কাব্যে শরৎ ঋতু প্রাধান্য পেয়েছে। মাঘের বিদায়, বসন্তের আগমনচিহ্ন প্রভৃতি সুফিয়া কামাল ব্যক্তিগত আবেগ, শোক ও দুঃখকেই আশ্রয় করে প্রকাশ করেছেন। শরৎ ঋতু কবির জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছে। তাই তিনি এ ঋতুকেই কামনা করেছেন পুনর্বার :

বরষায় গান সারা হয়ে হ'ল শরতের ঋতু শেষ। ...
চলে যেতে যেতে পথ ভুলে' যদি আজিও ক্ষণিক তরে
সেই সুন্দর শরৎ আবার আসিত তেমনি করে,
বিদায়ের দিনে হাসিত, সে যদি একবার চাহি' মুখে,
হয়ত ফুটিত মাধবীর কুঁড়ি আজিও ধরার বুকে।
সুখ-ঘন রসে অসময়ে আজি ফুটাইয়া যেন ফুল
শেষ মধুটুকু অর্পিয়া যেত, শেষবার করি ভুল।
(শরৎ আবার যেদিন আসিবে : *সাঁঝের মায়া*)

মানবকল্যাণমুখী সুফিয়া কামাল প্রকৃতির অবারিত বিস্তীর্ণতায় জীবনকে উপলব্ধি করেছেন; অনুভব করেছেন সর্বংসহা ধরণী-মাতার বিশালতা ও ব্যাপকতাকে। প্রকৃতির পরম আশ্রয় ধরণী-বসুন্ধরা। যেখানে সকল উপাদানই নির্ভয়ে ঠাঁই পায় :

তব স্নেহ সরসীর নীরে
কমল কুমুদ হাসে, মরাল বলাকা ফিরে ধীরে
অপরূপ লীলাচ্ছন্দে। নিশীথে বিরহী চক্রবাক
সাথীদের খুঁজিয়া ফেরে, কুলায়ে নির্বাক
কপোত মিথুন জাগে, তব স্নিগ্ধ স্নেহচ্ছায়াঞ্চল
বিথারি দিয়াছ ধরা। শান্ত অচপল
অমৃত সন্তান তবু, নিরুদ্বিগ্ন দ্বিধাহীন মুখে
সুষুপ্ত আনন্দ স্বপ্নে, এলায়িত তব শান্ত বুকে।
(সুন্দরী বসুধা : *মায়া কাজল*)

সুফিয়া কামালের বিরহ-বিধুর মন প্রকৃতির মাঝেও বিরহ-বেদনাকে প্রত্যক্ষ করেছে। উষা ও সন্ধ্যার প্রকৃতি একই হলেও চির-বিরহের দূরত্ব নিয়ে অস্তিত্বমান এই দুটি প্রহর, মিলনের উন্মুখতায় অধীর হলেও তাদের ব্যবধান কখনোই ঘোচে না; এ যেন স্রষ্টারই কঠোর বিধান :

গগনের খেয়া বেয়ে–
দিনশেষে আসি তৃষিত হৃদয় ক্লান্তিতে দেহ ছেয়ে
অবশ-বিবশ এ হৃদয়-মন তোমারি পরশ লভি
জুড়াইতে চাহে ওগো সুদূরিকা ? হায় ও যে মায়া সবি !
তুমি প্রিয়তমা, অলকার ধন–আমি ধরণীর পাশে
ঘুরে ঘুরে মরি যুগ যুগ ধরি বৃথাই তোমার আশে।
এই কথা শুনি সন্ধ্যার চোখে বারিধারা উতরোল–
হায় প্রিয়তম ! না জানিয়া কেন দাও এই ব্যথা দোল ?
তুমি ধরাপাশে, আমিও আকাশে, মাঝে মহা ব্যবধান
স্রষ্টার রচা এ যে ভুলে ভরা কঠোর করুণ দান।

(সন্ধ্যা : *মন ও জীবন*)

বিরহের মধ্য দিয়েই যে সৃষ্টিশীল সৌন্দর্যের প্রকাশ তা কবি প্রকৃতির নিবিড়-পরিচর্যায় হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন :

পরিপূর্ণ সে দিগন্তে শুধু কাঁদে একাকিনী বসি
বিরহ বেদনা দীপ্ত জ্বালাইয়া যে চির ক্রন্দসী,
তাঁর আঁখি নীরে
ধরণীতে ফুটে ফুল ঋতু আসে বারবার ফিরে।
অক্ষয় সম্পদ নিয়া যদি সেই বিরহের ব্যথা
তার বক্ষে না বাজিত,
ফুল না ফুটিত শাখে
সহকারে দুলিত না লতা।
আমার দিগন্ত ভরি নিত্য চলে এই রূপায়ণ–
দু'আঁখি ভরিয়া হেরি, তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠে মন।

(দিগন্ত : *মন ও জীবন*)

বর্ষা-প্রকৃতির ধারাস্নানের মাধ্যমে কবি-আত্মার বিরহবেদনাই কেবল নয়, আশাবাদী চেতনারও রূপময় প্রকাশ ঘটেছে :

নীরব নিশীথ। ঝরিতেছে ধারা গান
কোন বিরহীর অশ্রুতে করি স্নান।
শিহরি শিহরি উঠিতেছে নীপবন
ঝরিল বকুল, যুথী হলো উন্মন।
গগনের পথ ঢেকেছে কাজল মেঘে
পথ-ভোলা বায়ু শ্বসিয়া উঠিছে বেগে।
পথ কোথা-কোথা সেই অলকার পথ ?...

দূর নীলিমায় মেলিয়া কাজল আঁখি
মেঘ সন্ধানে উৎসুক করে রাখি
যুথী মাল্যের গ্রন্থিতে আনমনে
প্রিয় বিরহের দিনগুলি চলে গণে !
নব বরষার ঘন মেঘ আনে কী বারতা !
বিরহের দিন হল অবসান– শীর্ণ লতা
মধু মিলনের কল্পনা করি মেঘের ডাকে
প্রিয় প্রসাধন আলপনা দেহে আঁকে
মলিকা মালা, কেতকী-কেশর রেণু
রজনীগন্ধা, রোমাঞ্চময় তনু
পঙ্কজ পাতে লিখিতেছে প্রিয়নাম–
মেঘের মায়ায় যে স্বপন অভিরাম।
আর্দ্র পবনে মেঘমালার সুর
বিশ্ববিরহ আর্ত বেদনাতুর–
কোথা বাঞ্ছিত ? শুধুই আশার জাল–
দয়িতবিহীন আসে ফিরে মহাকাল।
(নব বরষার ঘন মেঘ আনে কী বারতা : *মন ও জীবন*)

উদাত্ত পৃথিবী কাব্যের 'রূপসী বাংলা' পর্বের প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় সুফিয়া কামাল প্রকৃতি ও মানবজীবনের সম্পর্ক যে একই সূত্রে গাঁথা সে সত্য আবিষ্কারে প্রয়াসী হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের মন্তব্য উদাহরণযোগ্য :

> কবিকে পাই প্রকৃতির সঙ্গে একান্ত অবস্থায় এবং এই নিসর্গ-প্রীতি যেন অনেকগুলো মহৎ কবিতার জন্ম দিয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের সম্পর্ক নিবিড়। এই উপলব্ধির পূর্ণ বিকাশ রয়েছে 'রূপসী বাংলা' বিভাগ পর্বের কবিতাগুলোতে।[১]

প্রকৃতি মানুষকে নিঃস্ব, রিক্ত বা দীর্ণ করে না, বরং নব প্রত্যাশায় উজ্জীবিত করে– এ বক্তব্যেই প্রতিধ্বনিত হয়েছে এ-পর্বের কবিতায় :

জীর্ণ পত্র ঝরে যায়, নবীন অঙ্কুর জাগে তার শূন্য স্থানে
এক সুর শেষ হয়, অন্য সুর বেজে ওঠে সভা-শেষ গানে।
হারায় না কিছু–
তরঙ্গ উত্তাল হয়, মিশে যাওয়া তরঙ্গের পিছু।
(নববর্ষে : *উদাত্ত পৃথিবী*)

[১] ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *সুফিয়া কামাল*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৪

উদাত্ত পৃথিবীর 'রূপসী বাংলা' পর্বে কবি প্রকৃতির আবর্তন-চক্রকে চিহ্নিত করেছেন ঋতু-রোমান্সের চিত্রাঙ্কন সূত্রে। 'বৈশাখী নিশীথ', 'বর্ষার প্রতীক্ষা', 'স্বর্ণাভ শস্যের ঘ্রাণ', 'রূপসী বাংলা', 'হেমন্ত', 'শীত', মাঘের মমতা', 'ফাল্গুন-রাত্রি', 'মধুগন্ধা' প্রভৃতি কবিতায় প্রকৃতি ও মানব একীভূত সত্তায় অন্তর্লীন। কবি প্রকৃতির স্বরূপকে উন্মোচিত করেন বিশ্ব চরাচরের পটভূমিকায় :

১. আমি শরতের ঋতু। আসিলাম বরষার ক্রন্দনের শেষে
প্রসন্ন প্রভাত লয়ে নীলাকাশে ঝলমলি হেসে।
দাক্ষিণ্য সুন্দর দিল দক্ষিণ হাতের মুষ্ঠি ভরে,
ব্যাধি, মারী, অস্বাচ্ছন্দ্য ঢাকিলাম মোর বাম করে।
(স্বর্ণার্ভ শস্যের ঘ্রাণ : *উদাত্ত পৃথিবী*)

২. আমি হেমন্তের ঋতু আসিলাম কুহেলী-আচ্ছন্ন ম্লান সাঁঝে
স্খলিত পত্রের দলে আচ্ছাদিত করি দেহ লাজে। ...
আনিলাম আগামীর নবান্নের মধু-সম্ভাবনা,
ভুলাইয়া ক্ষুধার্তের অন্নহীন ক্লান্ত দুর্ভাবনা,
বক্ষের মমতা দিয়া বহাইয়া মোর অশ্রুজল
দিনে-রাত্রে মাঠে মাঠে ফলাইতে সোনার ফসল।
(হেমন্ত : *উদাত্ত পৃথিবী*)

৩. আমি শীত। আসিলাম। রহিলাম সর্তক-সজাগ
দীর্ঘ, সিক্ত রাত্রি ভরি মোর বক্ষ; ভরা অনুরাগ
অশোকে পলাশে আর মুকুলের সুস্নিগ্ধ সুবাসে
রাখিলাম মিশাইয়া বসন্তের উদাসী বাতাসে।
(শীত : *উদাত্ত পৃথিবী*)

৪. চলে যায় শীত। আসে মাঘের মমতা-ভরা কোলে
পথ-ভোলা শিশু-সম ফাগুন, হাওয়ায় যেন দোলে
উত্তরীয় প্রান্ত তার, লোহিত, সবুজ, নীল, পীত,
সে রঙে রঙিন ধরা, বন্দনায় পিকের সঙ্গীত
ঝঙ্কারিল দিক ভরি' হাসিল প্রসন্ন সূর্যকর
কুয়াশা-কুণ্ঠিত পদে সরে, বাড়ে দিনের প্রহর।
অরণ্য কন্যারা জাগে মেলি নব কিশলয় আঁখি
বসন্তের আগমন। বারতা ঘোষিল গানে পাখি।
(মাঘের মমতা : *উদাত্ত পৃথিবী*)

৫. ধরণী গুণ্ঠন খোলা, খুলে গেছে দখিন দুয়ার,
পিকের আহ্বান শুনি বসন্ত যে আসিল আবার। ...
অজানা আশেষ-সুখে ভার হয়ে আসে যেন আঁখি
গোপন বেদনা-সুখ বাঁশী যেন যায় ডাকি ডাকি।
তনুর অণুতে জাগে ক্ষণে ক্ষণে তীব্র রোমাঞ্চন
কোন সুদূরের লাগি পলে পলে চকিত উন্মন।
(মধুগন্ধা : *উদাত্ত পৃথিবী*)

বসন্ত-প্রকৃতির অনুষঙ্গে রোমাঞ্চিত কবিসত্তার অনুভব ও উপলব্ধি কবি ব্যক্ত করেছেন নিম্নোক্ত কবিতাংশে–

আমি কবি আসিলাম ফুল ফুটাবার এই বেলা,
যেখানে প্রথম মোর জীবনের লেখা লেখা খেলা
শুরু হয়েছিল কবে, ...
আমি কবি– মোর পরিচয় এইখানে।
এখানে ব্যথা মধু হেনার কন্টকবিদ্ধ জ্বালা
এখানের বন্য-পুষ্পমালা
সে মালার গ্রন্থি, সে পুষ্পের সৃষ্টির সৌরভ
ঐশ্বর্য সম্পদ মোর, সেই মোর অক্ষয় গৌরব।
সে বৈভব ভারে মোর আনন্দে অন্তর অবনত।
পুষ্প ভারানত শাখার মতো
ঋণী হয়ে নিয়ে যাই পূর্ণ করে প্রাণের পেয়ালা
বসন্তের শেষ দিনে।
(এখানে বসন্ত : *দীওয়ান*)

দীওয়ান কাব্যগ্রন্থের 'এখানে আমার রাত', 'এখানে বসন্ত', 'শুক্তি', 'পউষ', 'স্বপিল', 'খুলে দাও দক্ষিণ দ্বার', 'বিগদ্ধ বসন্ত', 'এই ত বৈশাখী দিন', 'বৈশাখ', 'অকাল মেঘ', 'নবমেঘ', 'শ্রাবণ', কালচক্র', 'হে মৌন হিমালয়' প্রভৃতি প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা। প্রকৃতিকে সুফিয়া কামাল কেবল চেতনায়ই ধারণ করেননি বরং প্রকৃতিকে অবলম্বন করে তিনি হয়ে উঠেছেন সুদক্ষ চিত্রকর। *সাঁঝের মায়া, মায়া কাজল, মন ও জীবন* কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোতে প্রাপ্তির আনন্দ এবং অপ্রাপ্তির বেদনাময় উপলব্ধি পরিলক্ষিত। কিন্তু *দীওয়ান* কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতি যেন এক অপার সম্ভাবনার প্রতীক, শান্তসমাহিত রূপে তার আবির্ভাব। এখানে কবিহৃদয় তৃপ্ত, পরিপূর্ণ এবং নতুন আশায় উজ্জীবিত:

১. আমি শুক্তি পঙ্কিল আবর্তে রহি পড়ে,
অথবা ক্লেদাক্ত দেহ শুষ্ক হয়

Dhaka University Institutional Repository

সৈকতের বালুকাভ্যন্তরে।
তবু মোর এ জীবন সাফল্যে সুশুভ্র স্বর্ণোজ্জ্বল,
মুক্তার জননী আমি, আমি শুক্তি
বক্ষে ফলে মুক্তার ফসল।
(শুক্তি : *দীওয়ান*)

২. লেলিহান শিখা জ্বালি দহিয়া চৈত্র দিন
সন্ধ্যার সুস্নিগ্ধ ছায়ে তপ্ত দেহ করিছে বিলীন।
রক্তিমাভ ধূলির গোধূলি
এনেছে দহন জ্বালা বৈশাখের অগ্নিময়াঞ্জলি। ...
শ্বসিয়া উঠিছে বায়ু, দাবদগ্ধ বক্ষ বসুধার,
চৈত্রের প্রদাহ সয়ে ফুটিতে চাহে না পুষ্প আর, ...
সন্ধ্যার অঞ্চলতলে সকুণ্ঠিতা ক'টি নিম্ব কুঁড়ি
শঙ্কিত হৃদয় লয়ে স-সঙ্কোচে উঠিল শিহরি।
সে তুচ্ছ। সে ক্ষুদ্র তার রিক্ততায় পূর্ণ দেহমূল,
তবু সে বসন্ত রাত্রি সৌরভেতে করিল আকুল।
(বিদগ্ধ বসন্ত : *দীওয়ান*)

৩. মেঘলোক হতে আসে কাজল সজল আঁখিমায়া
দিগন্তে যে পড়ে কার ছায়া,
মায়া হরিণীর গতি ক্ষণদীপ্তি নিমেষে মিলায়
সুগন্ধি বিলায়।
নাভি-পদ্ম হতে তার ব্যথা মধুবিষে
যে আনন্দ উচ্ছ্বসি নিমিষে,
ভুবন ভরিয়া তোলে নিত্য নব সৃজন লীলায়,
বসন্তের ঝরাফুল গন্ধ তারি সঙ্গেতে মিলায়।
(বৈশাখ : *দীওয়ান*)

৪. চলে নিত্য সৃজনের লীলা–
অদৃশ্য শিল্পীর তুলি আকাশ করিল স্নিগ্ধ নীলা
শ্যামল করিল তরু, সরসতা দিল তটিনীরে,
সোনার ফসল ফলে মৃত্তিকার বক্ষ ভেদি ধীরে
সে বিরাট মহীরুহ বৃন্তে ধরে ক্ষীণ-আয়ু ফুলে
পেলব সে পুষ্প হতে পরিপূর্ণ রূপ ধরে ফলে
আনে অমৃতের স্বাদ। বুভুক্ষুর মিটাইতে ক্ষুধা
বক্ষের কন্দর ভরি দানিয়াছে তৃপ্তিকর সুধা।
(কালচক্র : *দীওয়ান*)

প্রকৃতির প্রতিটি উপাদান মানবমনের সংরাগে রঞ্জিত করে কবিতায় উপস্থাপন করেছেন সুফিয়া কামাল। ফল-ফুল, শাখা-মূলের মৌন-অভিব্যক্তিতে মানবজীবনকে অনুভব করেছেন তিনি। মূলত মানবজীবনের ভিত্তি হিসেবেই তিনি প্রকৃতিকে বিবেচনা করেছেন। সুফিয়া কামালের প্রেমের কবিতায় প্রকৃতিকে আলাদা করে নেয়া যায় না।

১৯৭০ সালে প্রকাশিত এবং বেগম রোকেয়াকে উৎসর্গীকৃত কাব্যগ্রন্থ *মৃত্তিকার ঘ্রাণ*-এ সুফিয়া কামাল নবতর ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানজনিত দায়িত্ববোধ, বিশ্বজনীন কর্মপ্রবাহ, নেতৃত্বের দায়িত্বভার প্রভৃতির সমন্বয়ে কবিমানস এ-পর্যায়ে নতুন প্রবাহে বেগবান। সে প্রবাহ মূলত মানব কল্যাণমুখী, জনমুখী ও সাংগঠনিক চেতনায় সমৃদ্ধ। তাই তাঁর কবিতায় প্রকৃতি ভিন্নমাত্রায় উদ্ভাসিত। 'তোমাদের সম্মুখে বৈশাখ' 'কর্ণফুলির কল্লোল', 'সিন্ধু', 'হে সাগর', 'আকাশ মৃত্তিকা', 'নববর্ষে', 'প্রথম বর্ষণ', 'আবার বৈশাখ এল', 'হে বৈশাখ', 'অঘ্রাণী সওগাত', 'খুলে দাও দ্বার', 'কুসুমের মাস', 'তবুও বসন্ত এল' প্রভৃতি কবিতায় প্রকৃতির নিঃস্ব সর্বহারা দীনরূপ নয় বরং দৃপ্ত স্বরূপ সুপ্রত্যক্ষ। বৈশাখ নিয়ে রচিত ইতঃপূর্বেকার কবিতার চেয়ে এ কাব্যে রচিত বৈশাখ কবিতাটিতে কবি পূর্বের ন্যায় বৈশাখকে অবসাদ কিংবা হতাশার রূপে নয় বরং বৈশাখের রুদ্র-রুক্ষ রূপকে শক্তির এক প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন :

মদির বসন্ত রাত্রি কেটে যদি গিয়ে থাকে– যাক্।
রুদ্র প্রভঞ্জন নিয়ে তোমাদের সম্মুখে বৈশাখ
ত্বরা নেমে আসে
মমতা-মেদুর ঘন আষাঢ়ের অনন্ত আশ্বাসে।
রুদ্র তেজে খসে যায় বন্ধন শৃঙ্খল
বহ্নি তাপে করে ঝলমল
উজ্জীবিত প্রাণের অঙ্কুর
সে প্রদীপ্ত প্রকাশিত, নহে সে ভঙ্গুর।
(তোমাদের সম্মুখে বৈশাখ : *মৃত্তিকার ঘ্রাণ*)

'সিন্ধু' কবিতায় তিনি প্রকৃতির তীব্র তৃষা, অতৃপ্তির ক্ষুব্ধ ফেনিল শ্বাসকে বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতে যেমন রূপায়িত করেছেন তেমনি আবার 'হে সাগর' কবিতায় সিন্ধুর স্নেহপূর্ণ অবদানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতার সাদৃশ্যে সুফিয়া কামাল সিন্ধুর অতৃপ্ত-বাসনাকে চিহ্নিত করেছেন এবং সে বাসনাকে নিবৃত্ত করার সাধনায় নিরত ধরণীর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন :

অসহায়া ধরণীরে আঘাতে আঘাতে
ঊষর ধূসর করি বালুকা বেলাতে

আছাড়ি আছাড়ি
কী ঐশ্বর্য নিতে চাও, কোন বিত্ত কাড়ি
ভরিবে তোমার চিত্ত ওগো অফুরন্ত বিত্তবান !
হে রাজভিখারি ! কিসে ভরিবে ও প্রাণ ?
মাটির মমতা পুষ্প-সুবাসের ভার
আঁধার শর্বরী ভরি স্নিগ্ধ স্নেহ দিঠি তারকার
ঝাউবন মর্মরিয়া মৃদু সমীরণ
তোমার উত্তপ্ত কায়া করি পরশন
ধরণী ব্যাকুলা অহরহ ;
তথাপি ত তোমার বিরহ
বেদনায় ঘন নীল, দুরন্ত আবেগ
ঘুচাইতে পারে নাই। তার দীর্ঘশ্বাস-বাষ্পমেঘ
অঝোর ধারায় ঝরি বৃষ্টিবিন্দু হয়ে মমতায়
তোমার বেদনা-তপ্ত দেহখানি জুড়াইতে চায়।
পারে নাই। ব্যর্থ তার সাধ,
আর তাই বেদনায় তুমিও উন্মাদ।
(সিন্ধু : *মৃত্তিকার ঘ্রাণ*)

'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রকে ধরণীর মাতারূপে কল্পনা করেছেন। দৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গির ভিন্নতা থাকলেও সুফিয়া কামালের 'হে সাগর' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। সুফিয়া কামাল ধরণীকে মাতা আর সমুদ্রকে কন্যারূপে অভিহিত করেছেন। সমুদ্রের রূপকে সময়-ভিন্নতায় বিভিন্ন চরিত্রে চিত্রিত করে প্রকৃতির অবাধ, অবুঝ ও বৈচিত্র্যময় সত্তাকে নির্ণয় করেন সুফিয়া কামাল :

হে সাগর! দাও দোলা। প্রভাতে আঘাত হানিছ বক্ষে যার
দূরে চলিবার তরে দিগন্তের স্বপ্নে ভোর। মাতা বসুধার
ক্ষীণ তীরবাহু ছাড়ি অসীম অনন্ত শূন্য পানে
ধাইছ ব্যাকুল বেগে উচ্ছ্বসিয়া কল কল গানে।
চঞ্চল দুরন্ত শিশু প্রভাত তপনরশ্মি করে
দিগন্তের পানে ধায় প্রাণরসে আনন্দের ভরে। ....
মধ্যাহ্নে
অতিক্রমি অবহেলে হে চির কিশোর শক্তিমান।
খরতীব্র বেগে চল, লও যেন অমৃত সন্ধান।
নিশীথে
কেন বা গর্জিয়া ওঠো ক্ষুব্ধ রোষে রুদ্ধ অভিমানে
অবোধ শিশুর মতো, ...
তোমার সে দান লভি সৃজনের স্বপ্নে গানে গানে

Dhaka University Institutional Repository

ভঙ্গুর মাটির পাত্রে অমৃত জীবন সাড়া আনে।
(হে সাগর : *মৃত্তিকার ঘ্রাণ*)

সুফিয়া কামালের প্রকৃতি-চেতনা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে মানসিক বৈভব, বিরাগ ও হতাশার ঐক্যসূত্রে। তবে তা স্বাভাবিক ও প্রাণময়। 'ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও রবীন্দ্র-কাব্যের প্রকৃতি-পরিচর্যা দার্শনিকতামণ্ডিত কিন্তু সুফিয়ার প্রকৃতি ...স্বাভাবিক, প্রাণময়, তাঁদের প্রকৃতি অতিপ্রকৃতি না হলেও পরিচর্যায় পরিশীলিত কিন্তু সুফিয়ার প্রকৃতি আপন মূর্তিতে উদ্ভাসিত। ষড়ঋতুচক্রে কবি প্রত্যেক ঋতুর রূপকে জীবনে বরণ করেন।[১] এইরূপে পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ বর্ণকে কবি আকণ্ঠ পান করেছেন। সুফিয়া কামালের প্রকৃতিচেতনা প্রসঙ্গে হাসান হাফিজুর রহমান বলেছেন :

> প্রধানত প্রকৃতির বহিরঙ্গ রূপই বেগম সুফিয়া কামালকে আকর্ষণ করেছে, এক্ষেত্রে তাঁর রচনা বর্ণনাপ্রধান। তবে নিজের ব্যথিত মানসিকতার ছাপ এতেও সংলগ্ন। তাঁর জীবনাশ্রিত কবিতাতেও প্রকৃতির অবলেপ উপমা এবং রূপকের মাধ্যমে এসেছে। কিন্তু বেগম সুফিয়া কামাল জীবনানুভূতির বেলায় যেমন বিশেষ কতিপয় মোটা দাগে উৎসারিত হয়েছেন, প্রকৃতির বেলাতেও তেমনি চোখে দেখা অভিজ্ঞতা এবং প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত ধারণার বাইরে যাননি। 'গ্রীষ্ম' কবিতার নিচের পঙ্‌ক্তিগুলোতে :
>
> আমি গ্রীষ্ম! আসিলাম বসন্তের পরিত্যক্ত পথে
> ধূসর ঊষর, রুক্ষ ! ধূলিম্লান বহুদূর হতে।
> আক্ষেপি' আমার লাগি নাহি কেহ। শিশিরাশ্রু আঁখি
> সিক্ত নব কিশলয়। আমি গ্রীষ্ম পরম একাকী।
>
> এই স্তবকে যতটুকু ব্যাপ্তি আছে তাঁর প্রকৃতিমূলক কবিতার ব্যাপ্তি ঠিক ততটুকু, তার বেশি নয়। ইতোমধ্যে প্রকৃতিচেতনা বাংলা কবিতায় এতখানি পরিণতি লাভ করেছে যে, এখানে নতুন অন্তর্দৃষ্টির উদ্বোধন ঘটাতে না পারলে, গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি পাওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে বেগম সুফিয়া কামাল কখনো সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। সে কারণে প্রকৃতির পারম্পর্যে তিনি সাড়া দিয়েছেন অনেক বেশি, কিন্তু সেই তুলনায় গভীরতা সেখানে অনেক কম।[২]

সমালোচনার ভিন্নতা সত্ত্বেও সুফিয়া কামালের প্রকৃতি-চেতনা সম্পর্কে বলা যায়, প্রকৃতির মাঝেই তিনি বিপন্ন জীবনের আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন আবার প্রকৃতির সান্নিধ্যেই আশান্বিত আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছেন। প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে ঐক্যসূত্র স্থাপন করেছেন তিনি।

---

[১] ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *সুফিয়া কামাল*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৭-১৬৮
[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৮-১৫৯

প্রেম-প্রকৃতি-বিরহের বিষয় ছাড়াও সুফিয়া কামাল অন্যান্য বিষয় নিয়ে কবিতা রচনার করেছেন। তাঁর *প্রশস্তি ও প্রার্থনা* (১৯৬৮) এবং 'অভিযাত্রিক' (১৯৬৯) কাব্যদ্বয় রচিত হয়েছে প্রশস্তিধর্মী ও জাগরণমূলক কবিতা অবলম্বনে। *প্রশস্তি ও প্রার্থনায়* ৩০টি কবিতা এবং 'অভিযাত্রিক'- রয়েছে ৪৫টি কবিতা। এছাড়াও অন্যান্য কাব্যগুলোতেও সুফিয়া কামাল প্রশস্তি ও উৎসাহমূলক কবিতা সংযোজন করেছেন। যেমন : *উদাত্ত পৃথিবীতে* রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে রচনা করেন 'পঁচিশে বৈশাখ' :

গ্রীষ্ম বর্ষায় স্নিগ্ধ শরতে হেমন্তের শীতে যার
বসন্তের ঋতু ভরি দিয়াছ যতেক উপহার
সে সম্পদ অফুরন্ত, সু-সম্পূর্ণ কাল তারে করিবে না ক্ষয়,
হে কবীন্দ্র তোমারই জয় !
হে রাত্রির সভাকবি। দিনের প্রদীপ্ত আলোকর।
আবর্তিত সন্ধ্যার প্রহর
তোমারে লইয়া বক্ষে অসহ সৃজনসুখে কাঁপে
দুরন্ত আনন্দে কাল যাপে
কালের রথের চক্র আবর্তিয়া দিয়ে যায় ডাক
রবীন্দ্রের জন্মতিথি পঁচিশে বৈশাখ।

বেগম রোকেয়াকে নিয়ে লিখেছেন 'আলোর দুহিতা' নামক কবিতা :

চির স্মরণীয়া ! আজিকে তোমার
স্মরণ-তিথির পরম ক্ষণে
বহিয়া এনেছি শ্রদ্ধাভক্তি
ব্যথা-বিজড়িত হৃদয় মনে।
অভাগা এ জাতি, সুপ্ত চেতনে
আজিও তোমার যোগ্যাসন
পারে নাই দিতে, তবুও জানিও
তোমার স্মৃতিরে মহামরণ
মুছিতে পারেনি, পারিবে না কভু
অমর স্মৃতির পদ্মদলে
তুমি ফুটে রবে চিরস্মরণীয়া
যুগান্তরের অশ্রুজলে।
(আলোর দুহিতা : *উদাত্ত পৃথিবী*)

নজরুল ইসলামকে স্মরণ করে নিবেদন করেছেন 'বিষের বাঁশীর কবি' ও 'ঘুমায় সে' কবিতাদ্বয় :

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ গভীর নিশীথে একাকী জাগিয়া কবি,

বিষের বাঁশীতে বাজাইলে তুমি বেদনার ভৈরবী।
সিন্ধু হিলোলে ওঠে আলোড়ন সিন্ধুর বুক চিরি,
ছায়ানটে তব কাঁপে কান্তার মরুদুর্গম গিরি!
মৃত্যু-ক্ষুধার বিষপানে নীলকণ্ঠ সে ব্যথা বিষে
তবু দিলে সুর বেদনা বিধুর হাসি অশ্রুতে মিশে–
তোমার সুরেতে দোলন চাঁপার বুক ভরে পরিমলে,
চক্রবাক যে ভেসে যায় তব আর্ত আঁখি জলে।
(বিষের বাঁশীর কবি : *উদাত্ত পৃথিবী*)

এ কাব্যে কবি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বুদ্ধের প্রতি 'বুদ্ধের তরে' কবিতায়। এছাড়াও জাগরণমূলক কবিতা রচনা করেছেন কবি। যেমন : 'এখন জাগিছে যারা', 'আপন ভাষা', 'শহীদ স্মৃতি', 'অবরুদ্ধাকে', 'জাগো তবে অরণ্যকন্যারা', 'জীবন স্বপ্ন', 'যুদ্ধের তরে', 'রুদ্র জাগো', 'স্বাক্ষর', 'মহাবিশ্বের পথে', 'সর্বকালের রাজা', 'শতাব্দীর শেষে', 'পরশমণি', 'মৃত্যুঞ্জয়ী', 'নবীনসূর্য', 'হে শ্বেত কপোত' ইত্যাদি। এ কাব্যে 'হে অমর প্রাণ' কবিতাটি 'কায়েদে আযম'কে স্মরণ করে রচনা করেন সুফিয়া কামাল। এ কবিতায় নেতার স্তবগান করলেও পরবর্তী পর্যায়ে সুফিয়া কামাল স্বৈরাচারী মনোভাবের জন্য তাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

দীওয়ান কাব্যগ্রন্থে কবি শ্রদ্ধানিবেদন করেছেন জেব্-উন্-নিসা ও আলজিরিয়ার জমীলাকে। তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতা যথাক্রমে 'জেব্-উন্-নিসা' ও 'কারান্তরালে জমীলা'। জেব্-উন্ নিসাকে উদ্দেশ করে কবি লিখেছেন :

তুমি শাহযাদী, হেরেমের পাখী বন্দিনী তব প্রাণের বীণে
গুঞ্জিলে সুরে যে প্রেম-রাগিণী, আজিও সে গানে
তোমারে চিনে ...
মরিলেনা তুমি, হারালেনা সুর, তুমি কবি ! তুমি জেব্-উন্-নিসা।
(জেব্-উন্-নিসা : *দীওয়ান*)

জমীলার জন্য কবির কবিতা :

আলজিরিয়ার জননী ! জমিলা দুলালী দুহিতা মাগো !
কতকাল হলো তন্দ্রাবিহীন নয়নে যে তুমি জাগো! ...
তোমার প্রাণের দীপ্তিতে দীপ জ্বেলেছে আধার রাতে,
আলজিরিয়ার মুক্তি আলোক জ্বেলেছ তোমার হাতে।
বহ্নিশিখার দীপ্ত আলোকে তব নবনীত ভাল
কোটি সূর্যের উদয়ের রঙে হয়েছে যে লালে লাল।
(কারান্তরালে জমীলা : *দীওয়ান*)

প্রশস্তিধর্মী ও প্রেরণামূলক কবিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে 'ভয় কি তোমার শাহারযাদী', 'শুনাও কাহিনী', 'সেই পুরাতন আল্‌ফ লায়লা', 'জেব্‌-উন্‌-নিসা', 'অতুলন', 'আনো বীণা', 'অঙ্গনার অন্য নাম', 'হে বিহগী', 'তাদের স্মরিলাম', 'জ্বালাও আলো', 'ঈগল জেগেছে', 'ঝর্ণারা ! ধারা ঢালো!', 'শতবর্ষ আগে', 'হে মৌন হিমালয়', 'সেই সে গানের পাখি', 'হে শ্বেত কপোত' প্রভৃতি। এসকল কবিতায় মানবকল্যাণের প্রদীপ্ত ভাষণ, প্রশংসাগান, আলোকিত জীবন- চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। কায়েদে আযমকে নিয়ে রচিত 'অবিনশ্বর আত্মার প্রতি' কবিতাটি এ কাব্যের দীর্ঘতম কবিতা।

চলমান জীবনপ্রবাহকে কবি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর কবিতায়। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে উজ্জীবিত করেছেন, অসাম্যের শৃঙ্খলকে উপড়ে ফেলে মহান সাম্যের গান গেয়েছেন। 'হে মৌন হিমালয়' কবিতায় কীর্তিত হয়েছে মৌন-মহান হিমালয়ের মহিমা। ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে মানুষই যে মহৎ ও সর্বপরিচয়ে শ্রেষ্ঠ সে তত্ত্ব প্রচারে প্রয়াসী হয়েছেন কবি। নজরুলের চেতনাবোধে একাত্ম হয়ে সুফিয়া কামালও গেয়েছেন মানবতার গান :

কত অগ্নি ক্ষরাইয়া আজি তুমি মৌন হিমালয়,
ভুলেছ সকল ব্যথা, ক্ষুধা, তৃষা, সকল সংশয়।
তুমি শান্ত মূক গিরি। তুষার কিরীট শোভে শিরে,
অযুত চঞ্চল প্রাণ ঝর্ণাধারা বহে চলে তব দেহ ঘিরে
পাদমূলে হে নগাধিরাজ!
উপেক্ষিত নির্যাতিত মানবের লাগি
যে বিষ-ব্যথায় তব প্রাণ-পাত্র ভরে অনুরাগী !
(হে মৌন হিমালয় : *দীওয়ান*)

'শ্বেত কপোত' কবিতায় শান্তির জন্য কবি আহ্বান করেছেন শ্বেত কপোতকে। এ শ্বেত কপোত কবির মানস-প্রসূত শান্তির প্রতীক :

হে শ্বেত কপোত ! শান্তি কপোত। তোমার ডানায় ভরি
এনেছ শান্তি হানাহানি শেষ করি।

বীরত্বগাথা ও প্রশংসাবাচক কবিতা যেমন : 'অঙ্গনার অন্য নাম', 'শ্রীময়ী শ্রীমতী তারা', 'অনন্যা', 'নারী ও ধরিত্রী', 'লুমুম্বার আফ্রিকা' প্রভৃতিতে নারীর কর্ম, সাফল্য, ত্যাগ ও তিতিক্ষার বাস্তব রূপ চিত্রিত করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত :

শুধুই রমণী নহে, ভগ্নী বধূ মাতা কন্যা রূপে
দিবস শর্বরী আর যুগে যুগে জাগি চুপে চুপে
এ নিখিলে রাখিয়াছে শাকান্নে যে অমৃতের স্বাদ
ক্ষুধিত স্বজন তরে, বিধাতার পরম প্রসাদ ...

তাহাদের তরে
এ মাটি দিয়েছে দান পুষ্পে বাস ফুলে মধু ভরে।
(শ্রীময়ী শ্রীমতী তারা : *দীওয়ান*)

প্রশস্তি ও প্রার্থনা (১৯৬৮) কাব্যগ্রন্থে সুফিয়া কামাল মহামনীষীদের প্রশস্তি গেয়েছেন এবং মুক্তিকামী মানুষের জন্য প্রার্থনা করেছেন। এ কাব্যে পাকিস্তানের শাসক কায়েদে আযমকে নিয়ে দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন। এছাড়াও রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্মরণে রচনা করেছেন 'অনন্যা সে নারী' ও 'আলোর ঝরণা' কবিতা :

নহে হীন, নহে তুচ্ছ নারী, নরসম অধিকার
লভেছে আদেশে বিধাতার।
বঞ্চিত করিয়া তাহা হতে
ভ্রান্তিময় পথে
যাহার তা করেছে হরণ
অর্জিতে তাহারে করি সবাকার তবে প্রাণপণ
আনিয়া দিয়াছে এই আলোকের দূতী।
তাঁহারে প্রণতি
জানাতে অন্তর ওঠে ভরি
নিত্য তাই শ্রদ্ধা ভরে অনন্যারে স্মরি।
(অনন্যা সে নারী : *প্রশস্তি ও প্রার্থনা*)

শের-ই বাংলা ফজলুল হক, ড. স্যার এ. এফ. রহমান. ড. মুহম্মদ শহীদুলাহ, আজম খান, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জন. এফ. কেনেডি, ইসমাইল হোসেন শিরাজি, মহাকবি শেক্সপিয়র, মহাকবি ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে কবিতা রচনা করেছেন সুফিয়া কামাল। এ কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'ধরণীর অমৃত সন্তান' রূপে অভিহিত করেছেন তিনি। নজরুল ইসলামকে তিনি বলেছেন, 'হাস্নাহেনার কবি'। 'এ দিনের প্রার্থনা', 'অনেক অনেক কথা', 'শাহীন', এনেছে জীবন', 'অরণ্যের জাগরণ', 'আমার পতাকা', 'যুগ মানবেরা', 'দুঃসহরে সহিছে আশায়', 'শপথ' প্রভৃতি কবিতায় ব্রিটিশ শাসনের অবসান, পাকিস্তানি শাসনের আগমন বার্তা, পাকিস্তানি পীড়ন, মুক্তিকামী মানুষের স্বাধীনতার প্রত্যাশা প্রতিফলিত হয়েছে। 'ধরণীর অমৃত সন্তান'কে উদ্দেশ্য করে কবির নিবেদিত চরণে প্রকাশ পেয়েছে কালোত্তীর্ণ কবির মহিমা :

শতাব্দীর কালস্রোতে তরঙ্গের প্রবাহে তব নাম
ধ্বনিয়া উঠিছে অবিরাম,
কালজয়ী তুমি কবি। এ ধরার অমৃত দুলাল।

তোমারে লইয়া মহাকাল
শত শতাব্দীর পরে চাহিয়া রহিবে নির্নিমেষ,
প্রত্যহ হেরিবে নব বেশে
যুগে যুগে কালে কালে শতাব্দীর পটভূমিকায়
সর্বদেশ গুণী-সুধীজনে তোমা প্রণতি জানায়।
ধরণীর অমৃত সন্তান।

এ কাব্যে পাকিস্তানের বন্দনাগীত গাওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি কবিতায়। প্রার্থনা করেছেন কবি পাকিস্তানের জন্যঃ

যুগ-যুগান্ত জগদ্দলের করেছে অপসারণ।
বন্ধ গুহার অন্ধকারেরে করি দিয়াছিল নাশ।
মুক্ত আলোকে মুক্ত বাতাসে লভিয়াছে নিঃশ্বাস।
যারা ছিল এর অগ্রনায়ক দিশারী আলোক জ্বালি
পথের বাধারে ধূয়ে দিয়ে গেছে জিগরের খুন ঢালি
তাহাদেরে স্মরি প্রার্থনা করি, এস প্রার্থনা করি;
এই পাকভূমি যেন তাহাদের পুণ্যেই থাকে ভরি।
আর মোরা সেই পুণ্য-প্রবাহে করিয়া অবগাহন
মুক্ত আযাদ রাখিতে ইহারে করি যেন প্রাণপণ।

(এদিনের প্রার্থনা : *প্রশস্তি ও প্রার্থনা*)

একই মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয় *অভিযাত্রিক* (১৯৬৯) কাব্যগ্রন্থে। 'আমার দেশ' কবিতায় পাকিস্তানের মাহাত্ম্যকথন বর্ণিত হলেও 'বাহান্ন থেকে চৌষট্টির পরিক্রমা' কবিতায় কবির স্বদেশ চেতনা, পাকিস্তানের স্বৈরাচারী মনোভাব ও অচেতন জাতি হিসেবে বাঙালির উদাসীনতার ইঙ্গিত জোরালো ও যুক্তিযুক্ত ভাষায় উচ্চকিত হয়েছে। সুফিয়া কামালের চেতনাপ্রবাহে পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। যার ফলে তাঁর কাব্যপ্রবাহেও সেই পরিবর্তনের ছাপ লক্ষণীয়। মহান পাকিস্তানের স্তবগান লিখেছেন যে লেখনিতে, সে লেখনিই সময়-বৈরিতায় বিপরীতমুখী হয়েছে। তারই স্বাক্ষর বহন করে 'অভিযাত্রিক' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা। একটি দৃষ্টান্ত :

শহীদ মিনার হয়নি ত, পাঁচ কঙ্কাল খাড়া হলো,
দেখে হবে মন বেদনা আতুর, চোখ হবে ছলোছলো।
রাস্তায় যেতে ধাঁধাঁ লাগে, কোথা যে এলাম পড়ে না মনে,
ফুলার রোড-এর মাথায় এসেছি? এসেছি কি লন্ডনে ?
ইংলিশ রোড মুখ ভ্যাঙ্গচায়? বাঙালী রোড কই ?

বাংলা দেশেতে কখনও আমরা প্রধান হলাম কই?
'বেলি' মিন্টোর পাশ দিয়ে যেতে মনে হয় রাজধানী,
বেগম রোকেয়া তোমারে হেরিয়া টেনেছে ঘোমটাখনি! ....
কিছু সন্দেহ, তবু মনে জাগে আশা :
বাংলা দেশের মেয়েরা বাঁচবে বাংলা দেশের ভাষা। ...
বাঙ্গাল লোক এ ভাষা জানে না– এই তার অপরাধ,
বাংলার বাঘ ঘুমায়ে রয়েছে ঘোড়দৌড় ময়দানে,
ঘোড়ার খুরের দাপটে সে আর কী ই বা শুনিবে কানে ?
কে বা আর এত ঘামাইবে মাথা? যা আছে তাইত ভালো,
ঢাকা ক্লাব-এর ভিতরে বাহিরে জ্বলুক জোরালো আলো।
(বাহান্ন থেকে চৌষট্টি পরিক্রমা : *অভিযাত্রিক*)

অভিযাত্রিক কাব্যগ্রন্থে জাগরণমূলক কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিতা– 'অভিযাত্রিক', 'জাগৃতি', 'পণ', 'আবার শপথ লই', 'নতুন দিনের সূর্য', 'ভুলি নাই', 'ঝাণ্ডা উড়িছে নভে', 'আমার দেশ', 'নববারতা', 'এই দিনে', 'শহীদ রক্তের ঋণ', 'অমৃত স্মৃতি', 'এমন আশ্চর্য এই দিন', 'বাহান্ন থেকে চৌষট্টির পরিক্রমা', 'পথ নহে অন্তহীন', 'কালের যাত্রার ধ্বক্ষনি', 'হে মানুষ!', 'জেগে ওঠো', 'অমৃত কন্যা', 'তপস্যা কেটেছে', 'শেষের প্রার্থনা' প্রভৃতি। সুফিয়া কামাল ধ্বংসের অবসানে নতুনকে সৃজনের স্বপ্নে আশাবাদী; নজরুলের মতোই দীপ্ত-প্রত্যাশা উচ্চারিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। এ কাব্যের কবিতাসমূহে ইতিহাস ঐতিহ্য সংগ্রামী মানুষ, মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ, জাগ্রত সত্তার কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন কবি। উদাহরণ :

১. কারুনের কাল কেটে যদি যায় আবার আসিবে হাতেম তাঈ,
নওশেরাওয়াঁর ইনসাফ নিয়ে আসিবে কি দিন? বলে সবাই।
খলিফা ওমর আবার জাগুন, ঘরে ঘরে সব মুসলমান
কম্বল শুধু সম্বল রাখি আবুবকরের মতন দান
করুক আবার দরাজ দস্তে, আজিকার দিনে এই শপথ
নিক দিলীরেরা। হাসিয়া উঠুক রক্তে রাঙান এ রাজপথ।
(এই শপথ : *অভিযাত্রিক*)

২. কাল কভু চুপ নহি রয়
কথা কয়, সে যে কথা কয়।
তারও পরে আসে সেই দিন
মৃতের কঙ্কাল পরে জেগে ওঠে জীবন নবীন।
(কালের যাত্রার ধ্বনি : *অভিযাত্রিক*)

৩. আমার দেশের তাঁতি চাষী আর
কামার কুমার জেলে

আবার নতুন মাটিতে দাঁড়ায়
বাধার পাহাড় ঠেলে।
(নতুন সূর্য গগনে উঠেছে : *অভিযাত্রিক*)

স্বজাতির স্বার্থ এবং স্বাদেশিক-চেতনাস্রোত কবিকে উজ্জীবিত করেছে স্বৈরাচারী শাসকের বিরোধিতা করতে। *মোর যাদুদের সমাধি* পরে (১৯৭২) কাব্যগ্রন্থের ৩২ টি কবিতার অধিকাংশই সংগ্রামী যোদ্ধা ও শহীদদের প্রতি উৎসাহমূলক জয়গানের স্বাক্ষর। কবিতাগুলো কবি রচনা করেন ২৪-০১-১৯৭১ থেকে ২৬-০২-১৯৭২ সালের মধ্যে। প্রতিটি কবিতার পরিশেষে তারিখ লিপিবদ্ধ করেছেন কবি। যেমন 'উনসত্তুরের এই দিনে' কবিতাটি কবি রচনা করেন ২৪-০১-১৯৭১ তারিখে। এ কাব্যে মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রণতি জানিয়ে ১৮-০৩-১৯৭১ তারিখে রচনা করেন 'মুজিবের জন্মদিনে' কবিতা। কবিতাটিতে মুজিবকে কবি 'নও-বেলাল' সম্বোধন করে ইতিহাসের নব-মানুষের সাথে উপমিত করেছেন :

তব জন্মক্ষণ
একক তোমার নহে। নিপীড়িত লক্ষ জনগণ
নবজন্ম লভি চেতনার
তোমারে লভিয়া কাছে হয়েছে দুর্বার।
দুর্যোগের রাত্রিভোরে সর্বহারা প্রাণ
শুনি নও-বেলাল আজান
দাঁড়ায়েছে আসি ময়দানে
তোমার আহ্বান তারা শুনিয়াছে কানে।
প্রাণে প্রাণে জাগিয়াছে সাড়া
সম্মুখে তোমারে রাখি ঊর্ধ্বে হাত তুলিয়াছে তারা।

সুফিয়া কামালের মানস-ভাবনা আবর্তিত হয়েছে পারিবারিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ঘটনাচক্রে। সমকালে তিনি নিরীক্ষণ করেছেন পরিপার্শ্ব ও বহির্বিশ্বের ঘটনাস্রোত। ৭১-এর উত্তাল-আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের বিধ্বংসী রূপ, বিজয়ের উচ্ছ্বাসকে তিনি ছন্দোবদ্ধ করেছেন কবিতার কথামালায়, এ প্রসঙ্গে কবিপুত্র সাজেদ কামালের যুক্তিযুক্ত নিরীক্ষণ উল্লেখযোগ্য :

> তাঁর কবিতায় তিনি তাঁর জীবন যাপনের বাঁকে বাঁকে যে সংগ্রাম করে গেছেন–নারী, স্ত্রী, অথবা মা হিসেবে, সমাজকর্মী, শিক্ষাদাতা অথবা সংস্কারক হিসেবে আমরা তাই চিত্রিত হতে দেখি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর চিন্তার ব্যাপকতা, যার পরিচয় তিনি তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু নির্বাচনে রাখতে পেরেছেন। এবং যে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি সেই চিন্তা, উৎকণ্ঠা, চেতনাকে তুলে ধরেছেন তাই তাঁর কবিতাকে এক আন্তর্জাতিক ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করে তুলেছে। তাঁর জীবনের প্রতিচ্ছবি স্বরূপ তাঁর কবিতায়ও আপন অভিজ্ঞতার সচল প্রকাশ স্পষ্ট। রোমান্টিক, বালিকাসুলভ, পার্থিব প্রেম যেমন তাঁর

> অনেক কবিতারই উপজীব্য বিষয়, যে কোন রকমের অন্যায় এবং উৎপীড়ন-নিপীড়নের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার।... যুক্তরাষ্ট্রের হেমন্তের রক্তিম পাতাঝরা, মস্কো শহরে বসন্তের গোলাপী আভা, বাংলাদেশের নতুন ঋতুর শুরুতে নতুন পাতা, ফুল আর বিভিন্ন পাখির কলতান সব কিছুই যেন তার চোখে জীবনের উৎসবের ঐকতান স্বরূপ। ঢাকা শহরের নিঃস্ব ভিক্ষুক আর বস্টন শহরের গৃহহীনের প্রতি তাঁর একই মমত্ববোধ। ঠিক যেভাবে তিনি 'আরব্য রজনী'র সুলতানের অত্যাচারকে চিহ্নিত করে তার প্রতিবাদ করতে সক্ষম, সেভাবেই তিনি আধুনিক শিল্পভিত্তিক রাষ্ট্রের উৎপীড়নের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারেন। যুদ্ধ, পরিবেশ ধ্বংস, পারমাণবিক হত্যাযজ্ঞ ইত্যাদি বিষয়গুলোর মুখোমুখি দাঁড়াতে তিনি ভীত হন না এবং একই সাথে তিনি স্থিরতা, জীবনকে বাঁচিয়ে রাখা, আর শান্তির জন্য নিরলস আবেদনরত। এই বৈশ্বিক কালোত্তীর্ণ বিষয়-সচেতনতাই তাঁর কবিতাকে ভৌগোলিক সীমা অতিক্রমণে সহায়তা করেছেন। তাঁর কবিতার এই বিশেষ গুণাবলিই– যা তাঁর কাব্যে অনুভূত এবং প্রকাশিত বর্তমানের প্রেক্ষিতে রচিত কিন্তু সময়ের তাৎক্ষণিক সীমাকে অতিক্রম করে যায়। তাঁর পর্যায়ের অন্যান্য কবির মত তাঁর কবিতাকেও 'ঐতিহাসিক', 'আধুনিক' এমন কি 'আধুনিকোত্তর' এই সমস্ত বিশেষণের অনেক ঊর্ধ্বে স্থান করে দিয়েছে।[১]

মোর যাদুদের সমাধি পরে কাব্যগ্রন্থের দেশাত্মবোধ কবিতায় দেশমাতার প্রতি ভালোবাসা, শহীদ যোদ্ধাদের স্মরণ-বন্দনা ছাড়াও বেশ কয়েকটি কবিতা নিবেদিত করেছেন মহান-ব্যক্তিত্বের উদ্দেশ্যে। সাজেদ কামালের কথাসূত্রেই বলা যায়, কবি বর্তমানকে নিয়ে লিখলেও তা কালোত্তীর্ণতায় পর্যবসিত। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল স্মরণে নিবেদিত পঙ্‌ক্তিমালা কালের প্রবাহে আজও উজ্জ্বল ও অম্লান। 'পঁচিশে বৈশাখ', 'এগারোই জ্যৈষ্ঠ', 'শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে', 'কবি মেহেরুন্নেসা স্মরণে', প্রভৃতি কবিতায় মানবতা, মনুষ্যত্বের জয়গান গেয়েছেন কবি। ৭১-এ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে কবি লিখেছেন :

> নিবিড় তামসী রাত্রি আজি যদি হলো অবসান
> হে শক্তি-স্বরূপ নারী ! এ তোমার দান।
> শক্তিমতি সাহসিকা হে অতুলনীয়া!
> আপনার মহিমায় নিজে তুমি আছ উদ্ভাসিয়া।
> সমগ্র বিশ্বের নেত্র আজি কেন্দ্রীভূত,
> অপূর্ব অদ্ভুত !
> তোমার ও কম্বুকণ্ঠে মেঘমন্দ্র বাণী
> তিমির বিদারি দিল আনি
> নবীন জীবন।
> (শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে : *মোর যাদুদের সমাধি পরে*)

[১] *সুফিয়া কামাল রচনা সমগ্রহ : প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫-১৬

দেশের স্বাধীনতায় নারীর অবদান, নারীর সচেতনতাকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন কবি। তাঁর কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে সেদিনের সেই সাহসী নারীদের কথা। নারীর অমিত শক্তির অগ্রগণ্য ভূমিকাকে লিপিবদ্ধ করেছেন কবি বাস্তবতার নিরিখে :

বেণীবিন্যাস সময় তো আর নেই,
শাড়ীতে শোভন পাড় আছে-কি– নেই
ললাটে তিলক, নয়নে কাজল, অধর রাঙাবার বেলা।
নেই আর নেই। এবার চলছে জীবন-মরণ খেলা। ...
নারীর সলাজ কোমল পেলবতা আজকে নেই,
যত প্রিয়জন স্বজন সাথীরে হারানো দুঃখের শোধ নেবেই।
ক্ষীণ কটি আর বক্ষে বহিছে সিংহ তেজ
অমিত শক্তি ধরে সাহসিকা, কণ্ঠেও তার নেই আমেজ
প্রণয়-গীতির। দেশ মাতৃকা জনগণ জয়–
জয় জয় যত মুক্তিসেনা।
শহীদ শোণিতে রাঙায়ে আঁচল নারীরা শোধিছে মাটির দেনা।

(বেণীবিন্যাস সময় তো আর নেই : *মোর যাদুদের সমাধি পরে*)

মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মদান 'জননী সাহসিকা' সুফিয়া কামালকে বেদনায় নিমজ্জিত করেছে। দেশাত্মবোধীদের অবদানে কবি আনন্দে-অভিভূত, সে সাথে শোকে আচ্ছন্ন। প্রত্যক্ষদর্শী কবি যুদ্ধের ভয়াবহতার পাশাপাশি তরুণ সন্তানদের অংশগ্রহণকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জনিয়ে রচনা করেন 'মোর যাদুদের সমাধি পরে' কবিতাটি। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরবর্তী পর্যায়ে তিনি কবিতাটি রচনা করেন; রচনাকাল ২৭-১২-১৯৭১ । কবিতাটি নিম্নরূপ :

এই পৌষের শীত জর্জর রাত কাটে, আজ শিশির ঝরে
মোর যাদুদের সমাধি পরে।
মায়ের চোখের বোনের চোখের বধূর চোখের মতন তারা
মাটিতে চাহিয়া আত্মহারা।
ন'মাস কেটেছে এদেশের মাটি তাজা তাজা খুনে সিক্ত হয়ে
উর্বর হয়ে এসেছে লয়ে
মওসুমী ফুল ধানের গন্ধ মিঠা সোনা রোদ বাংলাদেশে–
যাদুরা আমার সেই আবেশে
ঘুমায়ে পড়েছে আহা! ক্লান্তিতে। থাক ভাঙ্গাবো না ওদের ঘুম।
মাটির উপরে রাখিয়া চুম্
দিলাম তোমারে। সোনারা আমার। ঘাসের উপরে বুলালে হাত
মনে হয় যেন অকস্মাৎ
হাতখানি ধরে তোরা কথা ক'স হাসিহাসি মাখা হাজারো মুখ :
"স্বাধীন করেছি বাংলাদেশেরে, গর্বে মা তোর ভরেনি বুক ?"

ওরে দামালেরা ! ওরে দুলালেরা! বাংলা মায়ের আসন আজ
উজ্জ্বল করি বিশ্ব মাঝ
পাতিলি আপন বুকের রক্ত চুণিতে করিয়া লালে লাল,
যুগে যুগান্তে সে মহাকাল
সম্ভ্রম ভরে হেরিবে দাঁড়ায়ে মহাবিশ্বের এ বিস্ময়।
মানিকেরা ! তোরা মৃত্যুঞ্জয়!

(মোর যাদুদের সমাধি পরে : *মোর যাদুদের সমাধি পরে*)

দেশমাতার সন্তানদের আত্মত্যাগের মহান স্বীকৃতি তাঁর এই কবিতায় উল্লেখিত হয়েছে। 'জননী সাহসিকা' সুফিয়া কামাল সম্পর্কে রোকনুজ্জামান খানের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য :

> অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক, বাঙালিত্বের মহিমায় উদ্ভাসিত মহীয়সী নারী সুফিয়া কামাল। কোমলে-কঠোরে যার অন্তর ছিল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। একটি শিশুকে আদর করার সময় তার মুখ থেকে যেমন স্নেহপ্রীতির ফল্গুধারা ঝরে পড়তো, আবার যেখানে ছিল আদর্শের সংঘাত, সেখানে ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা উপচে পড়তো তাঁর বক্তব্য থেকে। ... আদর্শের কাছে, নীতির কাছে এত কঠোর যে নারী, একটি শিশুর কাছে তিনি একজন স্নেহবৎসল মমতাময়ী মা। আমরা সবাই জানি মহিলাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রেরণাদাত্রী ছিলেন সুফিয়া কামাল। কিন্তু শিশু আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাঁর ছিল বিরাট অবদান। এ দেশে ঐতিহ্যবাহী জাতীয় শিশু আন্দোলন 'কচি-কাঁচার মেলা' প্রতিষ্ঠার প্রথম সভাটি হয় তাঁরই বাসভবন প্রাঙ্গণে। ... জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত তিনি এই শিশু সংগঠনটিকে মাতৃস্নেহে আগলে রেখেছিলেন। মা-পাখির মতো উষ্ণ ওম দিয়ে তিনি লালন করেছেন এ দেশের শিশুদের। ... সুফিয়া কামাল নিজেকে পরিণত করেছিলেন মমতাময়ী, স্নেহময়ী মাতৃরূপে। বাঙালি মা হিসেবে। এ মা এদেশের প্রতিটি শিশুর মা। প্রতিটি কিশোরের মা, প্রতিটি তরুণ এবং প্রতিটি পরিপূর্ণ বাঙালির মা।[১]

বাংলার দামাল ছেলেদের পাশাপাশি 'রাত জাগা পাখি' সম দামাল মেয়েদের স্মরণে ছন্দোবদ্ধ বাণী রচনা করেন সুফিয়া কামাল। বদর বাহিনীর হস্তে নিহত শিলালিপি-সম্পাদক সেলিনা পারভীন বানুকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে কবি লেখেন 'শিলালিপি অক্ষয়' কবিতাটি, ১২-১২-১৯৭১ তারিখে :

শিলালিপি অক্ষয়
কালের বক্ষে লিখে গেল তার জীবনের পরিচয়
বাংলাদেশের দুলালী দুহিতা রাতজাগা পাখী তার
নিঃসীম নীল নভে করেছিল পাখা দুটি বিস্তার।
স্বপ্ন ছিল সে চোখে
এ মাটিরে ভালোবেসেছিল– তাই চেয়েছিল সে আলোকে

[১] রোকনুজ্জামান খান, সুফিয়া কামাল : প্রতিটি পরিপূর্ণ বাঙালির মা, উদ্ধৃত, সৈয়দ শামসুল হক(সম্পা.), *জননী সাহসিকা : বেগম সুফিয়া কামাল শেষ প্রণতি*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৭-৩৮

এ মাটির ঘর উজলি তুলিবে জ্বালিয়া প্রাণের শিখা,
দস্যুদানব নির্মম হাতে মুছে দিল সেই লিখা।
তবুও জননী অয়ি !
শিলালিপি'পরি তব নাম লিখা হয়ে রবে কালজয়ী।
(শিলালিপি অক্ষয় : *মোর যাদুদের সমাধি পরে*)

এ কাব্যের কয়েকটি কবিতায় ঘৃণ্য বদর বাহিনীর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন কবি। এদেরকে তিনি হিংস্র জন্তু, শ্বাপদ, অরণ্য অসুর, রক্তমাংসলোভী, মরুভূমি গোবী, কুটিল মাংসাশীসম মানুষ রূপে অভিহিত করেছেন 'আমরা আদিম অধিবাসী' নামক কবিতায় :

বীভৎস হননতৃষ্ণা লয়ে ওরা ফিরে
কুটিল মাংসাশীসম মানুষেরে ঘিরে
রক্তলোভী ঘৃণ্য হিংসাতুর
জঘন্য পাশবমনা অরণ্য অসুর
রক্তমাংস লোভী
শ্যাম জনপদে করে অগ্নিদগ্ধ মরুভূমি গোবী।
জননী সন্তানহীনা স্বামীহীনা, পুত্রহীন পিতা।
অগ্নির সংযোগে করি শান্ত নীড়ে লেলিহান চিতা
হেরে ওরা হাসে
নিষ্ঠুর হৃদয়হীন পাশব উল্লাসে।
(আমরা আদিম অধিবাসী : *মোর যাদুদের সমাধি পরে*)

৭১-এর বৈরী সময়ে কবি স্মরণ করেছেন হযরত মোহাম্মদ (সা.) কে, স্মরণ করেছেন মানবমুক্তির প্রেরণাদাতা রবীন্দ্রনাথ, নজরুলকে :

১. আমার রসূল ! আজ হেরি জ্বলে বিভেদ অগ্নিশিখা
মুসলমানের ললাটে আঁকিছে দাসত্ব কালো টিকা
নত করি আনি শির
পরাইতে চাহে অসুর দাপটে হাতে পায়ে জিঞ্জির।
ওরা কি মুসলমান ?
তোমার ঝাণ্ডা কলঙ্ক কালি মেখে হয়ে যায় ম্লান
ওদের কলুষ করে–
আমার রাসূল ! হে নবী! পাঠাও মানুষে মানুষ করে।
(আমার রাসূল : ফাতেহা-ই-দোয়জদহম : *মোর যাদুদের সমাধি পরে*)

রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে সান্ত্বনায় তৃপ্ত হতে চেয়েছেন কবি :

হে কবি তোমার জন্মের ক্ষণে এ পঁচিশে বৈশাখে।
আজ বাংলার ঘন দুর্দিন, আকাশে বাতাসে ব্যথা

এই বাংলার মানুষ আজিকে কহিতে পারে না কথা,
গাহিতে পারে না গান।
না বলা কথার ব্যথার পাত্র ভরিয়া করিছে দান
তবুও তোমারে স্মরণ করিয়া বাংলার গৃহকোণে
তোমারে রচিত তব বন্দনা– সব মানুষেরা শোনে।
(পঁচিশে বৈশাখ : *মোর যাদুদের সমাধি পরে*)

'ঊনসত্তুরের এই দিনে', 'নীরবে চলেছে', 'আজো ডাকে', 'বাতাসে বারুদ', 'তাদের সে রক্তিম শপথ', 'আজ এই দিন', 'কান্না নয়', 'রক্তের আলেখ্য', 'মিছিল সারি সারি', 'শিশির ভেজানো পথ', 'মরণ ভয়কে জয় করেছে', 'উদাত্ত বাংলা', 'একত্রিশে চৈত্র ১৩৭৭', 'বৈশাখ ১৩৭৮', 'হে রুদ্র', 'আমরা নেমেছি সংগ্রামে', 'এ আমার দেশ', 'এই ফাল্গুন মাস'– প্রভৃতি কবিতায় মাতৃভূমিপ্রীতি, স্বাদেশিক চেতনা, অগ্নিঝরা সংগ্রাম, মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান, শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রভৃতি বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। এই কবিতাগুলো নির্মাণের নেপথ্যে ক্রিয়াশীল সুফিয়া কামালের সাহসিকতা, দেশপ্রীতি, মুক্তির উচ্ছ্বাস এবং সর্বোপরি দেশপ্রেমিকের নিঃস্বার্থ অনভূতি। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য আলোচনাযোগ্য :

> দেশপ্রেমিক অকুতোভয় সুফিয়া কামালের মানসিক সাহসের সর্বোচ্চ পরিচয় মেলে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সচেতনভাবে দেশের ভেতরে অবস্থান করে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে শক্তি-সাহস এমনকি রসদ জোগানোর দায়িত্বও পালন করেছেন তিনি। অনেকে তাঁর মৃত্যুর শঙ্কা প্রকাশ করে তাঁকে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলে তিনি বলতেন, 'আমি চলে গেলে হায়নার দল আরো ক্ষিপ্ত হবে, আরো বেশি অত্যাচার করবে।' শহীদুল্লা কায়সারসহ মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের অনেকে শেষ মুহূর্তে তাঁকে দেশের বাইরে চলে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলে তিনি রাজি হননি বরং শহীদুল্ল কায়সারকে নিরাপদে থাকতে অথবা বাইরে যেতে পরামর্শ দেন।
>
> তাঁর বাড়ির সামনে দূরবীণ নিয়ে সারাক্ষণ পাকিস্তানী মিলিটারীর অবস্থান, তাঁর বাসায় কারা আসা-যাওয়া করে তাঁর খোঁজখবর রাখার, এমনকি আগত রিক্সার নম্বর টুকে রাখার ঘটনায় সহজেই অনুমান করা যায় কি অবস্থায় ধানমন্ডির ঐ বাসায় তিনি অবস্থান করেছিলেন নজরবন্দির মতো। এমতাবস্থায় ঢাকাস্থ সোভিয়েত দূতাবাস থেকে রাষ্ট্রদূত মিঃ নভিকভ্ সুফিয়া কামালের বাসায় এসে তাঁকে বুঝালেন– তাঁর জীবন বিপন্ন, তিনি যেন নিরাপদে বাইরে চলে যান, তিনি সম্মতি দিলে সোভিয়েত সরকার চার্টার প্লেনে তাকে মস্কো নিয়ে যেতে চান। এর উত্তরে সুফিয়া কামালের যে উক্তি তাতে অকুতোভয় দেশপ্রেমিক সুফিয়া কামালের কল্পনাতীত সম্পূর্ণ এক নতুন পরিচয় আমাদের সামনে ভেসে ওঠে– 'এখন আমি এ দেশ ছেড়ে বেহেশতেও যেতে রাজি নই। আমার দেশ, আমার দেশের মানুষেরা শান্তি পাক, সোয়াস্তি লাভ করুক– এ দেখে যেন আমি এই মাটিতেই শুয়ে থাকতে পারি।[১]

[১] ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *সুফিয়া কামাল*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৩৮.

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার সার্থক রূপায়ণ 'মোর যাদুদের সমাধি পরে' কাব্যগ্রন্থটি। এ কাব্যের শেষ কবিতায় 'এই ফাল্গুন মাস'-এ এদেশের মানুষের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থার প্রকাশ লক্ষণীয় :

বাংলার ছেলে বাংলার মেয়ে বাংলার নেতা ধীর
বুক পেতে নেয় কঠোর আঘাত– নোয়ায় না কভু শির।'
(এই ফাল্গুন মাস : *মোর যাদুদের সমাধি পরে*)

জীবনবোধের গভীরতার ছাপ তাঁর কবিতায় সুস্পষ্ট :

আজিকার প্রভাত-আলোক
পাবিয়া দিয়াছে অন্ধ অন্তর দ্যুলোক।
টুটিয়াছে অন্ধকার কারা,
দেখি সর্বহারা
অন্তর ক্রন্দসী মোর কাঁদে একাকিনী–
জন্ম জন্ম যুগ যুগ চির বিরহিনী।
(সান্ত্বনা কোথায় : *মৃত্তিকার ঘ্রাণ*)

প্রকৃতির আশ্রয়ে তাঁর কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে গভীর দুঃখবোধকে জয় করে নতুন আলোয় বেঁচে থাকার প্রেরণা। জীবনের গভীর-সত্য উদঘটিত হয়েছে কবিতায় :

আকণ্ঠ মরুর তৃষা লয়ে
এই মন ভরে ওঠে বিষাক্ত বিষাদে দীর্ণ হয়ে।
আবার লুটিয়া পড়ে টুটাইয়া ক্লান্তির কালিমা
তটে তটে বিথারিয়া যায় মধুরিমা।
আবার এ মন
সিন্ধু সম বহে, করে চির সুন্দরের অন্বেষণ!
লক্ষ নক্ষত্রের দীপ্তি, কোটি চন্দ্র, অযুত সূর্যের ছায়া পড়ে
প্রীতিতে সুস্নিগ্ধ হয়ে আবার সম্ভাব্যে এই মন ওঠে ভরে।
(মোর মন : *মৃত্তিকার ঘ্রাণ*)

বৈধব্যা-যন্ত্রণাপীড়িত সুফিয়া কামাল শ্বশুরালয়ে কীরূপ দুঃসহ বৈরী জীবনপাত করেছেন তার স্বাক্ষরবাহী *সাঁঝেরমায়ার* কবিতা 'পুরানো দিনের স্মৃতি'। সে সময় জীবনের বীভৎস রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি :

এই বালুচরে হারায়ে গিয়াছে সুরবাঁধা মোর বাঁশী,
"কালা বদরে'র কালো ঢেউয়ে ধুয়ে নিয়ে গেছে মোর হাসি।
এই কালো মুখ দেখিতে তো আর চাহে না কো কেহ হেসে–
সেই যারা ছিল চুমিত আমায় ক্ষণে ক্ষণে ভালোবেসে।

এই মুখে আজ কি যে নাই– তাই তাহারা ফিরায় মুখ
আমিই তা জানি আর বেদনায় টন টন করে বুক।
আমারই গেল সব হাসিখুশী–আমারই তো গেল সব,
আমারেই ওরা 'দূর ছাই' করে 'অপয়া' 'অপয়া' রব।
একদিন ছিল আমারি আসন সকল সুখের কাজে,
কল্যাণময়ী লক্ষ্মীর ছায়া ছিল আমারই মাঝে।
আজিকে তারাই অকল্যাণের ভয়ে দূরে রাখে মোরে,
তাহারা সকলে আমারে হেরিয়া নিঃশ্বাস ফেলে জোরে।
আঘাত বেদনা সহিবারে পারি, সহেনাকো এই মায়া,
হে মরণ-বঁধু! কোথা কতদূরে – লুকাও আমার কায়া।

সুফিয়া কামালকে একজন 'জীবনশীল কবি' হিসেবে অভিহিত করেছেন হাসান হাফিজুর রহমান। একজন জীবনশীল কবি জীবনবোধের গভীরতার লক্ষযোগ্য প্রমাণ তাঁর কবিতায় উপস্থাপন করবেন এমনটিই স্বাভাবিক। সুফিয়া কামাল 'সাঁঝের মায়া' কবিতাটিতে জীবনের তাৎপর্যকে গভীরভাবে অনুধাবন করে একে সার্থক ও সুন্দর করার প্রয়াস ব্যক্ত করেছেন :

দূর হতে শুধু বারে বারে
একান্ত এ মিনতি জানায় :
কখনও ডাকিয়ো তারে তোমার এ শেষের সভায়!
সাঙ্গ হলে সব কর্ম, কোলাহল হলে অবসান,
দীপ-নাহি-জ্বালা গৃহে এমনি সন্ধ্যায় যেন তোমার আহ্বান
গোধূলি-লিপিতে আসে। নিঃশব্দ নীরব গানে গানে,
পূরবীর সুরে সুরে, অনুভবি তারে প্রাণে প্রাণে
মুক্তি লভে বন্দী আত্মা-সুন্দরের স্বপ্নে, আয়োজনে,
নিঃশ্বাস নিঃশেষ হোক পুষ্প-বিকাশের প্রয়োজনে।
(সাঁঝের মায়া : *সাঁঝের মায়া*)

সাহিত্যকমাত্রই সময় ও সমাজকে তাঁর সাহিত্যকর্মে ধারণ করেন। সুফিয়া কামালের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি, পরিবর্তিত সমাজের ছাপ তার সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে বার বার। পাকিস্তানের স্তুতি বা বন্দনা গান যেমন করেছেন তেমনি পাকিস্তানি শাসনের স্বৈরাচারী মনোভাব বুঝতে পেরে এর বিরুদ্ধাচারণ করতেও তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। সে কথা তাঁর বক্তব্যে, ডায়রিতে, কবিতায় সোচ্চারে ধ্বনিত হয়েছে। এমনকি এর জন্য তাঁকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের কোপানলে পতিত হতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সুফিয়া কামালের ভাষ্য :

১. পাকিস্তানকে আদর্শ ভেবেছিলাম। কিন্তু পরে তো কবিতা লিখেছি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে। কিন্তু ভাষার উপরে যখন আঘাত আসলো তখন তো জিন্নাহর পক্ষে থাকিনি, প্রতিবাদ করেছি।[১]

২. আমার ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন সময়ে সরকারের কোপে পড়েছে। সরকারি চাকুরী পায়নি। সেনাবাহিনীতে যেতে পারেনি। পুত্র শামীমকে দু'দুবার হত্যা করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।[২]

পাকিস্তান আমলের সার্বিক দুরবস্থার জন্য সুফিয়া কামাল দায়ী করেছেন পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা,নিপীড়ন ও দুর্নীতিকে :

> এটা হলো আইয়ুবের কীর্তির ধারাবাহিকতার ফল। যেই প্রথম আইয়ুব ক্ষমতা দখল করলো, মার্শাল ল' জারি করলো– সেই থেকে ঘুষের মাত্রা, দুর্নীতির মাত্রা বেড়ে গেলো। এই বাংলাদেশ আগে ছিল সোনার বাংলা, এখন সেনার বাংলা।[৩]

পরিবর্তিত জীবন ও জগতের ছাপ রয়েছে সুফিয়া কামালের কবিতায়। *মোর যাদুদের সমাধি পরে* কাব্যগ্রন্থ এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এছাড়াও অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের কবিতায় বর্ণিত হয়েছে যুদ্ধোত্তর শান্তি কামনা, বিপ্লবী ব্যক্তিত্বের জয়গান, নারীদিবস উপলক্ষে সোভিয়েত ভ্রমণ বিষয়ে জাগরণমূলক বাণী। মুক্তির ত্রাণকর্তারূপে তিনি স্মরণ করেছেন সংগ্রামী-নায়কদের। যেমন : *দীওয়ান* কাব্যগ্রন্থে আলজিরিয়ার মুক্তিকামী নারী জমিলাকে নিয়ে রচনা করেছেন 'কারান্তরালে জমীলা'। লুমুম্বার স্বাধীনচেতা মনোভাব আফ্রিকাকে এনে দিয়েছে জয়ের সাফল্য; সে- বিষয়কে কেন্দ্র করে রচনা করেছেন 'লুমুম্বার আফ্রিকা'। বিশ্বের পরিবর্তিত ঘটনাপ্রবাহ কবির মনোভূমিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, ভাবনাকে সচকিত করছে;– বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে সমর্পিত কবি সাহিত্যেও তা ধারণ করেছেন। মানবতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, বিশ্বসাম্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে তাঁর কবিতায়।

ক্রম-সংক্ষুব্ধ দৈশিক পরিপ্রেক্ষিত কবিকে কাব্যরচনায় নানাভাবে প্রাণিত করেছে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পট, নেতৃত্বের উত্থান-পতন, পাকিস্তানিদের অব্যাহত নিপীড়ন, শোষণ-বঞ্চনায় প্রতিবাদী ছিলেন তিনি। তাঁর কবিতায়ও এর ছাপ সুস্পষ্ট। বৃটিশদের পরাধীনতার নিগড় থেকে বেরিয়ে পাকিস্তান ভূ-খণ্ডের কথা তাঁর কবিতায় যেমন উচ্চারিত হয়েছে তেমনি উচ্চারিত হয়েছে পাকিস্তানের অপ-শাসনের কথা। 'বালাকোট হতে বেরিলি' কবিতায় পাকিস্তান ভূখণ্ডের নির্মাতাদের স্মরণ করেছেন তিনি। পাশাপাশি পরবর্তী সময়ধারায় বিরূদ্ধাচরণ করেছেন 'বাহান্ন থেকে চৌষট্টির পরিক্রমা', কবিতায় :

১. বালাকোট হতে বেরিলি দিল্লী বিহার বাংলাদেশে

---

[১] সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*-ঢাকা, (সাক্ষাৎকার : শামীম আজাদ ৯-২-৯০)

[২] প্রাগুক্ত

[৩] সাপ্তাহিক *বিচিত্রা,* ঢাকা (সাক্ষাৎকার : ফজলুল বারী, ২৭-১২-১৯৮৭)

একদা যে প্রাণ-স্পন্দন জেগে সিন্ধুতে গিয়ে মেশে
কালো মেঘে জাগে বহ্নির জ্বালা, বজ্র গর্জে ওঠে,
ভীরু শশকেরা, খল মুষিকেরা পশ্চাতে চলে হটে,
গাদ্দার আর যালিম নিভাল হাজারো প্রাণের শিখা,
সেই নীল বিষ লাল হয়ে ফের আঁকিল রক্তলিখা।...
অবচেতনার মোহ কেটে যায়, নব চেতনায় জাগে
বন্দী, আযাদী-স্বাদ লভি তার আনন্দে অনুরাগে
উড়াল পতাকা। শ্বেত ও সবুজ অঙ্কিত চাঁদ-তারা
দিবসে, স্নিগ্ধ রাত্রের আঁধারে হবে নাকো পথ হারা ...
(বালাকোট হতে বেরিলি : *প্রশান্তি ও প্রার্থনা*)

২. শহীদ মিনার হয়নি ত, পাঁচ কঙ্কাল খাড়া হলো,
দেখে হবে মন বেদনা আতুর, চোখ হবে ছলোছলো।
রাস্তায় যেতে ধাঁধা লাগে চোখে, কোথা যে এলাম পড়ে না মনে,
ফুলার রোড-এর মাথায় এসেছি? এসেছি কি লন্ডনে?
ইংলিশ রোড মুখ ভ্যাঙ্গচায়? বাঙ্গালী রোড কই?
বাংলাদেশেতে এখনও আমরা প্রধান হলাম কই?...
তবু মনে জাগে আশা
বাংলাদেশের মেয়েরা বাঁচাবে বাংলাদেশের ভাষা।
এপার হইতে ওপার যাইতে বুড়ীগঙ্গার জলে
ফেলিয়া চোখের পানি
গাঁয়ের বধূরা বাইশকোপ-এর বুঝেনি একটুখানি
টিকিট কাটিয়া পয়সা খরচ মিটিল না তার সাধ
বাঙ্গাল লোক এ ভাষা জানে না– এই তার অপরাধ।
বাংলার বাঘ ঘুমায়ে রয়েছে ঘোড়দৌড় ময়দানে,
ঘোড়ার খুরের দাপটে সে আর কী ই বা শুনিবে কানে?
কেবা আর এত ঘামাইবে মাথা? যা আছে তাইত ভালো,
ঢাকা ক্লাব এর ভিতরে বাহিরে জ্বলুক জোরালো আলো।
(বাহান্ন থেকে চৌষট্টি পরিক্রমা : *অভিযাত্রিক*)

উপর্যুক্ত কবিতাংশে সুপ্তিগ্রস্ত বাঙালির জাতিসত্তাকে তীব্র কষাঘাত করেছেন সুফিয়া কামাল। পাকিস্তানিদের অন্যায় আচরণের বিরোধিতা করে কবি সোচ্চার হয়েছেন কবিতায়। বাঙালিদের গা-ছাড়া ভাবকে অবজ্ঞা করে ব্যঙ্গাত্মক চরণ নির্মাণ করেছেন কবি। কবি সততই পরিবর্তনের প্রত্যাশী। বাঙালির জেগে ওঠার প্রতিষেধক রূপে কবিতাটির মূল্য অবিস্মরণীয়। তাই বলা যায়, পরিবর্তনের ধারায় বিশ্বাসী কবি। চল্লিশ বছর ধরে দেশ-বিদেশের উত্থান-পতন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন কবি এবং এর ছাপও প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যকর্মে।

ধর্ম-বিষয়ক যেসব কবিতা রচনা করেন সুফিয়া কামাল, সেগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে ধর্মের মানবিক-মাহাত্ম্য, আধ্যাত্মিক-নিমগ্নতা, ঈশ্বরের প্রতি আস্তিকতার স্বীকারোক্তি। *প্রশস্তি ও প্রার্থনা* কাব্যগ্রন্থের 'ফাতেহা-ই-দোয়ায দহম' কবিতায় নবীর আগমন-প্রশস্তি ও মানবাত্মার কল্যাণকর দিক নিয়ে আলোকপাত করেছেন কবি। এ কবিতায় আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয় :

কুল মখলুক জানায় আজিকে : হে নবী আস্‌সালাম।
সালাম তোমারে মাহ্‌বুবে খোদা! আহমদ এয়া রসুল !
মাটির ধুলায় ফুটে ওঠে আজ লাখো বেহেশ্‌তী ফুল।
আরবের মরুবিয়াবান আজ হল সে গুলিস্তান
সারা জাহানের দিকে দিকে লভি সেই সে ফুলের ঘ্রাণ। ...
পথের দিশারী ! পথ দেখায়েছ, ভৃঙ্গার হাতে সাকী।
হৃদয়ের তৃষা মিটায়েছ, প্রিয়, মাহবুবে খোদা তুমি,
সালাম জানাই তোমার নামের প্রতিটি আখর চুমি।

অভিযাত্রিক কাব্যগ্রন্থের 'সব মানুষের তরে', 'আলোর পাখী', 'এবার ঈদের জামাত কি হবে?', 'ক্ষুধায় আজিকে কাঁদে কারা', 'ক্ষমা নাই', 'কোথায় ঈদের দিন', 'ঈদ ১৩৬১' কবিতাসমূহে ঈদের মাহাত্ম্য যেমন চিত্রিত করেছেন ঠিক তেমনি কৃপণ ও বিবেকহীনদের হাতে এর মাহাত্ম্য কীভাবে বিনষ্ট হয় তাও প্রদর্শন করেছেন। তাঁর মতে ধর্মব্যবসায়ী ভোগলিপ্সাসর্বস্ব মানুষ কলুষিত করছে জগতকে। এই সত্যকে কবি অঙ্কিত করেছেন তাঁর কবিতায়। এমন কি জাতির দুর্দশায় কবি এক যোগ্য নেতার আবির্ভাব কামনা করেছেন; যে নেতা হবে ওমরের মতো :

ওমরের মতো মানুষ আবার আসিতে পারে না আজ?
ঘুচাতে পারে না বিদেশীর হাতে পুতুল জাতির লাজ !
(এ চাঁদ : *অভিযাত্রিক*)

মৃত্তিকার ঘ্রাণ কাব্যে 'শবেবরাত', 'শবে-ই-ক্বদর', 'শওয়াল সাঁঝ', 'মহামিলনের এ দিনে', 'এ দিনের পত্রখানি', 'মানুষে মানুষে হোক পরিচয়', 'এদিনের প্রার্থনা', 'গরীবের মুঠি দিয়ো গো ভরে'– কবিতাগুলোতে ঈদের মহামিলনের দিনে গরিব–দুঃখীদের সাথে একাত্মতার আকাঙ্ক্ষা-ধ্বনিত হয়েছে:

এই মিলনের দিনে
সারা বিশ্বের বিস্মিত আঁখি ইসলামে নেয় চিনে
শান্ত উদার, সুগভীর ধীর, সাম্য ও সেবা, দান–
মানুষেরে মহীয়ান
করিতে প্রয়াস। তাইত আকাশে ক্ষীণ চন্দ্রের হাসি
হেরিয়া মানুষ–আমীর ফকির দাঁড়াইল পাশাপাশি।
(মহামিলনের মহান এ দিনে : *মৃত্তিকার ঘ্রাণ*)

মানবতাই যে সবচেয়ে বড় ধর্ম–সে বিধান যে ইসলামেরও রয়েছে, তা সুফিয়া কামাল তাঁর ধর্ম-বিষয়ক কবিতাগুলোতে স্মরণ করিয়ে দিয়ে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। একটি দৃষ্টান্ত :

তুমি দানিয়াছ প্রতিদিন শেষে রোজাদারে ইফতার
দিয়েছ ত তুমি ধনী জন হাতে দীন দুঃখীর ভার।
এনেছ ধনীর দীনের পার্শ্বে মিলন সিন্ধু তীরে–
মহাসাম্যের সঙ্কেত দানে দ্বিতীয়া চন্দ্র ধীরে
আকাশে ছড়ালে ঝলমল আলো, আশার আলোকে ভরি
মানব হৃদয়ে পরম প্রসাদে দিয়েছ ধন্য করি।
(এ দিনের প্রার্থনা : *মৃত্তিকার ঘ্রাণ*)

সুফিয়া কামাল ধর্মকে জীবনের পাথেয় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ভণ্ড-ধর্মব্যবসায়ীদের ঘৃণ্য-আচরণকে পরিহার করে ধর্মের মৌল-সৌন্দর্যকে গ্রহণে তিনি প্রয়াসী ছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য উল্লেখ করা হলো। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ সম্পর্কে তিনি বলেন : "যে ধর্মের নামে দেশভাগ হলো এবার শুরু হলো একই ধর্মের লোকের উপর অত্যাচার।"[১]

৭১- এর রাষ্ট্রদ্রোহী দালালদের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য :

এরা ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা করেছে। ইসলাম ধর্মের মতো বড় ধর্মকে তারা ব্যবহার করছে ছোট স্বার্থে। এরা মানবতা ভুলে আবার পশু হয়ে উঠেছে। এদের বিরুদ্ধে আবার আমাদের আপোষহীন হতে হবে।[২]

ইসলামি রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য :

ইসলামী রাষ্ট্র বলতে এরা কি বলতে চায়– সেটাই আমি বুঝি না। বেটা তোরা পরিস স্যুট, তোরা পরিস বুট, তোরা খাস বড় হোটেলে, তোরা খাস মদ– তোরা ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে করবি? তোরা মানুষকে জায়গা দিতে চাস না। তোরা শুধু মসজিদ বানাচ্ছিস। মাওলানারা বলে, মেয়ে মানুষেরা বোরকা পরে রাস্তায় বেরুবে। কিন্তু যারা কাপড় কিনতে পারছে না, তাদের কথা কে বলবে ? সামিয়ানা টাঙিয়ে ওরশের নামে ঢলাঢলি করছে। কিন্তু এতিম শিশু যারা খাবারের আশায় থালা নিয়ে ঘুরছে, তাদের দিকে কেউ তাকাচ্ছে না। নবী বলেছেন– প্রতিবেশি অভুক্ত থাকলে এবাদতে কিছু হয় না– কিন্তু এখানে তা হচ্ছে কি? শুধু মসজিদ বানালেই ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে গেলো নাকি?[৩]

দাম্পত্যধর্মে ইসলামের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেন :

জীবনের প্রয়োজনে, সংসারের প্রয়োজনে স্ত্রী স্বামীর কথা মেনে নেয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে অনেক কথাই আমাদের কোরানে ও হাদিসে লেখা আছে। এসব কথা নর-নারী দুজনের জন্যেই প্রযোজ্য।[৪]

---

[১] সাপ্তাহিক *বিচিত্রা* (সাক্ষাৎকার : শামীম আজাদ), উদ্ধৃত, ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, সুফিয়া কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৩৮
[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৭০
[৩] সাপ্তাহিক *বিচিন্তা,* ঢাকা, (সাক্ষাৎকার : ফজলুল বারী, ৯.২.১৯৯০), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬৫
[৪] মাসিক-*সাম্প্রতিক,* ঢাকা, (সাক্ষাৎকার : নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৭৬

তিনি ইসলাম সম্পর্কিত ভাবনা ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর বক্তব্য ও কবিতায়। তাঁর ধর্মীয় কবিতা সম্পর্কে হাসান হাফিজুর রহমান মন্তব্য করেছেন এভাবে :

> ধর্মীয় এবং অনুষ্ঠানমূলক কবিতায় বেগম সুফিয়া কামাল আবদুল কাদিরের অনুরূপ। দু'জনেই এক্ষেত্রে মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন করার প্রয়াসী। কিন্তু বিষয়টি ধারণামাত্রেই পর্যবসিত না থেকে প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ এবং বিশ্বাসে উজ্জীবিত হলে যে কাব্যিক গৌরব ও সঞ্চালন লাভ করতে পারে, বেগম সুফিয়া কামালের হাতে তা হয়ে ওঠেনি। সে কারণে উপরোক্ত বিষয়সমূহের মর্মব্যাখ্যা রূপোলী ভাষায় ধর্মব্যাখ্যারই প্রকারান্তর প্রকাশ বলে অনুমিত হয়। তাছাড়া এই কবিতাগুলোতে তাঁর মেয়েলি মেজাজের বিশিষ্ট প্রতিফলনটাও অনুপস্থিত বলে মনে হয়।[১]

জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের মন্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায়, ধর্ম কেবল ধারণার বিষয় নয়, সেখানে আস্থা-বিশ্বাস না থাকলে প্রত্যয়ে উজ্জীবিত হওয়া যায় না। সুফিয়া কামাল ধার্মিক ছিলেন নিঃসন্দেহে, সে সাথে ধর্মের মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবনে কেবল প্রয়াসী ছিলেন না, ধর্মকে অন্তরে স্থাপন করে বিশ্বাসে উজ্জীবিত হয়েছেন। ফলে, নির্মাণ করেছেন ধর্মের মাহাত্ম্য বাণী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নজরুলও অসংখ্য ধর্মীয় কবিতা রচনা করেছেন, সেগুলোতেও ধর্মের মাহাত্ম্যকথাও আল্লাহ-রসূলের গুণগান করা হয়েছে। সেসব কবিতা নিয়ে বিরূপ সমালোচনা নেই, অথচ সুফিয়া কামালের নির্ভেজাল, সরল, সুন্দর, প্রার্থনা ও প্রশস্তিমূলক কবিতার কাব্যিক মূল্যকে অবহেলা করে তাঁর বিরূপ-সমালোচনা করেছেন হাসান হাফিজুর রহমান।

কবিপুত্র সাজেদ কামালের উদ্ধৃতি এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য :

> পৃথিবীর সব সংস্কৃতিতে যেমন দেখা যায়, দুর্ভাগ্যজনকভাবে একজন কবি যিনি নারীও বটে, তাঁর স্বীকৃতির পথে অনেক বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধি এবং প্রায়শই যা প্রচলিত ধারামতে প্রকৃতপক্ষে তাঁর একমাত্র বিচরণক্ষেত্র– 'ঘর ও পরিবার' – যার সীমানা সংকীর্ণ বলেই বিবেচিত, স্বাভাবিকভাবেই পুরুষের অভিজ্ঞতার তুলনায় নিকৃষ্ট বলে চিহ্নিত। এ সনাক্তকরণ কিন্তু প্রকৃত মেধা বা সমতাভিত্তিক মাপকাঠির বিচারে নির্ণীত হয় না। সুফিয়া কামালও এই বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে রেহাই পাননি। তবুও এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি নিয়ে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির গভীর থেকে অতি উৎকৃষ্ট কাব্য সৃষ্টি করেছেন।[২]

ইসলাম ধর্ম-সম্পর্কিত সাহিত্য অর্থাৎ ইসলাম ধর্মানুভূতির সাহিত্য হিসেবে তমুদ্দুনি সাহিত্যধারা নামক একটি ধারা প্রচলিত ছিল তৎকালীন পাকিস্তানে। পাশাপাশি ছিলো রবীন্দ্রধারা যা বাঙালি ঐতিহ্যের ধারা হিসেবে পরিচিত ছিল। সুফিয়া কামাল তমুদ্দুনি সাহিত্যধারার বিরোধী ছিলেন এবং এর সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ ছিল না মতভেদের কারণে। এ ব্যাপারে সুফিয়া কামালের ভাষ্য :

---

[১] হাসান হাফিজুর রহমান, *আধুনিক কবি ও কবিতা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ২১৪-২২০

[২] *সুফিয়া কামাল রচনা সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-১৪

> তমুদ্দুনী ধারার সাহিত্যের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল না। তাঁদের সাথে আমার মতভেদ ছিল। আমি বললাম, আমি আগে বাঙালি তারপর মুসলমান। তাঁরা বলতেন, মুসলমান বাঙালি। দ্বন্দ্বটা এখানেই। ... এই তমুদ্দুনী মজলিস নিয়ে ফররুখ আহমেদ, কাশেম সাহেবদের সঙ্গে আমার একটা বৈরিতা তৈরি হয়ে গেল। সেটা আদর্শগত বৈরিতা। আমাকে বলা হলো আমি রবীন্দ্র অনুসারী এবং এ কারণে আমি ত্যাজ্য। আমি বললাম, যদি আমি সত্যিই রবীন্দ্রানুসারী হয়ে থাকি তাহলে সেটা আমার জন্য পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। বলবোই তো, কারণ তোমরাই বলো তোমরা যখন পড়ো তখন কেমন লাগে রবীন্দ্রকাব্য? মানুষকে মানবিক চেতনায় রবীন্দ্রনাথ উজ্জীবিত করেন–রবীন্দ্রকাব্যে মানবতার যে স্ফূরণ ঘটেছে তা তো সবাইকে আকৃষ্ট করে।[১]

ইসলামি সাহিত্য বলে আলাদা সাহিত্য নেই। সুফিয়া কামাল মনে করেন, আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করলেই ইসলামি সাহিত্য হয় না। সাহিত্য কেবল সাহিত্যগুণের মূল্যেই বিচার্য। এক্ষেত্রে তাঁর অভিমত নিম্নরূপ :

> তহজীব তমুদ্দুন– এসব শব্দ পাকিস্তান হওয়ার পর শোনা যেতে লাগলো। এর আগে শেখ ফজলুল করিম, কায়কোবাদ এঁরা যাঁরা সাহিত্য রচনা করেছেন সেখানে কোনো অসঙ্গতি আছে? নেই। সেটাকে ধর্মানুভূতির সাহিত্য বলো, ইসলামী সাহিত্য বলো, যাই বলো না কেন। কায়কোবাদই বলো, মোজাম্মেল হকই বলো, তারা সবাই সাহিত্য করেছেন। এঁরা কি কখনো বলেছেন যে আমাদের এগুলি ইসলামী সাহিত্য? তাঁরা সাহিত্য রচনা করেছেন। ওই পাকিস্তান হওয়ার পর ইসলামী মানে তহজীব, তমুদ্দুনী সাহিত্যের কথা শোনা যেতে লাগলো। মোহিতলাল মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় দু'একটা উর্দু শব্দ পাই। তারা কি ইসলামী সাহিত্য রচনা করেছেন? তাঁরা সাহিত্য করেছেন। নজরুল অনেক গজল, গান লিখেছেন। এগুলো কি ইসলামী সাহিত্য? কিংবা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কি হিন্দু সাহিত্য।[২]

'শব-ই-ক্বদর' নিয়ে রচিত কবিতায় সুফিয়া কামাল যে শব্দ-সৌন্দর্য, কাব্যিক বাণীভঙ্গিমার নিপুণ কারুকাজ প্রদর্শন করেছেন তা কেবল 'রূপোলী ভাষায় ধর্মব্যাখ্যা'ই করে না বরং এক অপার্থিব জগতের প্রতি মুগ্ধতার আবেশ তৈরি করে যা কাব্যকলার প্রয়োগে যথাযথ হয়েছে :

> এ এক অপূর্ব রাত্রি। অ-পার রহস্য ঘেরা, ঘন
> আনন্দ প্রতীক্ষা লয়ে উৎকণ্ঠিত মন
> চন্দ্রশূন্য আকাশ পৃথিবী
> সমীর সাগর শূন্য ব্যাপী
> মুগ্ধ হয়ে পাতিয়া শ্রবণ
> শোনে যেন কার আগমন
> ধ্বনি ওঠে মর্মরে মর্মরে
> কাঁপে তৃণ-তরু, অণু থর থর করে।

---

[১] মাসিক *মাটি*–ঢাকা, (সাক্ষাৎকার : মারুফ রায়হান, মার্চ ১৯৯২), উদ্ধৃত, ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *সুফিয়া কামাল*, পৃষ্ঠা-৩৮৬

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮৫

Dhaka University Institutional Repository

মূক মূঢ় অবচেতনার
অন্ধকার ভেদ করি আলোক জোয়ার
প্লাবিত করিয়া আসে বাণী :
'পাঠ কর। কর পাঠ! পর্বত বনানী
মরুতে সিন্ধুতে লাগে দোল,
মহান মানব মন আনন্দে বিস্ময়ে বিহ্বল।
[মৃত্তিকার ঘ্রাণ : শব-ই-ক্বদর]

শব্দচয়ন, উপমা, অলঙ্কার, চিত্রকল্প প্রয়োগে ধর্ম-বিষয়ক কবিতাগুলোর সাহিত্যিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। সুফিয়া কামাল এক্ষেত্রে স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর শৈল্পিক চেতনাবোধের।

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রন্থিত কবিতা

অগ্রন্থিত কবিতাবলীতে সুফিয়া কামালের সেসব কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলো তাঁর জীবদ্দশায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। এ কবিতাগুলোতে সুফিয়া কামালের পরিণত মানসবোধের ছাপ লক্ষণীয়। ৫৬টি কবিতায় কবি বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনসহ জাগরণমূলক, প্রকৃতি-বিষয়ক এবং ছড়ার মতো চটুল বিষয়কে নির্বাচন করেছেন। ধর্ম ও মৃত্যু বিষয়ক কবিতাও রচনা করেছেন কয়েকটি। কবি শরৎচন্দ্রের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে নিবেদিত কবিতাসহ ম্যাক্সিম গোর্কি, সওগাত সম্পাদক নাসিরউদ্দীন, নেলসন ম্যান্ডেলা, জাতীয় অধ্যাপক ডা. নূরুল ইসলাম, শেখ মুজিবুর রহমান, মহাত্মা গান্ধী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে কবিতায়। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে নিবেদিত কবিতায় তাঁর মহাপ্রয়াণ যে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি– সে সম্বর্থিত প্রতিক্রিয়া হতাশা প্রকাশিত হয়েছে :

মাঘের আকাশ মেঘে ঢাকিয়াছে, রবি হাসে নাই নভে,
নব-মঞ্জরী লুটায়েছে ভূমে, ফুটিতে যাইয়া সবে।
উত্তরী বায়ু অধীর হইয়া হাহাকার করি' কাঁদে,
সে-ই কি ঢাকিল অ-কালের মেঘে পূর্ণ শরত-চাঁদে।
বসুধা বক্ষ গুমরিয়া উঠে, অসহ এ ব্যথা ভার,
শরৎচন্দ্র অস্ত গিয়াছে বাংলা যে আঁধিয়ার।
(শরৎচন্দ্র অস্ত গিয়াছে)

সওগাত সম্পাদক নাসির উদ্দীনকে স্মরণ করে সুফিয়া কামাল রচনা করেন 'প্রাচীন বিটপী তুমি' কবিতা। সুফিয়ার জীবনে নাসির উদ্দীনের অবদান অবিস্মরণীয়। নাসির উদ্দীনের 'সওগাত' পত্রিকায় কাজী নজরুলের উৎসাহে ১৯২৭ (১৩৩৩) সালে প্রথম কবিতা পাঠান সুফিয়া কামাল। একজন মুসলিম নারী কবিতা লিখেছেন– বিষয়টি নাসির উদ্দীনকে উৎসাহিত করে এবং তিনি যত্ন করে কবিতা ছাপিয়ে দেন। ক্রমে ক্রমে সুফিয়া কামালের প্রেরিত সব কবিতাই নাসির উদ্দীন প্রকাশ করেন। এভাবেই সুপ্ত-প্রতিভা বিকশিত হবার সুযোগ করে দেন তিনি। এবং সুফিয়া কামাল কবি হয়ে ওঠার সোপান পেরিয়ে পৌঁছে যান খ্যাতির শিখরে। নাসির উদ্দীনের অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়ে সুফিয়া কামাল তাঁর কবিতায় বলেছেন:

অটল অটবী তুমি! তব শ্যাম পত্রছায়া মূলে
আনন্দ অমৃত ছিল, যাহা দিলে তুলে
চির উপেক্ষিতা নারী, তাহাদের তৃষিত অধরে
জাগিয়া উঠিল ঘরে ঘরে
অনেক প্রভাতী পাখী বন্দী হয়েছিল বহুদিন
আবার গাহিল গান, ক্ষীণ হতে ক্ষীণ

সে সুর, সে স্বর, তুমি করিয়া সোচ্চার
শিখালে কহিতে কথা, বুঝে নিতে নিজে অধিকার।
(প্রাচীন বিটপী তুমি)

জীবনের দুঃসহ মুহূর্তে সুফিয়া কামালকে সার্বিক সহযোগিতা দিয়েছেন নাসির উদ্দীন। সে সহযোগিতার স্বীকৃতি রয়েছে সুফিয়া কামালের স্মৃতিচারণমূলক জবানিতে :

> আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমার অগ্রজের ভূমিকা পালন করে আসছেন। আমার জীবনের যতটুকু কাব্য-সাধনা বা সাহিত্য-চর্চা তার হাতেখড়ি সওগাতে তথা জনাব নাসির উদ্দীনের কাছে। আমার সামান্য সাধ্য নিয়ে আজ যে সুধী সমাজে দাঁড়াতে পেরেছি তাও তাঁরই স্নেহসতর্ক মমতায় দৃষ্টিদানের কল্যাণে। তিনিই অবরোধ ভেঙে আমাকে বাইরের প্রসারমান বৃহত্তম সমাজে নিয়ে এসেছেন।[১]

পিতৃস্নেহবঞ্চিত সুফিয়া কামাল পিতৃতুল্য স্নেহ লাভ করেছেন সওগাত সম্পাদক নাসির উদ্দীনের নিকট থেকে :

> পিতৃস্নেহ কিরূপ আমি জানিনা। কিন্তু সওগাত-সম্পাদক নাসির উদ্দীন সাহেবের কাছ থেকে আমি যে স্নেহ ও ভালোবাসা পেয়েছি তা বোধহয় পিতৃস্নেহকেও হার মানায় ।[২]

সুফিয়া কামালের জীবনে নাসির উদ্দীনের ভূমিকা যে কত ব্যাপক, গভীর এবং সুদূরপ্রসারী তা উপর্যুক্ত মন্তব্য থেকেই অনুমেয়। এ কবিতাটি ছাড়াও সুফিয়া কামাল নাসির উদ্দীনের নিরানব্বইতম জন্মদিনে রচনা করেন 'হে প্রাচীন ওষধি' এবং শতোত্তর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে রচনা করেন 'শ্রদ্ধেয় জনাব নাসির উদ্দীনের শতোত্তর এক জন্মলগ্নে' কবিতা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করে তিনি রচনা করেন 'মুজিব মৃত্যুঞ্জয়ী' কবিতা। বঙ্গবন্ধুর সাথে সুফিয়া কামালের সম্পর্ক ছিলো পারিবারিক পর্যায়ের। সুফিয়া কামাল শেখ মুজিবকে 'ভাই' এবং শেখ মুজিব সুফিয়া কামালকে 'আপা' বলে সম্বোধন করতেন। মুজিবের সাহসী নেতৃত্ব, দেশপ্রেমকে সুফিয়া কামাল স্বাগত জানিয়েছেন, প্রশংসা করেছেন এবং এসব প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে বহুবার (বিশবার প্রায়) তাঁর কবিতা ও বক্তব্যে। বিশেষত 'একাত্তরের ডায়েরি' গ্রন্থে মুজিবের অকুতোভয় সংগ্রামের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। মুজিব মৃত্যুঞ্জয়ী– এই বিশ্বাসকে মান্য করে তিনি তাঁর কবিতায় বলেছেন :

কোটি কণ্ঠের ধ্বনিতে শোনালে জয় বাংলা– স্বাধীন দেশ
এ মাটির প্রাণ, এ মাটির শোভা, নাহিক তাহার কভুও শেষ।
তাই তো তোমার সারা জীবনের
ঐ সে প্রাণের নাহিক ক্ষয়
মানুষের হাতে স্বজনের হাতে

---

[১] মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, উদ্ধৃত, ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, সুফিয়া কামাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২২৭

[২] সুফিয়া কামালের ৬৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকা টি.এস.সিতে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে (২১ জুন'৭৬) সুফিয়া কামালের স্মৃতিচারণ, ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২২৭

মরিয়া হয়েছে মৃত্যুঞ্জয়।
(মুজিব মৃত্যুঞ্জয়ী)

কবিতাটি রচিত হয়েছে ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে। এর পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ 'মোর যাদুদের সমাধি পরে'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মুজিবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতা 'মুজিবের জন্মদিনে'। এছাড়াও ১৯৮৫ সালে 'ডাকিছে তোমারে' এবং ৯২-এর ২৭ জুলাই 'নিত্য যাঁরে করিছে স্মরণ' নামক কবিতা বঙ্গবন্ধু মুজিবের উদ্দেশে রচনা করেছেন তিনি।

মাদার তেরেসার সেবাব্রত যে মানবের হৃদয়পটে চিরজাগ্রত তাও তিনি বিশ্বাস করেন :

সে জননী, সে অমৃতা, সে রয়েছে সকলের মনে,
রহিবে সে বিশ্ব মাঝে, ক্ষণকাল বিরাম শয়নে
শায়িতা সে– জাগি পুনর্বার
মানুষের চিত্ত মাঝে জাগ্রত রহিবে অনিবার।
(মাতা অমৃতা)

বিশ্বভ্রাতৃত্ব-প্রীতিবোধ কবিতার সূত্রে বেঁধে রাখতে সচেষ্ট সুফিয়া কামাল। তারই প্রতিফলন কবিতার কথামালাতে উপস্থিত। যেমন বস্টনে বসবাসরত দুজন ইতালীয় অভিবাসী নিকোলা সাকো ও বার্থোলোমিও ভেনজেটির মৃত্যুদণ্ডের স্মরণীয় ঘটনাকে নিয়ে সুফিয়া কামাল রচনা করেন 'সাকো ও ভেনজেটিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি' নামক কবিতা এবং ০১-০৯-৮৯ সালে 'দি কমিউনিটি চার্চ অব বস্টন'-এ কবিতাটি পাঠ করেন।

এ সৌধে উৎকীর্ণ আছে যাঁহাদের চিত্র ও নাম
শ্রদ্ধায় তাঁদেরে স্মরিলাম,
অন্যায়ের প্রতিবাদে পণ করি প্রাণ
রাখিয়াছে মানুষের আত্মার সম্মান,
মৃত্যুরে করেছে জয়
তাদের স্মরণে তাই অবনত আমার হৃদয়।
(সাকো ও ভেনচেটিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি)

প্যালেস্টিনীয় মুক্তিযোদ্ধা লায়লা খালেদকে স্মরণ করে সুফিয়া কামাল রচনা করেন 'লায়লা স্মরণে' কবিতা। সভ্যতার শিখরস্পর্শী চাকচিক্যময় রাষ্ট্রগুলোর অন্তরেও দারিদ্র্যের কী করাল রূপ– তারই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'আমেরিকা ১৯৮৯' নামক কবিতায়। সুফিয়া কামালের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিময় পর্যবেক্ষণ- শক্তির নিদর্শন এ কবিতা :

আশ্চর্য এদেশ। যেথা কোটি কোটি অর্থ ব্যয় করে
নিত্য নব মারণাস্ত্র গড়ে
বিচরণ মহাশূন্যে, চন্দ্রে অভিযান

তৃতীয় বিশ্বেরে গড়ে খাদ্য, বস্ত্র দিয়ে করে ত্রাণ।
সবিস্ময়ে হেরি সেথা ক্লান্ত পদে হেঁটে
বৃদ্ধারা চলিছে পথে ডাস্টবিনগুলো ঘেঁটে ঘেঁটে
হর্ম্যের সোপান তলে শীতের কুণ্ডলীকৃত দেহ
পড়ে আছে, যেতে যেতে পথচারী কেহ
ভ্রুক্ষেপও করে না, যেন এই- ই স্বাভাবিক
মানুষের চেয়ে মূল্য অস্ত্রের অধিক।
(আমেরিকা ১৯৮৯)

কেবল বিদেশ নয় স্বদেশের বিবিধ অসামঞ্জস্য নিয়ে তিনি রচনা করেন 'আধুনিক কবিতা' ও 'সাম্প্রতিক ছড়া' নামে কবিতাদ্বয় :

কী বিচিত্র এই দেশ! শুনে সেল্যুকাস
বিস্ময়ে অবাক হয়েছিল রুদ্ধশ্বাস।
সত্যই এ কী বিচিত্র দেশ
কোথা দিয়ে কি যে হয় না পাই উদ্দেশ !
'সত্যবাবু মারা গেছে', ইমান আলী' ভুগিছে ক্যান্সারে
'হিম্মত খান' ভুগিতেছে ম্যালেরিয়া জ্বরে
'হায়ার' সর্বাঙ্গ ভরি বসন্ত গুটিকা
সময় থাকিতে দেওয়া হয় নাই টিকা
'নীতিন' বাবুরা দেশে ফিরে আসে নাই
কেননা পুলিশ পিছে ঘুরিছে সদাই।
অর্ধভুক্ত বিত্তহীন অসংখ্য বেকার
কী ভরসা কিছু আশা নাহি তো দেবার।
'হেদায়েত আলী' শুধু চেয়ে চেয়ে দ্যাখে
কী করিয়া হেদায়েত করিবে কাহাকে ?...
বাঁচিয়া থাকিলে দেখে যেতো সেল্যুকাস
কেমন বর্ষণে কেটে গেল চৈত্র মাস।
আষাঢ়ে হয়তো ঝড়ে উড়াইবে বালু
বাঙালী খায় না ভাত– খায় আটা, আলু
তবু এ বাংলাদেশ বিশ্বের বিস্ময়–
মারী, অরি, মন্বন্তরে বেঁচে বর্তে রয়।
(আধুনিক কবিতা)

সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের প্রয়াসে কবি রচনা করেছেন জাগরণমূলক কবিতা। এ ধরনের কবিতাগুলো হলোঃ 'বাঁচাতে এবার এসে মা বোনেরা লাগুন', 'এখনও কুয়াশা', 'আসেন

মানব', 'আজকের কবিতা', 'অরণ্য কন্যারা জাগে', 'মনে করো', 'যাবার বেলায়', 'আপনজন' প্রভৃতি।

প্রকৃতি-নির্ভর কবিতায় সুফিয়া কামাল খনার বচনের মতোই উন্মোচন করেছেন প্রকৃতির আশ্রয়ে মানব-পরিবেশের অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থাকে। 'মৃত্যুর মাধুর্য', 'মস্কোয় বসন্ত', 'আজ এই সন্ধ্যায় গোধূলি', 'শতাব্দীর শেষ বসন্তে', 'সমুদ্র যাবে কোথায়', 'পুষ্প সূর্যমুখী', 'নিম', 'অঙ্কুরের ধর্ম' প্রভৃতি কবিতায় প্রকৃতির অনুরাগ, বিরাগ, চঞ্চলতা-শৈথিল্য মানব মনে যে ব্যাপক ভূমিকায় ক্রিয়াশীল তা বর্ণিত হয়েছে।

মস্কোতে অবস্থানকালে সুফিয়া কামাল প্রকৃতিতে বসন্ত ও শীতকে অবলোকন করেছেন। মস্কোর শীতকে তিনি মৃত্যুর সামিল গণ্য করেছেন। কবি তাই রচনা করেছেন 'মৃত্যুর মাধুর্য' কবিতাটি এবং বসন্তরূপ দর্শনে রচনা করেন 'মস্কোয় বসন্ত'। সমুদ্রকে নিয়ে বেশ কয়েকটি কবিতা তিনি রচনা করেছেন। এ গ্রন্থেও রয়েছে সমুদ্রের অবদান-সম্পর্কিত কবিতামালা। 'নিম' বৃক্ষকে আশ্রয় করে রচনা করেছেন 'নিম' নামক কবিতা। প্রকৃতিও যে কখনও কখনও দরিদ্রের সহায় সে- দিকটিও বর্ণিত হয়েছে এ কবিতায় :

সে তরু হয় না শখে উদ্যানে রোপিত
করে না পল্লবে তার তোরণ রচিত
সে থাকে পরম যত্নে মারী মড়কের
দূষিত প্রভাব দূর করি আতঙ্কের
একান্ত আপন হয়ে বিত্তহীন জনে
শান্তির প্রলেপ দানে দুশ্চিন্তা দহনে।
(নিম)

সুফিয়া কামালের অগ্রন্থিত ছড়ার সংখ্যা ৮টি। ছড়াগুলোতে স্থান পেয়েছে বিনোদন, রঙ্গব্যঙ্গ ও দেশপ্রেম। যেমন 'ঊনসত্তরের ছড়া', 'মানুষ হ', 'ব্যাঙের সর্দি', 'একটা আছে ছাগল', 'ছড়ার ছড়া', 'সুমির ভাবনা', 'টিকেট কেটে দিলাম' প্রভৃতি ছড়া নির্মল আনন্দের উদ্বোধক। ব্যঙ্গাত্মক ছড়া 'ঘুম ভাঙ্গানো ছড়া' এবং দেশাত্মবোধক ছড়া 'ধান শালিকের দেশ'। *ইতলবিতল* ছড়াগ্রন্থের ছড়াগুলোতেও শিশুতোষ আনন্দের নির্মল রূপচ্ছবি অঙ্কন করেছেন সুফিয়া কামাল। এছাড়া কিশোর কবিতা 'টইটম্বুর' ও 'আজিকার শিশু' কবিতা দুটোতে শিশু-মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সুফিয়া কামাল বিষয় ও ভাষা নির্মাণ করেছেন।

নারী অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ রচনা করেছেন '৮ মার্চ নারী দিবস' এবং 'নারী' নামক কবিতাদ্বয় :

১. নারী শুধু নহে নারী
বিশ্বের যত শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি
মহান মহৎ তারি–
মহীয়সী সে যে মাতা।
স্রষ্টা বিশ্ববিধাতা
সৃজন করেছে এই ধরণীরে–
শক্তি-রূপিণী সর্বংসহা, বসুধা ধরণী
দিয়ে ফুল-ফল তৃষ্ণার জল
বক্ষ্যস্তন্য দানে
পালিয়াছে সন্তানে।
কত মহাজন মহান মানবে
জঠরে ধরিয়া নারী
এই বিশ্বেরে দিল উপহার–
জয়গান আজ তারি।
(৮ মার্চ নারী দিবস)

২. সে যে 'নারী' সে যে মাতা মহিয়সী
কোথায় তুলনা তার!
সর্বংসহা জননী, শ্রেষ্ঠ
সৃষ্টির সে বিধাতার।
(নারী)

নারীর অবদানকে মূল্যায়ন করেছেন সুফিয়া কামাল তাঁর কবিতায় ও বক্তব্যে। নারী-সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য :

নারী পুরুষের মধ্যে অধিক কর্মক্ষম হচ্ছে নারী। সন্তান ধারণের দীঘ সময়ের কষ্ট। তারপর লালন এবং গৃহের কাজকর্ম, চাকুরীর দায়-দায়িত্ব সবই নারী করে যায়। পুরুষ পারবে? পারেনি। এমনকি সংসারে অশান্তি এলে পুরুষ তার সন্তান-স্ত্রীকে ভরণপোষণহীন অবস্থায় ত্যাগ করে যায়। নজরুলের কবিতায় আছে–

লবকুশে বনে ত্যজিয়াছে রাম
পালন করিছে সীতা ...

মা'র দাবি তাই অনেক। ইসলামে আছে– মৃত্যুর পরে মা'র নামে হবে পরিচয়। আসলে জীবনে তাই হওয়া উচিৎ। কত পুরুষ একটি দিন সন্তানকে দেখতে আসেনি। কোনো সাহায্য দেয়নি। মা'ই

> সন্তান বড় করে স্কুলে দিতে গেছে। তখন আবার প্রয়োজন হচ্ছে অভিভাবক হিসেবে বাবার নামের। বরং মার নাম থাকা শোভন ও সঙ্গত।[১]

সুফিয়া কামালের মাতৃহৃদয় সতত সন্তানের মঙ্গল কামনায় ব্যগ্র। তাই প্রকৃত অর্থেই তিনি 'বঙ্গজননী' ও 'জননী সাহসিকা'।

সুফিয়া কামালের কাব্যভাবনা ও প্রকরণকৌশল নিয়ে সমালোচকগণ বিভিন্নমুখী বক্তব্য প্রদান করেছেন। তাঁর শব্দপ্রয়োগনৈপুণ্য নিয়েও অল্পবিস্তর সমালোচনা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাসান হাফিজুর রহমানের মন্তব্য লক্ষণীয় :

> বেগম সুফিয়া কামাল...মধুর, অনন্ত, সুন্দর, চিরন্তন প্রভৃতি নন্দনতত্ত্ব-সম্পর্কিত শব্দ তাঁর কাব্যে বহুল ব্যবহার করেছেন। এ থেকে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, তিনি কবিতার শিল্পসত্তা সম্বন্ধে সজাগ। কিন্তু এই সজাগতা...শব্দসমূহের ব্যবহারের মধ্যে যতখানি বিধৃত, সামগ্রিক রচনাপদ্ধতির মধ্যে ততখানি নয়। বিশেষ করে কাব্যের আঙ্গিক বিষয়ে বেগম সুফিয়া কামাল বিশেষ অভিনিবেশ করতে সক্ষম হননি। বস্তুত বেগম সুফিয়া কামালের কবি-প্রতিভা সহজাত; কতিপয় কাব্যকে অণুরণন তাঁর মনের স্বাভাবিক বৃত্তি, এই মাত্র।...
>
> বেগম সুফিয়া কামাল প্রথম দিকে বেশ কিছু কবিতা পয়ারে লিখেছেন। তাঁর পয়ারে গাম্ভীর্যের পরিচয় রয়েছে। পরবর্তীকালে পয়ারের চর্চা তাঁকে আর তেমন আকর্ষণ করেনি, লক্ষ্য করা যায়, মাত্রাবৃত্তের ওপরেই তিনি প্রকাশ মাধ্যমের জন্য নির্ভর করেছেন বেশি এবং তাঁর হাতে এ গাঁথুনিও সর্বত্রই হালকাই রয়ে গেছে।...সুফিয়া কামালের কাব্য প্রচেষ্টার বিবর্তন রয়েছে– পরিণত সময়ে তিনি প্রবহমান জীবনেই উপজীব্য খুঁজেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, জীবনের দিকে মুখ ফেরানো অর্থই জীবনের গভীরতর ও সাম্প্রতিকতর তাৎপর্যকে জানা নয় এবং অপরপক্ষে জীবনশীলতার সংযোগ চেতনাগত দিক থেকে ভালো; কিন্তু কাব্যক্ষেত্রে উপযুক্ত আঙ্গিকে একে ফলিয়ে তোলার ওপরেই এর কাব্য-সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বেগম সুফিয়া কামালের কাব্যে জীবনবোধের গভীরতার লক্ষ্যযোগ্য প্রমাণ নেই এবং তাঁর আঙ্গিক পরিশ্রমে নারাজ।[২]

সুফিয়া কামালের কাব্য-প্রকরণ সম্পর্কে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের মন্তব্য হাসান হাফিজুর রহমানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তিনিও সুফিয়া কামালের সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গ উলেখ করেছেন :

> তিনি প্রধানত চলিশের মনোভঙ্গির ধারক ও বাহক। তাঁর প্রকরণ-কৌশলে ও চিন্তা-পদ্ধতিতে তার প্রচুর স্বাক্ষর বর্তমান এবং পঞ্চাশ কি ষাটের কোন কোন কাব্যধ্যান তাঁকেও স্পর্শ করেছে। প্রকাশ-কৌশলে তিনি অবশ্য আপন ভঙ্গিগত জগত থেকে বেশি সরে আসেননি।[৩]

সাঈদ-উর-রহমান সুফিয়া কামালের কাব্যিক মনোভাবকে চল্লিশের নয় বরং উনিশ শতকীয় বলে মনে করেন। সুফিয়া কামাল সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরূপ :

---

[১] সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*-ঢাকা, (সাক্ষাৎকার : শামীম আজাদ, ০৯-০২-৯০)। উদ্বৃত, ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *সুফিয়া কামাল*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬৭

[২] হাসান হাফিজুর রহমান, *আধুনিক কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১৪-২২০।

[৩] ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *সুফিয়া কামাল*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৬

> তাঁকে চল্লিশের মনোভঙ্গীর ধারক ও বাহক বলাও যথার্থ নয়, কেননা তিনি ও চল্লিশের কবিরা সমাজ সমস্যাকে একই দৃষ্টিতে অবলোকন করেননি। সুফিয়া কামাল মূলত ঊনিশ শতকী রোমান্টিক কবিমানসের অধিকারী। তাঁর প্রেমভাবনা, বিরহবোধ, প্রকৃতিচিন্তা, মানবিক চেতনা ও কাব্যলক্ষ্মী সুন্দরের অনুধ্যান– বাংলা কবিতার গত শতাব্দীর ঐতিহ্যানুসারী। চল্লিশ বছর ধরে কবিতা লিখলেও এই দীর্ঘ সময়ে পরিবর্তিত সমাজের ছাপ তাঁর লেখায় দুর্লভ। এটুকু বলা যেতে পারে যে, তার পরিধি একটু বেড়েছে। ব্যক্তিগত প্রেমবোধ ও স্বভাবজাত কল্যাণবোধকে তিনি ক্রমশঃ সম্পূর্ণ করেছেন পৃথিবী ও প্রকৃতির উদার পরিমণ্ডলের মধ্যে। ফলে প্রথম দিকের বেদনাবিধুরতা ধীরে ধীরে কেটে গেছে শেষের দিকের রচনায়। মুসলমানদের পর্বভিত্তিক কয়েকটি কবিতাও তাঁর আছে। এগুলোতে ধর্মের অলৌকিক দিক নয়, বরং মানবিক দিক মুখ্য হয়েছে। ফলত মানুষ, মৃন্ময়ী পৃথিবী ও স্নিগ্ধ প্রকৃতি মমতারসে সিক্ত হয়ে ধরা পড়েছে তাঁর কবিতায়। ... তাঁর কবিতার ভাষা প্রাঞ্জল, যদিও তা প্রায়শ বক্তব্যকে অতিক্রম করে ব্যঞ্জনার স্তরে উন্নীত হতে পারেনি।[১]

জটিল প্রকরণ-কৌশল কিংবা সুদূরপ্রসারী প্রতীক ব্যবহার না করেও সুফিয়া কামাল কবিতায় নির্মাণ করেছেন নিরাভরণ সহজ সৌন্দর্য। এরূপ মন্তব্য করেছেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। তিনি সুফিয়া কামালকে মূল্যায়ন করেছেন এভাবে :

> বেগম সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের এক পরম শ্রদ্ধেয়, গভীর অনুরাগসিক্ত, অকৃপণ প্রশংসাধন্য নাম। ১৯৩৮ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "সাঁঝের মায়া" প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিলো। তারপর থেকে চার দশাধিক ধরে তাঁর কাব্যভুবন প্রথম দিকের প্রেম ও প্রকৃতি-নির্ভরতার পাশাপাশি, বরং তাকে অতিক্রম করে, সমকালীন সমাজের নানা বাস্তব সমস্যাকে বলিষ্ঠভাবে ধারণ করেছে। যেমন দেশীয় পটভূমিতে, তেমনি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে। একথা সত্য যে তিনি মূলতঃ রবীন্দ্র-নজরুল বলয়ের কবি। বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন প্রমুখের কাব্যচর্চার ফলে বাংলা কাব্যের জগতে যে একটা গুরুত্বপূর্ণ পালাবদল ঘটে গেছে তার স্বাক্ষর সুফিয়া কামালের রচনায় অপ্রত্যক্ষ। তাঁর কাব্যে আমরা আধুনিক কবিতার বৈদগ্ধ্য জটিল উপমা, উৎপ্রেক্ষা কিংবা সুদূরপ্রসারী প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করি না, কিন্তু তবু তাঁর কবিতা আমাদের আকর্ষণ করে এর নিরাভরণ সহজ সৌন্দর্য ও স্নিগ্ধ মাধুর্যের পাশাপাশি অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার অসংকোচ প্রকাশের জন্যে, এর সামাজিক বাস্তবতার জন্য।[২]

তিরিশের দশকে বাংলা কবিতায় আঙ্গিক ও প্রকরণ নিয়ে ব্যাপক নিরীক্ষা হয়েছে। এ নিরীক্ষার সঙ্গে সুফিয়া কামালের যে সম্পর্ক ছিল তা তাঁর কাব্যপাঠে জানা যায় না। তিনি বরং বিচরণ করেছেন ভিন্নপথে। এ সম্পর্কে তাঁর ভাষ্য :

> আমি ওই ঢংয়ে কবিতা লিখিনি। আমি ইচ্ছা করেই ওরকম কবিতা লিখিনি। আমি কবিতা লিখেছি আমার ঢংয়ে। কিন্তু আধুনিক কবিতার আমি প্রচণ্ড ভক্ত। আধুনিক কবিদের কবিতা আমার কাছে ভাল লাগে। কিন্তু আমি ঐ ধারায় যাইনি।... অনেক আধুনিক কবিই কবিতা লিখছে। তাদের কারো

[১] সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ববাংলার রাজনীতি– সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-১৭০
[২] সুফিয়া কামালের ৬৫তম জন্মবার্ষিকী স্মরণিকা (আনোয়ারা বাহার চৌধুরী সম্পাদিত), ঢাকা, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা-২৭০

> কারো কবিতা এত ভালো লাগে তারা এত ভাল লিখছে। ... আমি যদি সত্যিই রবীন্দ্রানুসারী হই, তাহলে আমার কবিতা পরেও লোকে পড়বে।[১]

বিশ্বযুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী যে পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয় তার প্রভাব সাহিত্যজগতেও পড়ে। পাশ্চাত্য সাহিত্যজগতের অনুকরণে নৈরাশ্য, হতাশা লিবিডো প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যেও দুর্লক্ষণরূপে আবির্ভূত হয়। আধুনিকতার নামে কাব্যধারায় সংযোজিত হয় পাশ্চাত্য প্রভাব। সে সময়কালে এ ধারায় প্রভাবিত কবিরা রচনা করেন ভিন্নধর্মী কবিতা যার প্রকরণকৌশলও ভিন্ন। সুফিয়া কামাল সে ধারায় প্রভাবিত না হয়ে আপন মনে নিজস্ব ঢংয়ে রচনা করেন বাংলার ঐতিহ্যবাহী কবিতার পঙ্‌ক্তি, যা রবীন্দ্র-নজরুল কাব্যধারার অনুসারী।

কবিমাত্রই জীবনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিকোণ থেকেই যাপিত জীবনের দুঃখবোধ, নৈরাশ্য-হতাশা-আনন্দ-বেদনাকে অঙ্কন করেন কবি। ফলত, জীবনবোধের গভীরতার ছাপ কবিতার পঙ্‌ক্তিমালায় চেতন-অবচেতনে প্রতিফলিত হয়। সুফিয়া কামাল জীবনের কঠিন-ভয়াল রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন, নির্মমতাকে নিদারুণভাবে উপলব্ধি করেছেন। পুড়ে পুড়ে খাঁটি সোনা হয়ে উঠেছেন তিনি। বৈধব্যযন্ত্রণা, আর্থিক-কষ্ট, সামাজিক নিপীড়ন, রোগ-জরা মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি হয়ে উঠেছেন জ্যোতির্ময় ও সত্যসন্ধ। জীবনের নির্মম বাস্তবতা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন বলেই তাঁর কবিতা বেদনার স্নিগ্ধ প্রস্রবণ। অবশ্য তাঁর কবিতায় বেদনা আছে, কষ্ট আছে সত্য কিন্তু তা নৈরাশ্যবোধে আচ্ছন্ন নয়, নৈরাশ্যকে অতিক্রম করে কবি আপন অন্তরলোকের আলোয় উদ্ভাসিত। এ প্রসঙ্গে কবিপুত্র ড. সাজেদ কামালের মন্তব্য স্মরণযোগ্যঃ

> তাঁর কবিতায় তিনি তাঁর জীবনযাপনের বাঁকে বাঁকে যে সংগ্রাম করে গেছেন– নারী, স্ত্রী অথবা মা হিসাবে, সমাজকর্মী, শিক্ষাদাতা অথবা সংস্কারক হিসাবে আমরা তাই চিত্রিত হতে দেখি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর চিন্তার ব্যাপকতা, যার পরিচয় তিনি তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু নির্বাচনে রাখতে পেরেছেন। এবং যে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি সেই চিন্তা, উৎকণ্ঠা, চেতনাকে তুলে ধরেছেন তাই তাঁর কবিতাকে এক আন্তর্জাতিক ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করে তুলেছে। তাঁর জীবনের প্রতিচ্ছবি স্বরূপ তাঁর কবিতায়ও আপন অভিজ্ঞতার সচল প্রকাশ স্পষ্ট। রোমান্টিক, বালিকাসুলভ পার্থিব প্রেম যেমন তাঁর অনেক কবিতারই উপজীব্য বিষয়, যে কোন রকমের অন্যায় এবং উৎপীড়ন নিপীড়নের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার। তাঁর অসংখ্য কবিতা রয়েছে যা গভীর ধ্যানমগ্নতা, অতীন্দ্রিয়বাদ, আধ্যাত্মিকতায় ঘেরা, যেন প্রকৃতির অস্তিত্ব এবং রহস্যের চমৎকারিত্বে মুগ্ধ– সেখানে তাঁর কবিতা পুরোপুরি প্রার্থনার রূপ ধারণ করে। সব বয়সের পাঠকের জন্য রয়েছে তাঁর হাস্যরসাত্মক প্রহসন, নির্মল

[১] মাসিক *মাটি*- ঢাকা, সাক্ষাৎকার : মারুফ রায়হান, মার্চ ১৯৯২

> হাসির কবিতা; একই সাথে তিনি অত্যন্ত গুরুগম্ভীর সামাজিক, রাজনৈতিক এবং পরিবেশগত সমস্যা নিয়েও তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।[১]

কাব্যের আঙ্গিক-নির্মাণে সুফিয়া কামাল ঐতিহ্যানুসারী, প্রথাগত। এ বিষয়ে তাঁর স্বচ্ছন্দ-স্বীকারোক্তি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সাজেদ কামাল বলেছেন :

> তাঁর নিজস্ব রচনা শৈলীর বিপরীতধর্মী কাজ সম্পর্কে তিনি সব সময়েই বলেছেন তিনি তা উপভোগ করে থাকেন। এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে তার প্রতি গভীর অনুরাগও পোষণ করে থাকেন। কিন্তু তিনি নিজের লেখায় তা কখনও প্রয়োগ না করে নিজের স্বতন্ত্র ধারায়ই লিখে গেছেন।[২]

প্রচলিত ধারায় সুফিয়া কামাল ব্যবহার করেছেন ছন্দ-উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্প। কাব্যে বিষয়ানুসারী অলংকারেরও সার্থক ও সুন্দর শৈল্পিক রূপায়ণ ঘটেছে। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য:

উপমা

১. তুমি তীর, আমি ঊর্মির মতো বার বার আঘাতিয়া
তব পদ-বেলাভূমে চুমে যাব প্রেমাবেগ উছলিয়া,
(তুমি আর আমি : *সাঁঝের মায়া*)

২. গোধূলির স্বর্ণ-আলো সূক্ষ্ম উত্তরীয়সম টানি
ঢালি লও সন্তর্পণে রৌদ্রদগ্ধ তব দেহখানি।
(সুন্দরী বসুধা : *মায়া কাজল*)

৩. কস্তুরী হরিণীসম মন মোর সে গরবে মাতি
আপনি উন্মাদ হয়।
(একদা : *মন ও জীবন*)

৪. নিশ্বাস স্পর্শিতে চায় চন্দ্রকলা সম তব ভাল।
(একদা : *মন ও জীবন*)

৫. চলে যায় শীত। আসে মাঘের মমতা–ভরা কোলে
পথ-ভোলা শিশু-সম ফাগুন।
(মাঘের মমতা : *উদাত্ত পৃথিবী*)

৬. দিগন্তের সূর্য ঢাকা বজ্রগর্ভ মেঘের তিমিরে
হে বিদ্যুৎ! বাহিরাও সে মেঘের কৃষ্ণ বক্ষ চিরে
দীপ্ত তরবারি তব ঝলিয়া উঠুক দিক ভরি।
(রুদ্র জাগো : *উদাত্ত পৃথিবী*)

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনা সংগ্রহ: প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- পনের-ষোল
[২] *সুফিয়া কামাল রচনা সংগ্রহ: প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-চৌদ্দ

৭. সুচারুচিবুক ওষ্ঠ অধর দৃঢ় শপথ সম
তৎপর সদা।
(বেণীবিন্যাস সময় তো আর নাই : *মোর যাদুদের সমাধি পরে*)

৮. কুঁড়ির ভিতরে বন্ধ গন্ধ সম মৌন মূক কথা।
(আশ্বান্বিতা : *সাঁঝের মায়া*)

৯. সহসা দিগন্তপ্রান্তে পুঞ্জ পুঞ্জ আসে মেঘভার,
রুদ্র রৌদ্র লুকালো তাহার
গলিত কাঞ্চন সম দেহ।
(প্রথম বর্ষণ : *মৃত্তিকার ঘ্রাণ*)

উৎপ্রেক্ষা

১. মধুর মাধবী নিশি! পূর্ণপাত্র হস্তে যেন সাকী
(চৈত্র পূর্ণিমার রাত্রি : *সাঁঝের মায়া*)

২. তব দান মর্মে মম তব স্পর্শ সম যেন বাজে।
(আশ্বান্বিতা : *সাঁঝের মায়া*)

৩. তোমার কোলে আমার দেহ একটা যেন মাটির তাল-
(দীওয়ান : *দীওয়ান*)

৪. জাতির রক্ষায় দিল নিজ অস্থি এ যুগ-দধীচি
আদর্শ তাহার মানি সাম্য শান্তি লভে যেন প্রাচী।
(অমৃত প্রাণ : *প্রশান্তি ও প্রার্থনা*)

৫. চেয়ে দেখি আজ আকাশে আবার উড়িছে আলোর পাখী!
লাখো ভিখারীর জঠর পাবকের শিখা নাকি?
(আলোর পাখী : *অভিযাত্রিক*)

৬. এ তাজমহল–
বিরহ-বেদনা-নীল সিন্ধু-নীরে শুভ্র-শতদল,
(তাজ : *মৃত্তিকার ঘ্রাণ*)

কাব্যভাষা নির্মাণে সুফিয়া কামাল রবীন্দ্র-নজরুল ধারার অনুসারী কিংবা প্রথাগত শিল্পশৈলীর অনুসারী। প্রেম-বিরহ প্রকাশে মার্জিত ভাষাকে নিবিড়-প্রসাধনীর স্নিগ্ধতায় কাব্যশরীরে সন্নিবেশিত করেছেন তিনি। কাব্য-জমিনে সংযোজিত করেছেন দেশি, বিদেশি তদ্ভব ও তৎসম শব্দগুচ্ছকে। কখনো কখনো তাঁর কবিতায় তৎসম শব্দের প্রাধান্যই লক্ষণীয় :

ধীর, স্থির, দেহ সিন্ধু, অন্বেষিয়া চিত্ত তীর পাশে
মনের মন্দির শীর্ষে অন্ত লভে চন্দ্রোদয় আশে,
প্রীতির রজনীগন্ধা, পূত শুভ্র, ফুটন-উন্মুখ,

অন্তিম আরতি লাগি প্রাণ-পদ্ম ব্যগ্র সমুৎসুক।

(অনন্ত পিপাসা : *সাঁঝের মায়া*)

কবিতার সুগভীর ভাব-ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে কখনো বা ব্যবহার করেছেন বিদেশি শব্দমালা :

১. ওঁর অসুখের কাতরতা দেখে মন বড় পেরেশান

(চিঠির জওয়াব : *সাঁঝের মায়া*)

২. বর্ধমানে থাকলে আমি জাপানীদের বোমা

যদি পড়ে, স্টিরাগ পাম্প কে চালাবে ও মা!

(শামীমের কান্ড : *মৃত্তিকার ঘ্রাণ*)

৩. অথচ ওরাই পেট্রল ফেলে জীবন্তে দিয়ে পোড়া

উড়ায়েছে ধূম নভে।

(আমন্ত্রণ : *মোর যাদুদের সমাধি পরে*)

৪. তুমি রাজ্জাক ভুখারীর ক্ষুধা সুধায় দিতেছ ভরি।

(এ দিনের প্রার্থনা : *মৃত্তিকার ঘ্রাণ*)

কবিতার ভাব-ব্যঞ্জনার অন্তর্নিহিত শক্তি উন্মোচনে কখনো ব্যবহার করেছেন তদ্ভব ও দেশি শব্দ। যেমন :

১. তোমার নিবিড় গভীর আড়ালে আমারে দেহ গো ঠাঁই।

(সাঁঝের মায়া)

২. কেটেছে প্রভাত কেটেছে দুপুর এসেছে নিরালা সাঁঝ

(সাঁঝের মায়া)

৩. তটিনী ভরিয়া দেহ জল।

(জীবনের রাত্রি হয় শেষ : *সাঁঝের মায়া*)

৪. থির হয়ে আসে অন্তরলোকে

উচ্ছল প্রাণাবেগ।

(বঞ্চিতা : *মৃত্তিকার ঘ্রাণ*)

৫. হিমানীর হিম অশ্রুজলে

রুদ্ধ দিঠি।

(শেষের সম্ভার : *সাঁঝের মায়া*)

৬. বহিয়া চলিল বন্ধুর মতো নয়নে নিদালি আনি

(রজনীগন্ধা : *সাঁঝের মায়া*)

সুফিয়া কামাল তাঁর কবিতায় শব্দ ব্যবহারে প্রথানুসারী হলেও অনেকক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র। দানিয়া, দরদ, দিঠি, নিদালি, মরম, দরশে, ঢুলায়, বুলায় প্রভৃতি শব্দের সুনিপুণ প্রয়োগে তাঁর কবিতা আবহমান বাংলার কাব্যকথার স্বাদ ও সুষমাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করায়।

কবিতা নির্মাণে মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ওপর নির্ভর করেছেন সুফিয়া কামাল। তবে মাত্রাবৃত্তের আধিক্য লক্ষণীয়। ছড়া নির্মাণে স্বরবৃত্তকে প্রাধান্য দিয়েছেন কবি। ছন্দের দোলায় সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সুফিয়া কামাল শব্দব্যবহারে কিছুটা বিচ্যুতিও ঘটিয়েছেন। অনেক চরণে মনের চেয়ে কানের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। সে রকম কয়েকটি চরণ উল্লেখ করা গেলো :

১. বনান্তর হতে আসে যে অনামা পুষ্পের সুবাস
সেও ত ভরায় বক্ষ স্নিগ্ধ করে শ্বাস।
(হে মানুষ জেগে ওঠো : *অভিযাত্রিক*)

২. কেতকীগন্ধা শ্রাবণ নয়, শোণিতগন্ধ বায়ু
তাইতো কেতকী এখনো ফোটেনি, অবসাদে শিরাস্নায়ু।
[আটাত্তরের শ্রাবণ : *মোর যাদুদের সমাধি পরে*]

এরূপ চরণসংখ্যা সমগ্র কাব্যের তুলনায় নগণ্য। শিল্পসফলতার ক্ষেত্রে এরূপ বিচ্যুতি গণ্য নয়। ভাব-ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কারের শৈল্পিক বুননে সুফিয়া কামালের কবিতা বাংলা কাব্যধারাকে করেছে সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গল্প

সুফিয়া কামালের প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ *কেয়ার কাঁটা*। কবি বেনজির আহমদ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন কোলকাতা থেকে ১৯৩৭ সালে। শাহেদ কামাল গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৯৬৮ সালে। *কেয়ার কাঁটা* গল্পগ্রন্থটিতে পনেরোটি গল্প সংকলিত হয়েছে : 'কেয়ার কাঁটা', 'যে নদী মরুপথে হারালো ধারা', 'বিজয়িনী', 'দু'ধারা', 'সত্যিকার', 'যদি ব্যথী না আসিবে', 'সান্ত্বনা', 'বিড়ম্বিত', 'অপমান না অভিমান', 'শামা-পরওয়ানা', 'কমলের ব্যথা', 'সে এক তপস্যা', 'মধ্যবিত্ত', 'সসাগরা', 'নূরজাহান'। '*কেয়ার কাঁটা*' প্রকাশের পর সমসাময়িক 'মাসিক মোহাম্মদী', 'ডেইলি স্টার অব ইন্ডিয়া' ইত্যাদি পত্রিকায় এর সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সুফিয়া কামাল আবাল্য কাটিয়েছেন নানা বাড়ির জমিদারি ঐশ্বর্য এবং রুচিশীল সাহচর্যে। এসময় পিতৃহীন কবি সংসারক্ষেত্রে নারীর অবস্থা-অবস্থান, ত্যাগ ও সংযমবোধের সঙ্গে পরিচিত হন। আশৈশব অর্জিত সেই শিক্ষারই প্রতিফলন ঘটেছে *কেয়ার কাঁটা* গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোতে।

কেয়ার কাঁটা

'*কেয়ার কাঁটা*' গল্পটিতে এক বিভ্রান্ত স্বামীর সাময়িক স্খলন এবং পরিশেষে দাম্পত্যধর্মে প্রত্যাবর্তনের ইতিকথা মনোময় ও গীতময় অনুষঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। গল্পে দেখা যায়– প্রবাসী স্বামী পাঁচ বছর পর দেশে ফিরে এসেছেন। পাঁচ বছর আগে কিশোরী-স্ত্রী ভানুকে তার মামাতো বোনের তত্ত্বাবধানে রেখে গিয়েছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন পর ফিরে এসে ভানুকে কাছে পেয়ে তিনি মুগ্ধ ও সুখী। তার ভাবনা সুফিয়া কামাল উপস্থাপন করেছেন এভাবে :

> যাকে গেছলাম রেখে সলজ্জা কুণ্ঠিতা কিশোরী, তাকে এসে পেয়েছি– সৌভাগ্য গর্বে গর্বিতা, তন্বী, সুন্দরী রাণীর মতো মহিমময়ীরূপে। ও যেন আমার দুঃখের দুয়ারে সান্ত্বনা। প্রবাসের জটিল পথ-রেখা আমায় কত রূপে পথভ্রান্ত করতে চেয়েছে, কিন্তুও কাজল আঁখির কোমল দৃষ্টির আলোক চকিতে আমায় সাবধান করে দিয়েছে ধ্রুবতারার উজ্জ্বল আলো দিয়ে।[১]

স্ত্রীর গুণমুগ্ধ এই স্বামী প্রবাসজীবনের কোনো একসময় হয়ে পড়েন দিগভ্রান্ত এবং এই ভ্রান্তির কথা স্ত্রীর কাছে লেখা শেষ চিঠিতে জানিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। স্বামী দেশে ফিরে এলে স্ত্রী সে অপরাধের বৃত্তান্ত জানতে চায়। স্ত্রীর নিকট অপরাধ স্বীকার করার পূর্বে স্বামীর মনোভাবনা রূপায়িত হয়েছে এভাবে :

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯৫

> মুহূর্তে আমার মনের স্বপ্ন ডুবে গেল। তার তাপসীর মতো মুখের দিকে চেয়ে আমার অপরাধের বোঝা আরো ভারী হয়ে উঠল। তন্বী কোমলা এক নারী–তার কাছে আমার পৌরুষ যে, ধুলায় মিশে যেতে চাইল। কিন্তু ওর দৃষ্টির কাছে যেন কিছুই লুকানো যায় না।[১]

অপরাধের বোঝা নামিয়ে হালকা হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে স্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেয় যে, 'পাপকে হয়তো ঘৃণা করবো, কিন্তু পাপীকে নয়'। স্বামী তখন তার বন্ধু-ভগিনী লুসীর সাথে তার প্রণয়-কাহিনি বর্ণনা করে। প্রবাসে আত্মীয়-বান্ধবহীন পরিবেশে বন্ধুর মা ও বোনের আন্তরিকতায় স্বামী অর্থাৎ গল্পের নায়ক বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এক পর্যায়ে বন্ধুর বোন লুসীর প্রেম-প্রার্থনায় সাড়া দেয় নায়ক। লুসী প্রণয়-প্রার্থনা করে এভাবে-

> সত্যি সত্যি তুমি এই হতভাগিনী নারীকে একটু দয়া করে ভালোবাস। বল, সত্যি বল–ভুল হলেও বল–আমার জীবন মূহূর্তের ভুলে সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠুক।[২]

লুসীর প্রেমে সাড়া দেবার মূহূর্তটি নায়ক তাঁর স্ত্রীর কাছে উপস্থাপন করেন এভাবে :

> বিশ্বাস কর তুমি ভানু ! সেই মূহূর্তটি শুধু তোমায় ভুললুম, আমি সব ভুললুম। শুধু রইলুম আমি আর এক বঞ্চিত ব্যথাতুরা আমার ভালোবাসা-ভিখারিণী নারী! আমি নত হয়ে ওর তৃষিত অধরে আমার মুখ রেখে তাকে বললুম 'হাঁ লুসী, তোমায় দিলুম আমাকে ভালোবাসার অধিকার।' সে বালিকার মতো উল্লসিতা হয়ে আমার বুকে মাথা রেখে তৃপ্তির হাসি হাসলে।[৩]

প্রবাসের সেই পরিবেশে নায়কের এই ভালোবাসায় ইতি ঘটায় বন্ধু আনোয়ার কর্তৃক প্রেরিত স্ত্রী ভানুর গল্প-কবিতা। স্ত্রীর লেখাগুলো পেয়ে স্বামীর অপরাধের বোঝা ভারি হয়ে ওঠে। অন্যদিকে লুসীর প্রত্যাশা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। এরূপ দ্বন্দ্বপূর্ণ মানসিকতায় নায়কের বিবেক-বোধ জাগ্রত হয় : 'আমি চমকে উঠলুম! একসঙ্গে দুজনকে ঠকিয়েছি। আমি ভণ্ড প্রতারক, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই।' এইরূপ বিপর্যস্ত মানসিকতায় আত্মহত্যার পথ থেকে নায়ককে ফিরিয়ে এনে সঠিক পথের নির্দেশনা দেয় স্ত্রী-ভানুর একটি গল্প। গল্পে উল্লেখিত বিশেষ চরণটি ছিলো এরকম : 'পৃথিবীর দুঃখ হতে বাঁচতে আত্মহত্যা করে যে, সে কাপুরুষ।' অতঃপর নায়ক তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লুসীকে সকল সত্য প্রকাশ করে। নায়ক বিবাহিত জেনে লুসীও তাকে প্রত্যাখ্যান করে। নায়কের ক্ষমা প্রার্থনার জবাবে লুসী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়–

> আমি নিজে যেচে তোমায় ভালোবেসে ছিলাম কিন্তু তুমি বিবাহিত এ কথা কেন গোপন করলে? আজ তবে বিদায়! তোমায় ক্ষমা করব সেদিন, যেদিন তোমায় ভুলব। পারি ত চিঠি লিখে জানাব।[৪]

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯৫
[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯৭
[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯৭
[৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯৮

এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করে নায়িকা ভানুও প্রকাশ করে তার জীবনে সংঘটিত ঘটনা। স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামী-বন্ধু আনোয়ার তাকে প্রেম নিবেদন করে প্রণয়প্রার্থীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু নায়িকা তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করে, এবং বন্ধু হিসেবে তাকে গ্রহণ করে। বৈরিতায় নয় বন্ধুত্বেই এর সমাধান ঘটে। গল্পে নায়িকার আত্মভাবনা প্রকাশিত হয়েছে এভাবে :

> ভাবো একবার, এক নারী তার জীবনের প্রথম যৌবনের এক বসন্তে ব্যর্থ বিরহ-নিশি যাপন করছে, আর তারই পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে এক তরুণ তার প্রাণের পেয়ালার প্রীতি সুধারস অধরের আগে এনে নিবেদন করছে? তোমরা পুরুষরা হলে কি করতে আমি জানি না, কিন্তু নারী নরকে নিরাশ করলে না, প্রতিদানও দিলে না; তাকে দিলে আপন জয়ের গরবে বন্ধুর পদ। নারীর পুরুষ-বন্ধু শুনে অনেক নীতিবিদেরা চঞ্চল হয়ে উঠবেন জানি, কিন্তু সে নারী সত্যই বন্ধু-পদে বরণ করে এক অন্ধ দিকভোলা নরের প্রাণ বাঁচালো। যে সুরা সে হাতে ধরে এনেছিল, অবহেলায় সে সুরা তার কণ্ঠে বিষ হয়ে তার বুক অবধি দগ্ধ করে দিত। নারীর হাতের স্পর্শে সে রস অমৃত হয়ে তাকে স্নিগ্ধ করে দিল।[১]

ভানু পতি-বন্ধু আনোয়ারকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে প্রত্যুত্তরে আনোয়ারও তাকে উপহারস্বরূপ প্রদান করে কেয়ার ফুল। ভানু তা গ্রহণ করে এবং মন্তব্য করে যে, 'এ শুধু মুগ্ধ পূজারীর ভক্তিভরা পূজার পবিত্রতা। এতে কি কোন দোষ আছে বল ত তুমি'? ভানুর মন্তব্যে সমর্থন জানিয়ে স্বামী বলে, 'নায়িকার মনের ভাব আমি জানিনে, তা বলতে পারি না। কিন্তু নায়ক যা করলে এ ঠিকই করেছে। এতে দোষ নেই কিছুই'। স্বামী যখন জানতে পারে যে, তার বন্ধু আনোয়ারই তার স্ত্রীর প্রণয়প্রার্থী তখন সে বেদনাবোধ করে। 'খচ করে আমার বুকে বিঁধল ভানুর কথার সেই কেয়ার কাঁটা।' কিন্তু সে বেদনা ক্ষমার প্রলেপে স্নিগ্ধ হয়ে যায় যখন লুসীর চিঠিতে জানতে পারে যে, লুসী তাকে (নায়ককে) ক্ষমা করে দিয়েছে। নারীত্বের পূর্ণ মহিমা প্রকাশ করেছেন সুফিয়া কামাল লুসীর পত্রাংশে–

> তোমায় ভুলতে পারব কিনা জানিনা, কিন্তু ক্ষমা করতে পেরেছি। তোমার স্ত্রীকে সব বল,... দেশে ফিরে গেছ– অতীত পশ্চাতে ফেলে। তোমরা পুরুষ, চাও বিস্মরণী; আমরা নারী, চাই অতীতকে নিয়ে স্মৃতির বেদনায় তাকে মাধুর্য দিয়ে নব নব কল্পনায় আনন্দ পেতে।[২]

লুসীর চিঠি ভানুকে দেখালে ভানু তার স্বামীকে ক্ষমা করে দেয়। অনুরূপভাবে স্বামীও ভানুকে ক্ষমা করে দিয়ে প্রশংসায় মুখর হয় :

> তোমার ত অপরাধ নেই কিছুই. তুমি কবি– তুমি বিজয়িনী, তোমার একটা হয়ত খেয়াল, একটা ক্ষণিকের কল্পনাকে আরো রঙ দিয়ে আমার কাছে ব্যক্ত করেছ, এর বিচার আমি কী করব![৩]

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪০০

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪০৩

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪০৩

এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে দুটি প্রেমিক সত্তার ক্ষণিক ভ্রান্তির। লুসী সম্পর্কে নায়কের ধারণা যে, 'ও দেশের মেয়েরা অনায়াসে ভুলে যায় তার প্রেমাস্পদকে। এ নিয়ে চিন্তিত হবার কারণ নেই। কিন্তু ভানু নায়কের এই উক্তির প্রতিবাদ করে। নারীর সম্মানহানি সে কিছুতেই মানতে অপারগ। নারীর মর্যাদাবোধে আঘাত করে এমন বক্তব্য নারী মানতে পারে না। এ গল্পে ভানুর দৃষ্টিকোণে সে-সত্যই অভিব্যক্ত–

> ও কথা কী করে বলো তুমি! ওতে নারীর অপমান করা হয়, জান? ওকে তুমি যে বেদনা দিয়ে এসেছ, তার সে বেদনা হয়ত জুড়াবে কিন্তু ঘা সারবে না কোনদিন! ওর চিঠিটা কী করুণ; তুমি বুঝতে পারনি? ... ওর চিঠিখানা তোমাকে শুধু সান্ত্বনা দিয়েছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের দুটি লাইন-
> 'একদিন ফুল দিয়েছিল হায়,
> কাঁটা বিঁধে গেছে তার;
> তবু সুন্দর, হাসিয়া তোমায়
> করিনু নমস্কার!'
> এ হচ্ছে নারীর চিরন্তন কথা। নিজের বেদনায় অপরকে নারী ম্লান করে না।[১]

'কেয়ার কাঁটা' গল্পটিতে মূলত দাম্পত্যধর্মের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। সংসারে সংঘটিত ছোট-ছোট ভ্রান্তির অবসান ঘটিয়ে স্বামী-স্ত্রী নতুন করে নিজেদের আবিষ্কার করবে এবং পারস্পরিক ভালোবাসার অমিয় পরশে সমৃদ্ধ হবে– এ বক্তব্যই উচ্চারিত হয়েছে এ গল্পে।

বিশেষ একটি সময়খণ্ডকে অবলম্বন করে লেখক গল্পটি নির্মাণ করেন। নায়ক-নায়িকার সাময়িক ভ্রান্তি এ গল্পের উপজীব্য বিষয়। জীবনের সমগ্রতা নয়, বিশেষ একটি আবর্তকে কেন্দ্র করে গল্পটি রচিত- যা ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভানু। পার্শ্ব চরিত্রের দৃষ্টিকোণে বর্ণিত গল্পটিতে চরিত্রের সমাবেশ খুব বেশি নেই। বন্ধু আনোয়ার, মামাতো বোন ও বোনের স্বামী, লুসী, লুসীর মা ও ভাই- এ কটি চরিত্রকে অবলম্বন করে গল্পের কাহিনি আবর্তিত। গল্পটির ভাষা বর্ণনাধর্মী ও কবিতাময়। একটি প্রাসঙ্গিক অংশ উল্লেখ করা হলো :

> ... তারপর এল এমনি এক শারদ নিশীথিনী। বনের বুক তখন কেয়ার রেণুতে ছেয়ে গেছে। গন্ধে বিভোর জ্যোৎস্না রাতে সে বেদনা-সৌরভে কুণ্ঠিত পল্লীবালার বুক তখন কাব্যের সুষমায় ভরে উঠেছে। সে তখন কবি। দূর দেশ থেকে তার প্রিয়তম অভিনন্দন পাঠিয়েছেন–আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভরা লিপিতে। তরুণীর বুক তখন পূর্ণ। সে কবি, তার অভাব নেই কোথাও; অপ্রতুলতা নেই কিছুতেই। নিজের মনের সম্রাজ্ঞী সে, কল্পনার কাননে আত্মসমাহিতা। তার যশের সৌরভে কত মুগ্ধ প্রাণের প্রীতি তাকে স্নিগ্ধ করে দিল। প্রবাসী প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে তার প্রাণের সবটুকু সুধারস উচ্ছ্বসিত হয়ে

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪০৩

> ওঠে, সে আপন মনে বললে, ওগো আমার প্রিয়তম, বিরহ বেদনায় আমার প্রাণে যে কাব্য-কুসুম ফুটিয়ে গন্ধ ছড়ালে, সে ত তোমারই দান প্রিয়।[১]

গল্পটিতে নায়ক-নায়িকার সাময়িক ত্রুটিজনিত ঘটনাপ্রবাহ কেয়ার কাঁটার ন্যায় বিঁধে থাকলেও একসময় এর অবসান ঘটে। গল্পের নামকরণ এক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করেছে। 'কেয়ার কাঁটা' গল্পটি সুফিয়া কামালের জীবনমুখী ও সৌন্দর্যপিপাসু হৃদয়বৃত্তির সফল রূপায়ণ।

যে নদী মরুপথে হারালো ধারা

'যে নদী মরুপথে হারালো ধারা' গল্পটি পত্র-আঙ্গিকে রচিত। গল্পের মূল চরিত্র সখিনা বা আফরোজা। সে পত্রমাধ্যমে বান্ধবী শমীমা এবং বান্ধবীর স্বামী মোশতাককে জীবনের ঘটনাবহুল পরিস্থিতির কথা জানায়। গল্পটি মোট চারটি পত্রযোগে রচিত। তিনটি পত্র সখিনার এবং একটি পত্র সখিনার স্বামী আনোয়ার রচিত। তথাকথিত ধর্মীয় প্রথার কঠোরতায় গল্পের নায়িকার জীবন কী দুর্বিষহ বেদনায় আক্রান্ত হয়ে অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে তা এ গল্পে প্রদর্শিত হয়েছে।

বশিরহাট থেকে লেখা প্রথম পত্রখানি নায়িকা সখিনা লিখেছে শমীমাকে। সেই পত্রে সখিনার উচ্চারিত কথামালার মাধ্যমে সুফিয়া কামালের আধুনিক-মনস্কতা, আত্ম-সচেতনতার নিবিড় পরিচয় উপস্থিত। স্বামী পরিত্যক্তা সখিনা বৈরাগ্য বরণ করবে কিনা- এ প্রশ্নের জবাবে প্রকাশ পেয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অবমাননাকর চিত্র। প্রসঙ্গক্রমে উপস্থাপিত হয়েছে নায়িকার মনোভাব, যার মধ্যে মূলত প্রকাশিত হয়েছে সুফিয়া কামালের জীবনদৃষ্টি :

> .... আচ্ছা গুণের গন্ধ আর রূপের কি শব্দ আছে নাকি? তা নইলে অন্তঃপুরবাসিনীদের রূপ গুণের কথায় ভদ্রলোকরা একেবারে চোখে দেখার আগেই-মোহিত হয়ে যান কী করে? ... ভদ্রলোকদের প্রতি আমার করুণা হয়, যাঁরা, আমি স্বামী-পরিত্যক্তা বলে করুণা করে আমাকে গ্রহণ করে ধন্য করতে চান। বেচারারা![২]

পুরুষ কর্তৃক যদি নারী পরিত্যক্তা হতে পারে তবে নারী কর্তৃকও পুরুষ পরিত্যক্ত হতে পারে– এরকম উচ্চারণের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নায়িকার আধুনিক মনস্কতা :

১. আমি আমার স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা! কেন, আমার স্বামী কি আমার দ্বারা পরিত্যক্ত হতে পারেন না? এতে লজ্জা বা গ্লানির কিছু আছে বলে আমি ত মনে করি না।[৩]

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪০১

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪০৪

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪০৪

২. পুরুষ পাপ করুক ভুল করুক সে থাকবে চির-পবিত্র–যেমন নাকি হিন্দুদের গঙ্গা নদী, আর মেয়েরা অত্যাচার উৎপীড়নেও বাধ্য হয়ে যদিও সামান্যভাবে প্রতিবাদ করে তবুও তার নাম থাকবে দাগী হয়ে। কাজেই যতদিন না পুরুষের মত্ততা কমবে কোন নারীরই সুমাতা বা পত্নী হওয়ার আশা বিড়ম্বনা মাত্র। পুরুষ করে চলেছে যুগে যুগে তার মদমত্ত ক্ষমতা প্রকাশের পাপ, আর নারী করেছে বুকের রক্ত দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত। এই ধারা যেদিন বদল হবে– নারীর মর্যাদা পুরুষ যেদিন বুঝবে- ঘরে ঘরে সেদিন আদর্শ মাতা পত্নীর অভাব হবে না। বর্তমানে ফরমাস দিয়েও তাকে তৈরি করা যাবে না।[১]

বিবাহ-বিচ্ছেদের যৌক্তিকতা নিরুপণে নায়িকার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে এভাবে–

> আমার ভুল তিনি [স্বামী] ক্ষমা করতে পারবেন না, তাঁর ভুল আমি ভুলতে পারব না, অথচ একসঙ্গে চিরজীবন কাটাতে হবে তার চেয়ে কি এই ভালো নয়? আর শরায়ও তালাকের বিধান এই অবস্থায় দেওয়া হয়েছে।[২]

জৈবিক ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবৃত্তি প্রসঙ্গে সখিনার মনোভাব স্পষ্ট ও যুক্তিনির্ভর। পত্রে শমীমার বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে তার অভিমতের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে লেখকের মনোভাব :

> প্রথমেই বলেছি, ফ্রয়েডবাদী বা ইডিপাস-কমপেক্সবাদী মেয়ে আমি নই, তবুও দেহের দাবী মানি। কিন্তু যার জীবনে একবার দেহের কারবার হয়ে গেছে তার আর সে দাবী না করাই সঙ্গত। তুমি বলবে, তোমার দাবী মিটেছে বলে যে তোমাকে চায় সে কী ভিখারী ভুখা তোমার দুয়ারে উপোসী দাঁড়িয়ে কাল কাটাবে? আমি বলি– না, তার উপবাসী থাকার দরকার নেই। ক্ষুধাতুরকে দিয়ে জগতে কোন কাজ হয় না। সে আপন ক্ষুধা প্রশমিত করুক, তারপর সে তার প্রেমের শ্রমে ফলাক ধরার বুকে পবিত্র ফুলের ফসল। তার আত্মাকে শান্ত করুক তৃষার সময় সুশীতল বারি দিয়ে, তারপর বুনে যাক তার প্রীতি দিয়ে সোনালী স্বপনের জাল। তখন তাতে তার শ্রান্তি বোধ হবে না, তাকে ক্লান্তিতে ক্লিষ্ট করবে না। তার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার বারি তার ঘরে যদি জমা থাকে, শ্রমে তাকে তখন কাতর করবে না, ধরণীর ভাণ্ডারে জমা দিতে তার শক্তি অবসন্ন হবে না। দুনিয়ায় ক্ষুধাও আছে তৃষাও আছে, ক্ষুধা ও তৃষা এক বস্তুতে মিটে না, সে তুমি জানো। ক্ষুধা দেশ পাত্র রুচি অনুসারে ভাতে, পোলাওয়ে, রুটী তরকারিতে মিটান যায়, কিন্তু তৃষ্ণা সেই একই বস্তুতে, সকল দেশের, সকল যুগের, সকল লোকেরা মিটিয়ে আসছে– সেই বারি। তাই দেহের ক্ষুধা ভিন্ন যে মনের তৃষ্ণা মিটায়- সে প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা– তাকে দেহের দাবীতে না আনলেও চলে।[৩]

দ্বিতীয় পত্রটি সখিনা লিখেছে কোলকাতা থেকে, শমীমার স্বামী মোশতাককে উদ্দেশ্য করে। এ-পত্রে জানা যায়, সখিনা নওয়াব বাহাদুরের বেগমের পার্শ্ব-চারিকা বা প্রধান পরিচারিকারূপে কর্মরত। কারণ সখিনা তার পিতার সংসারে 'বরে'র মতো আদরণীয়া ছিল সত্য, কিন্তু পিতৃ-বিয়োগের পর নিজেকে 'বোঝা' স্বরূপ বিবেচনা করে খাওয়া-পরার সংস্থান নিজেই করে নেয়।

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪০৬

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪০৫

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪০৬-০৭

সখিনার আত্মসম্মানবোধই জীবিকা-নির্বাহের পথে তাকে তাড়িত করে। তার সে বোধের প্রকাশ নিম্নোক্ত বর্ণনাংশে লক্ষণীয় :

> কারণ অনুগ্রহের দান নিতে আমার কুণ্ঠা হয়। তিক্ত হয়ে উঠে তাদের অতি আদরের দেওয়া দানের মাধুর্য। ... একজন সম্মানিতা নওয়াব বেগমের পার্শ্ব-চারিকা অথবা প্রধানা পরিচারিকা হয়ে আছি। উপস্থিত অনুগ্রহের বোঝা থেকে নিস্কৃতি পেয়েও অন্ততঃ নিষ্কর্মা মোসাহেব নই, ভেবে মনটাও অত্যন্ত আরামেই আছে।[১]

তৃতীয় পত্রটি শমীমার ভাই আনোয়ার লিখেছে শমীমার স্বামী মোশতাককে। কোম্পানীর চাকরিসূত্রে রাজপুতানায় এসে সেখানেই একটি হোটেলে আনোয়ার তার ভূতপূর্ব-স্ত্রী সখিনা ওরফে আফরোজার দেখা পায়। আফরোজা নামটি আনোয়ারের মায়ের পীর সাহেবের দেয়া নাম। সখিনাকে আবিষ্কার করার পর মূহূর্তেই আনোয়ার ওর সঙ্গলাভের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। নওয়াব সাহেব শিকারে যাওয়ার পথে গাড়িতে ত্রুটি দেখা দিলে তিনি হোটেলে ওঠেন, এবং সে-সূত্রেই সখিনার সঙ্গে তার অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ ঘটে। আনোয়ার নওয়াব কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে একসঙ্গে আহার গ্রহণ করে। এখানেই নানা অজুহাতে দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপচারিতায় তাদের হৃত ভালোবাসা পুনর্জাত হয়ে ওঠে। দীর্ঘ ছ-বছর পর প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হবে– এমন আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত আনোয়ার মোশতাককে উদ্দেশ্য করে বলে–

> ... মূঢ় আমি, মূর্খ আমি, কি জানি কোন দুর্মতি কখন হবে। কোথায় যেন আশঙ্কা জাগছে এক এক বার কখন আবার ও চলে যাবে চিরদিনের জন্য। ওর করুণার দানে পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়ে আছি, বেদনারও অন্ত নেই আনন্দেরও সীমা নেই। সবহারা হয়ে অথচ তাকে অন্তরে অন্তরে লক্ষ্মীরূপে পেয়ে আজ ধন্য, পূর্ণ। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে, আশা সুমধুর ইঙ্গিতে যেন আরো কি দিবে বলে আশা দিচ্ছে– দেখি কি পাই।[২]

চতুর্থ চিঠিটি বান্ধবী শমীমাকে লিখেছে সখিনা। এ চিঠিটিই গল্পের পরিণতি টেনে দেয়। সখিনা মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আনোয়ারকে পুনর্বার বিয়ে করে স্বামী হিসেবে পাবার বাসনা থাকলেও তা মেনে নিতে পারেনি সখিনা কেবল ধর্মীয় অনুশাসনের ন্যাক্কারজনক পন্থার জন্য। 'হিলা' নামক প্রথাকে গ্রহণ করতে অপারগ সখিনা। স্বামীর সাথে মিলনে ধর্ম তাই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কেননা সখিনার কাছে ধর্মীয় এই বিধান গ্রহণযোগ্য নয়। সুফিয়া কামাল সখিনার উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ধর্মের এই অপবিধান প্রত্যাখ্যানের অঙ্গীকারই যেন ব্যক্ত করেছেন :

> মোশতাকের চিঠি পেলুম– উনি আমাকে আবার ফিরে পেতে চান পরম আগ্রহে। জানি আমি তা, কিন্তু তার কি উপায় আছে? যে পর্যন্ত আমি আবার অন্য স্বামী গ্রহণ না করি আর আবার তার কাছ থেকে তালাক না নেই ভাবতেও শরীর আমার ঘৃণায় শিউরে উঠলো– ছিঃ যার স্ত্রী ছিলুম সে ত্যাগ

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪১০
[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪১৬

> করেছে, তাকে আবার পেতে হলে অন্য একজনের স্ত্রী হয়ে আবার তাকে তালাক করে আবার একে গ্রহণ করা। তুমি নারী শমী ! তুমিও কি শিউরে উঠছ না? কী ঘৃণা–দারুণ ঘৃণা। কিন্তু পুরুষের যে ক্ষুধা জেগেছে তার কাছে তখন সকলই সহজ সম্ভব। আমি পারলুম না। অগত্যাই হল আমাকে তাকে আঘাত দিয়ে ফেরাতে– সে যে কত কঠিন, কত কঠোর পরীক্ষা আমার।[১]

স্বামীকে গ্রহণ করতে অপারগ সখিনা তার জীবনটা নওয়াব মহলের পার্শ্বচারিকা রূপেই যাপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেখানেও তার ঠাঁই হয় না। লোভাতুর নওয়াব সাহেবের বাসনালোলুপ দৃষ্টির কাছে নতি স্বীকার করতে পারেনি সখিনা :

> কিন্তু এরই মধ্যে একদিন অকস্মাৎ নওয়াব সাহেবের চোখে দেখলুম যে দৃষ্টি সে দৃষ্টি– পুরুষের চোখের-চাওয়া নারী বুঝতে পারে। আমি আতঙ্কে আশঙ্কায় সেখান থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করলুম কিন্তু কোথায় যাব? তোমার কথা খুবই মনে পড়ছিল– কিন্তু না, দুর্ভাগ্যের ছায়া আমার তোমার সৌভাগ্য-উজ্জ্বল সংসারে ফেলতে প্রবৃত্তি হল না। আমার দুরদৃষ্টকে আমি ভয় করতে শিখেছি– আঘাত দিতে শিখেছি।[২]

পূর্বস্বামী আনোয়ারকে প্রত্যাখ্যান করায় সে সখিনার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং যোগাযোগ বন্ধ করে। সখিনা মৃত্যুশয্যায় শমীমাকে প্রেরিত পত্রে স্বামীকে দেখার বাসনা ব্যক্ত করে– যদিও সে জানে যে, এ বাসনা তার অপূর্ণই থাকবে। তবুও সখিনা অপেক্ষা করে সেই চরম ক্ষণটির জন্য :

> মনভরে উঠেছে অজানা সুখের স্বাদে, লোভ নেই, ক্ষোভ নেই, সকল প্রিয়ের চাইতে প্রিয়তর প্রিয়তমকে অন্তরে যে নিবিড় মধুর করে পেলাম– সে এবার আমাকে দিবে বিশ্রাম দিবে শান্তি। সতের বছরের মধুর স্বপ্ন আমার আজ সাতাশ বছরে যেন মৃত্যুর রূপ ধরে এসেছে। তারই পরম প্রশান্তি নিয়ে আনোয়ারকে একবার দেখে যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে কোথায় সে? তাকে একবার খবর দিয়ো, মৃত্যু যেন শিয়রে বসে আছে আমার আশায়– আমি তোমাদের আশা করছি।[৩]

গল্পটিতে চরিত্রের সমাবেশ প্রয়োজনানুযায়ী হয়েছে। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র সখিনা। দুটি চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পটি রচিত। সখিনা ও আনোয়ারের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে রচিত গল্পটিতে ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

বিজয়ী

'বিজয়ী' গল্পে প্রতিকূল সমাজব্যবস্থায় এক নারীর সংযমী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণ বিত্তহীন পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও মাসুমা বিত্তশালী কাসেমের বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে ধরা দেয়নি।। নির্মল, নিষ্কলঙ্ক প্রেম-সাধনায় নিয়োজিত মাসুমা অবশেষে আর্তজনগণের সেবার

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪১৭
[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪১৭-৪১৮
[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪১৭-৪১৮

মধ্য দিয়েই জীবনের পূর্ণ সার্থকতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। সুফিয়া কামাল তাঁর জীবনাভিজ্ঞতার আলোকে মানবধর্মের প্রকৃত মাহাত্ম্যকে উপলব্ধি করেছেন এবং সেই উপলব্ধ-জ্ঞানকে রূপায়িত করেছেন 'বিজয়িনী' গল্পে।

সদরের এস-ডি-ও আসমত আলী নদীতীরে ভ্রমণ করতে গিয়ে বাল্য বন্ধু কাসেমকে অসুস্থাবস্থায় দেখতে পান। বাড়িতে এনে শুশ্রূষার ভার বোন মাসুমার ওপর অর্পণ করলে কাসেম মাসুমাকে দেখে শিউরে ওঠে। কারণ মাসুমার সন্ধানেই কাসেম উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে অবশেষে এখানে এসেছে। সেবা-যত্নের মাধ্যমে কাসেম অনেকটা সুস্থ হলে বন্ধু আসমতকে সে তার জীবন-কাহিনি বর্ণনা করে। কোলকাতায় গৃহ প্রবেশ উপলক্ষে পাবনা থেকে দূরসম্পর্কের আত্মীয় সাত বছরের মাসুমা তার বাবার সঙ্গে কাসেমদের বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে বেড়াতে এলে মাসুমাকে ভালো লেগে যায় কাসেমের। মাসুমাকে জীবনসাথী করার ইচ্ছে অপূর্ণ থেকে যায় কাসেমের পিতার আপত্তির কারণে। ধনীর দুলালী আসমাকে বিয়ে করে দাম্পত্যধর্ম যাপনের চেষ্টা করেছিল কাসেম, কিন্তু একদিন হঠাৎ মাসুমার স্বামী আবু আলী মাসুমার সম্পত্তি বিভাজনের কাজে কাসেমের নিকট উপস্থিত হয়। সেই সুবাদে অনেকদিন পর মাসুমাকে দেখার কৌতূহল নিয়ে কাসেম উপস্থিত হয় মাসুমার বাসায়। অনেকদিন পর মাসুমাকে দেখে কাসেম মুগ্ধ হয়। মুগ্ধতার সেই আবেশকে সুফিয়া কামাল উপস্থাপন করেন এভাবে :

> ক্রমেই আমি মাসুমার ব্যবহারে অবাক হতে লাগলুম। সাধারণ একটি গেয়ো মেয়ে সেই কবেকার দেখা। আমার সঙ্গে সহজ আনন্দের ভাবটুকু আমাকে শুধু মুগ্ধ করলে না, লুব্ধও করলে।[১]

দুই পরিবারের সম্পর্ক আন্তরিকতায় পরিণত হয়। কাসেম ক্রমশ মাসুমার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে মাসুমার স্বামী আবু আলী মারা গেলে কাসেম মাসুমার সার্বিক দায়িত্ব নিতে উদগ্রীব হয়ে পড়ে। কিন্তু মাসুমা কাসেমকে প্রত্যাখ্যান করে। মাসুমার প্রতি কাসেম প্রণয়াসক্ত– এ-তথ্য অবগত হয়ে কাসেমকে ত্যাগ করে আসমা পিত্রালয়ে অবস্থান নেয়। কাসেমের শ্বশুরপক্ষ মাসুমার বিয়ে অন্যত্র দেয়ার ব্যবস্থা করতে চাইলে কাসেম আপত্তি জানিয়ে বলে যে, মাসুমার সঙ্গে তার দেবরের সম্পর্ক রয়েছে। কাসেমের কাছ থেকে এই অযাচিত অপবাদ প্রাপ্ত হয়ে মাসুমা বাধ্য হয় বাড়ি থেকে ওকে তাড়িয়ে দিতে। যদিও কাসেম জানতো যে মাসুমা নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র। অপ্রাপ্তির দহন কাসেমকে অন্ধ করে দিয়েছিল। অবশেষে নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে মাসুমাদের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে সে জানতে পারে যে, ওরা কোলকাতা থেকে চলে গেছে, তবে কোথায় গেছে তা জানা হয় না কাসেমের। প্রেমাস্পদকে হারিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত কাসেম ছুটে বেড়ায় সর্বত্র। খোঁজ মেলে না। অবশেষে পূর্ববঙ্গে মাসুমার মামার

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪২৫

বাড়ি– এ সূত্র ধরেই সে বন্ধুর বাড়িতে মাসুমার দেখা পায়। আসমত জানায় যে মাসুমা তার আপন বোন নয়। ওর ওস্তাদের কন্যা। কাসেমের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আসমতের মামাবাড়ি উপস্থিত হলে আসমত মাসুমাকে নিজের বোনের মর্যাদায় বাড়িতে আশ্রয় দেয়। সেই হতেই মাসুমা দীন দুঃখী-আর্তজনের সেবায় নিয়োজিত। কাসেম মাসুমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে মনো-যন্ত্রণা প্রশমিত করে। ক্ষমার মাহাত্ম্যে পরিসমাপ্তি ঘটে গল্পটির।

গল্পটিতে মানবধর্মের জয় রূপায়িত হয়েছে। শরতের শান্ত-স্নিগ্ধ সৌম্য রূপের সাযুজ্যে এ গল্পের নায়ক নায়িকার অন্তরকে সমীকৃত করেছেন সুফিয়া কামাল। ক্ষমার মাহাত্ম্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে নায়ক-নায়িকার অন্তরে, অবসান হয়েছে সকল বৈরিতার। রস পরিণামের দিক থেকে গল্পটি মিলনাত্মক, তবে এ মিলন পবিত্রতার অনবদ্য মহিমায় উদ্ভাসিত।

দুধারা

সুফিয়া কামাল 'দুধারা' গল্পটিতে মানবমনের অপ্রাপ্তিজনিত বেদনাবোধ উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন। গল্পটির সূচনা শ্রাবণ ঋতুকে আশ্রয় করে। পরিণতিতে শ্রাবণের বিষাদময় আঝোর ধারার ইঙ্গিতময় রূপায়ণ পরিলক্ষিত গল্পটিতে।

মোমতাজ ইসলামিয়া কলেজের শিক্ষক। ভগ্নি আমেনা এবং ভগ্নিপতি ওয়াজেদের সংসারে তার অবস্থান। আমেনা-ওয়াজেদের অনুরোধ রক্ষা করে ওয়াজেদের বোন মনুয়রাজাহাঁ ওরফে মনুকে বিবাহ করা সম্ভব হয়না মোমতাজের পক্ষে। কেননা মোমতাজ তার বন্ধু-ভগিনী আসিয়াকে ভালোবাসে। কিন্তু আজ আসিয়া মৃত। মাত্র আঠারো দিনের জ্বরে ভূগে মোমতাজের সকল আশার প্রদীপকে নির্বাপিত করে মৃত্যুপুরীতে পাড়ি জমিয়েছে সে। ভালোবাসার সেই স্মৃতিকে অবলম্বন করেই মমতাজ বেঁচে থাকতে চায়। তাই সে উপেক্ষা করে মনুর সঙ্গে তার বিবাহ প্রস্তাব। একসময় মনুর বিবাহ উপলক্ষে সপরিবার কোলকাতায় আসেন ওয়াজেদের পিতামাতা। মনুর সঙ্গে পরিচয় ঘটে মোমতাজের। মনুর রূপসৌন্দর্য এবং তার সঙ্গে আলাপচারিতায় মুগ্ধ হয় মোমতাজ এবং উপলব্ধি করে যে মনুর মতো ঐশ্বর্যকে অবহেলায় দূরে ঠেলে দেওয়াটা তার পক্ষে ভুল হয়েছে। আসিয়ার যে স্মৃতিকে আশ্রয় করে সে বাঁচতে চায় সে স্মৃতি আজ ম্লান এবং ধূসর। কিন্তু জীবনের দাবি সজীব-উচ্ছলময় প্রাণ–যা মনুর মাঝে প্রত্যক্ষ করে মোমতাজ। কিন্তু যে মনুকে একসময় ইচ্ছে করলেই সে অর্জন করতে সক্ষম হতো, তাকে শত চেষ্টায়ও আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ সে এখন অন্যের স্ত্রী। মূলত অবহেলায় মনুকে জীবনধর্মে না-পাওয়ার ব্যর্থতা এবং আসিয়াকে হারানোর স্মৃতি– এ দুধারার সমবায়ে সম্পন্ন হয় দু'ধারা গল্প।

গল্পটির চরিত্র চিত্রণে সুফিয়া কামাল নিপুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কেবল বিশেষ কোনো চরিত্র নয়, সব চরিত্রের হৃদয়াবেগ স্বল্প পরিসরে বর্ণিত হয়েছে এখানে। তবে মোমতাজের

হৃদয়াবেগই মুখ্য হয়ে উঠেছে গল্পটিতে। সুফিয়া কামালের শৈল্পিক পরিচর্যায় সুন্দর ও কাব্যময় হয়ে উঠেছে গল্পের কোনো কোনো এলাকা। যেমন :

> মোমতাজ শিহরিয়া উঠিল, এতদিন এত কাছে এত নিকটে ছিল, কিন্তু সে ত কই চাহিয়া দেখে নাই। আজ পরের চিরদিনের জন্য পরের। এ কী হইল তার? আসিয়া, আসিয়া? কিন্তু আসিয়ার যে মূর্তি আজ মনের কোণে ভাসিয়া উঠিল, সে নিতান্তই ম্লান দীনতায় কুণ্ঠাভরা। তার পাশে মনুর ছবি ভাসিয়া উঠিল– জীবনের সাথীরূপে সৌন্দর্যেগুণে গরিমায় মহিমায় অপরূপ অদ্ভুত। ... দুহাতে বুক চাপিয়া সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। মুদ্রিত নেত্রপ্রাপ্ত হইতে গণ্ড বাহিয়া দুটি ধারা নামিয়া আসিল। মৃতা আসিয়ার প্রতি করুণায় ও দূর দুরান্তের পথে যাহাকে সে নিজেই ঠেলিয়া দিয়াছে সেই মনুয়রের প্রতি প্রেমে প্রীতিতে![১]

সুফিয়া কামাল মানবমনের আর্তিকে উন্মোচন করেছেন দু'ধারা গল্পে। মনুয়রের সজীব, সপ্রাণ নারীসত্তা কীভাবে- মোমতাজের বোধ-উপলব্ধির জগতকে প্রভাবিত করেছে তা এ-গল্পে বিশ্বাসযোগ্য করে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন লেখক। গল্পটির আঙ্গিক-কাঠামো নির্মাণে সুফিয়া কামালের সাফল্য প্রশংসার দাবি রাখে।

সত্যিকার

সুফিয়া কামাল তাঁর গল্পের নামকরণ নিজেই করেছেন। তবে ক্ষেত্র বিশেষে বাদ পড়ে গেলে সে গল্পগুলের নামকরণ সংশিষ্ট-সম্পাদক নির্বাচন করতেন। 'সত্যিকার' গল্পটির নামকরণ সুফিয়া কামাল করেননি; করেছেন খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন। সমাজে অস্পৃশ্য-অবহেলিত একজন নারীকে মানবীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত করে গল্পটির কাহিনি নির্মাণ করেন সুফিয়া কামাল। সমাজ পরিবেশের বৈরীপ্রবাহে, নিয়তির করালগ্রাসে মানুষ সঠিক অবস্থানে স্থিত হতে না পেরে শৈবালের মতো অপাঙক্তেয় হয়ে ভেসে বেড়ায়। অবস্থান যা-ই হোক, মানবীয় গুণাবলির মাধুর্যে, ভালোবাসার স্বর্গীয় আলোয় সেই মানুষটিও যে তার আলোয় সমাজকে আলোকিত করবার শক্তি অর্জন করে, সে সত্যই রূপায়িত হয়েছে গল্পটিতে। এক্ষেত্রে সুফিয়া কামালের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় সুস্পষ্ট। গল্পের নায়িকা সারা একজন রূপজীবিনী। পত্র-আঙ্গিকে রচিত গল্পটিতে বন্ধু নসিমকে পত্রমাধ্যমে ভালোবাসার কাহিনী বর্ণনা করে আযম। সারাকে ভালোবাসার কারণেই বন্ধু-ভগিনী জোবেদাকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে পালিয়ে আসে আযম। একসময় ডাক্তার আযম রুগ্ণ সারাকে দেখতে গিয়ে ভালোবেসে জীবন সাথীরূপে পাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করলে সারা আপত্তি জানিয়ে দূরে ঠেলে দেয় তাকে। ব্যথাহত মন নিয়ে আযম চাকরি সূত্রে অন্যত্র বদলী হয় এবং একসময় অসুস্থ হয়ে পড়লে সারা তার

[১] *সুফিয়া কামাল রচনা সংগ্রহ: প্রথম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৪২

সেবার ভার গ্রহণ করে। বাইশ দিনের সেবায় আযম সুস্থ হয়ে উঠলে সারা তার আপন অবস্থানে চলে যায়। নদীর দুতীরের মতো দুজন দুস্থানে অবস্থান করলেও পরস্পরের প্রতি অটুট থাকে তাদের প্রেম। ভালোবাসার বৈচিত্র্যময় প্রকাশ লক্ষণীয় গল্পটিতে।

চরিত্র-চিত্রণে সুফিয়া কামালের বাস্তববোধের স্বাক্ষর বিদ্যমান। সারা চরিত্রটি দৃঢ়চেতা, ব্যক্তিত্বমণ্ডিত এবং স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। তার চারিত্রিক মহিমার প্রকাশ নিম্নোক্ত বর্ণনাংশে প্রতিফলিত :

> তুমি মহৎ দাতা সন্দেহ নেই, কিন্তু সে দানের ভার বইবার যোগ্যতা কই? সব জেনে শুনেও তুমি চাইছ আমায়। কিন্তু আমি বলছি না– তাই অভিমানে মুখ ফিরিয়ে তুমি চলে গেছ। কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখো আজ তোমার আমার ভালোবাসায় কোনবাধা কেউ দিতে পারবে না। এতে কোন বিভ্রাট নেই কিন্তু আমাদের পরে যারা আসতো, আমাদের ভঙ্গুর আনন্দের পরে তাদের জীবন হত বিষাক্ত। নয় কি?–আমি ভালো মেয়ে নই– আমার রক্তের ঋণ আমাদের সন্তানরা শোধ করত বুকের রক্ত দিয়ে। সে কি ভীষণ! ভাবতেও আমার ভাল লাগে না। তোমার ভালোবাসায় সব অভাব আমার ঘুচে গেছে। কিন্তু তুমি রইলে বঞ্চিত এই ধরণীর ভোগসম্ভার হতে– হয়ত আমাকে নিয়ে তুমি তৃপ্তি পেতে– কিন্তু একটি ব্যর্থ জীবনের মূল্যে যদি একটি বংশের সর্বনাশের পথ বন্ধ হয়– আমি বলছি তাও ভালো।[১]

মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতে বিপর্যস্ত নায়ক-নায়িকা অবশেষে ভিন্ন অবস্থানে ভালোবাসার পূর্ণ মহিমা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। তাদের প্রেম পবিত্র ও নিষ্কলুষ মহিমায় উত্তীর্ণ। গল্পের বিষয় নির্বাচনে সুফিয়া কামালের রোমান্টিক শিল্পবোধের পরিচয় সুপ্রত্যক্ষ। সামান্য একজন রূপজীবিনীর মানবতা, সাহসিকতা, সেবাপরায়ণতা ও শুশ্রূষাময় জীবনবোধের উজ্জ্বল পরিচয় বিধৃত হয়েছে এ গল্পটিতে। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ শামসুল হকের উক্তি উল্লেখযোগ্য :

> অবরোধ তিনি ভেঙ্গেছেন শুধু বোরকার নয়– নারীর প্রতি আরোপিত সকল মানবিক অবরোধও তিনি চূর্ণ করেছেন যেমন আপন জীবনে, তেমনি তাঁর চেতনাস্পৃষ্ট প্রতিটি নারীর জীবনেও।[২]

'সত্যিকার' গল্পের চরিত্র বিশেষত, নারী-চরিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে লেখকের জীবনপ্রবাহের ছায়াপাত ঘটেছে। কেননা 'কেয়ার কাঁটা' গ্রন্থটি রচনকালে সুফিয়া কামাল অতিবাহিত করছিলেন জীবনের চরম সংকটময় মূহূর্ত। স্বামী নেহাল হোসেনের মৃত্যু-পরবর্তী দীর্ঘ আট বছর সম্পর্কে সুফিয়া কামালের ভাষ্য:

> ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ যে কী পর্যন্ত সর্পিল সংঘাত সংগ্রামময় জীবন ধারা বয়ে চলেছি দুঃস্বপ্নের মতো।[৩]

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫৩

[২] জাতীয় শোক প্রস্তাব, উদ্ধৃত, সৈয়দ শামসুল হক (সম্পা.) *জননী সাহসিকা বেগম সুফিয়া কামাল* : শেষ প্রণতি, প্রথম প্রকাশ, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা ২০০০, পৃষ্ঠা-১৬

[৩] *ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, সুফিয়া কামাল*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩০

সেই চরম সংকটময় মুহূর্তে বেনজীর আহমদ গল্পগ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

> কঠোর সামাজিক বিধি নিষেধ, চরম অর্থনৈতিক সংকট সব মিলিয়ে যখন অবস্থা চরম আকার ধারণ করে সুফিয়ার ব্যক্তি ও সাহিত্য জীবনের অপমৃত্যুর সূচক ধ্বনি বাজতে থাকে তখন পর পর দুটি গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করে বেনজীর আহমদ সুফিয়াকে দান করেছিলেন নতুন জীবন।[১]

সুফিয়া কামাল তাঁর যাপিত জীবনে বারবার প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি হয়েছেন, সেই সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন নারীর জীবনযাত্রা তাঁর সমাজে বড়ো বেশি বন্ধুর। তাঁর সৎ সাহসী ও নির্ভীক সত্তার ছায়াপাত ঘটেছে *কেয়ার কাঁটা* গল্পগ্রন্থের চরিত্রগুলোতে। 'সত্যিকার' গল্পের নায়িকা সারা সমাজের চোখে ঘৃণ্য অবহেলিত, একা ও নিঃসঙ্গ। প্রেমিক আযম তাকে সম্মান ও মর্যাদায় আসীন করতে চাইলেও সারা জানে সমাজ-শাসনের প্রথায় একসময় তাকে নিগৃহীত হতে হবে। সেজন্যই সে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নায়কের জীবনকে বিষময় করে তুলতে চায়নি; বরং অবস্থান করেছে দূরে। চারিত্রিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল সারা পাঠকের শ্রদ্ধা অর্জনের দাবিদার– সুফিয়া কামালের সার্থক সৃষ্টি। নায়ক আযমও ব্যক্তিক মহিমায় উদ্ভাসিত। সুফিয়া কামাল এই চরিত্র-চিত্রণেও মহানুভবতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন :

> কিন্তু ওকে যাই বলে তোমরা জানো- আমার গৃহলক্ষ্মী হবার যোগ্যতা ওর কোনো মেয়ের চাইতে কম নয় বরং বেশিই; কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আজ তার যোগ্যতা বুঝবার তার নিজেরই সাধ্য নেই।[২]

গল্পের বিষয়ানুসার প্রকরণ-পরিচর্যায় সুফিয়া কামাল সিদ্ধহস্ত। গল্পটির ভাষা কাব্যময়। উপযুক্ত শব্দশৈলীর সমবায়ে নির্মিত গল্পের বুনন-কাঠামো দৃঢ়। এর ভাষা প্রাঞ্জল :

> জীবনে মানুষের একটা সময় আসে তখন তার যা কিছু সবই হয়ে ওঠে দুর্বার, অদম্য। সমস্ত দুনিয়া একদিকে আর নিজের মত একদিকে– এত শক্তিমান, এত অপরাজেয় সে নিজেকে মনে করে। তখন বুঝি তার ইঙ্গিত আকাশ বাতাস নিয়ন্ত্রিত করতে পারে– সমস্ত জগতে তার আসন আবৃত করে সে বিজয়ী হয়ে জানতে চায়– আমি আছি, আমার শক্তি আছে, আমার সাধ্য কতখানি দেখো ...[৩]

বিষয় ও প্রকরণে গল্পটি শিল্পরূপময় করে উপস্থাপন করেছেন সুফিয়া কামাল।

যদি ব্যথী না আসিবে

কেন্দ্রীয় চরিত্রের দৃষ্টিকোণে গল্পটি রচিত। জনৈক নার্সকে অবলম্বন করে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বর্ণনা করেছে তার ট্রাজিক জীবনবৃত্তান্ত। অচেনা পরিবেশে বন্দী নায়িকা মানসিক-ব্যাধিতে আক্রান্ত। এই ব্যাধির নেপথ্যে ক্রিয়াশীল পরিবারের লালিত সংস্কার ও জীবনাচার। নায়িকা ভালোবেসে যাকে হৃদয়ে গ্রহণ করে সংসারী হতে চেয়েছিল তাকে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়

---

[১] *ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, সুফিয়া কামাল*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬

[২] *সুফিয়া কামাল রচনা সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫১

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫০

পিতার আদেশে। অতঃপর পিতা তাকে অর্পণ করেছিলেন যার কাছে, সে নিরুদ্দেশ হয়ে কোথায় অবস্থান করছে তা কেউ জানে না। এমতাবস্থায় কন্যাকে অনৈতিক প্রণয়েচ্ছা থেকে রক্ষা করতে কঠোর হলেন পিতা, এবং তাড়িয়ে দিলেন প্রণয়প্রার্থী নায়ককে। যার পরিপ্রেক্ষিতে নায়িকা মানসিক অতৃপ্তি ও অস্বস্তিতে সমর্পিত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থতার প্রয়াস চালালেও নায়িকার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে থাকে নায়কের প্রস্থানদৃশ্য। তার একমাত্র প্রত্যাশা– একদিন তার প্রেমাস্পদ কাছে ফিরে আসবে। এই নিষ্ফল প্রতীক্ষার পরিণামে নায়িকা মানসিকভাবে হয়ে পড়ে অসুস্থ।

গল্পটির স্বল্প পরিসরে সুফিয়া কামালের আধুনিক জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে। এক্ষেত্রে একজন কন্যা-সন্তানের প্রতি রক্ষণশীল পরিবারের বৈরী মনোভাবের প্রত্যক্ষ প্রভাব কীরূপ ভয়ানক হতে পারে তার বাস্তব স্বাক্ষর মুদ্রিত হয়েছে।

প্রথাগত সামাজিক বন্ধন যে নারীকে মানুষরূপে মূল্যায়ন করে না তার সুস্পষ্ট প্রমাণ নায়িকার উক্তিতে পরিস্ফুটিত হয়েছে। সমাজব্যবস্থার প্রতি তার ব্যঙ্গোক্তিও লক্ষণীয় :

> বাবা, আমি তোমারই মেয়ে– সতী মায়ের মেয়ে আমি। তোমার অধিকার আছে আমাকে দান করতে, রাখতে, মারতে– যা ইচ্ছে তাই করতে।[১]

পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারী অসহায়। সে তার স্বীয় ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে বাস্তবায়ন করতে অপারগ। সে কেবলই প্রচলিত সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার ক্রীড়নক। এই বিরূপতার প্রতি নায়িকার র্ভৎসনা প্রকাশ পেয়েছে নিম্নোক্ত জবানিতে :

> আমি তো তাদেরই–তাদেরই রক্ত আমারও শিরায়, শিরায় তাদের যত্নে আদরে স্নেহে লালিতা! খোদার দেওয়া দান তার মানুষের বিধানে এই জীবন তো মাত্র তাদেরই অধিকার...।[২]

কন্যার ওপর পিতার অধিকার একচ্ছত্র । কন্যার সামান্যতম শক্তিও নেই স্বীয় মতামতকে প্রকাশ করার। পুরুষতান্ত্রিক আবেষ্টনীতে নারীর একমাত্র পরিচয় হচ্ছে– সে পিতার কন্যা, স্বামীর স্ত্রী কিংবা পুত্রের মাতা। সুফিয়া কামাল নারীর অবস্থানকে নির্ণয় করেছেন পুরুষতন্ত্রের এক প্রতিনিধির জবানিতে :

> তুমি আমার মেয়ে– এই মাত্র তোমার পরিচয়। তুমি আমার তাই তোমাকে আমি দান করেছি বহুপূর্বে, তুমি উৎসর্গিত- তা তুমি জানো। আমার সেই দান তুমি প্রত্যাহার করে নিজেকে অন্যের হাতে সমর্পণ করতে পারো?[৩]

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫৯

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫৮

গল্পটির বিষয় নির্বাচনে সুফিয়া কামালের সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের প্রারম্ভে নায়িকার অগোছালো সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যায় :

> ভয়, বড্ড ভয় আমার– এখন কারুর কথা না রাখা। আজ রাতটুকু তুমি যে কাছে থাকবে সেই জন্যই তোমার কথা রাখলুম। সেও তো শুধু তার কথা রাখলাম না বলেই না অভিমানে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।[১]

গল্পটিতে প্রকৃতির অনুষঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে নায়িকার মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া :

> কত দিন পর ও বললে : 'আমি তোমায় চাই' ... । কি করে বললে কি করে বললে জানো ? যে সুরে আকাশের সাথে ধরণী কথা কয়, ফুলের সাথে চাঁদ কথা কয়, বর্ষা চৈত্রের প্রান্তরে আশ্বাস দেয় সে শব্দহীন ভাষায়, সেই সুরে ... ।[২]

'যদি ব্যথী না আসিবে' গল্পটি বিষয়বৈচিত্র্যে ও প্রকরণে সুফিয়া কামালের সার্থক সৃষ্টি।

সান্ত্বনা

'সান্ত্বনা' গল্পটি আমেনা নাম্নী এক নারী চরিত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আশা-হতাশা, আনন্দ-বেদনার জীবনকথা। কৈশোর-উত্তীর্ণ যুবতী আমেনা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় মতিনের সাথে। সুখময় দাম্পত্যধর্ম পালনে মগ্ন দুজন। আমেনার সান্নিধ্যলাভের জন্য প্রায়ই অফিস ফাঁকি দিয়ে বাড়ি চলে আসে মতিন। তাদের সংসারে এখন পাঁচ জন সন্তান। সন্তানের পরিচর্যায় ব্যস্ত আমেনা ক্রমশ হারিয়ে ফেলে মতিনের মনোযোগ, ভালোবাসা আবেগ-উচ্ছ্বাস। এবং একসময় আবিষ্কার করে তার ম্লান দীপ্তিহীন চেহারা :

> সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে আর একবার ভালো করিয়া নিজের মুখখানা দেখিতে লাগিল। প্রাণ হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কই– যৌবনের সে দীপ্তি, সে লাবণ্য আজ কোথায়। নিজের রক্তের বিনিময়ে আজ সে পাঁচটি সন্তানের মাতা। তাহার মুখ আজ তাই বিবর্ণ, মাথায় সিঁথির উপরে টাক পড়িয়াছে, চোখের কোণে কালি ধরিয়াছে। গালের সে নিটোল সৌন্দর্য আর নাই– তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। না– আজ আর তাহার কোন সম্বল নাই– সে সবর্স্ব লুণ্ঠিতা - রিক্তা- সর্বহারা।[৩]

হতশ্রী আমেনা একসময় উপলব্ধি করে তার সন্তানের মধ্যে মতিনের প্রতিচ্ছায়া। সন্তানের মধ্যেই তার জীবনের সার্থকতা সে প্রত্যক্ষ করে। এই সার্থকতা ও সান্ত্বনার মধ্য দিয়েই গল্পটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫৭
[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫৭
[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৬৪

সুফিয়া কামাল গল্পের বিষয়-বিচারে প্রাধান্য দিয়েছেন নারীর অন্তর্জাত আবেগ, উচ্ছ্বাস ও জীবনকথনকে। সময়ের পরিবর্তনে মানবমনের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা যে ভিন্ন মাত্রা পায়, তা এ গল্পের সীমিত পরিসরে অভিব্যক্ত হয়েছে। গল্পাটিতে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে। চরিত্রচিত্রণে বাস্তবমুখী সুফিয়া কামাল। প্রতিটি চরিত্রই গতানুগতিক ও স্বাভাবিক। 'সময়' এখানে প্রধান চরিত্র হিসেবে গল্পের গতিপথ নির্ণয় করেছে। এক্ষেত্রে লেখকের প্রয়োগ কৌশল লক্ষণীয় :

> সেই মতিন ও আমেনা, দীর্ঘ দশ বৎসরের ঝড় ঝাপটা কাটাইয়া ভরা সংসারের সকল সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া পথ করিয়া এই আজিকার দিনটিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।[১]

প্রকৃতি ব্যবহৃত হয়েছে আমেনা-মতিনের আবেগঘন মানসক্রিয়ার উপস্থাপনে :

> সারা বিশ্বে ফাগুন আসিয়া আগুন জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে। তাহার জানালার পাশের বহুদিনের ঝরাপাতা গাছটিরও বুক সকলের অজ্ঞাতে যেন কখন কচি সবুজ পাতায় ছাইয়া গিয়াছে। তাহার শাখা প্রশাখা পুলক-বিহ্বল-রঙ-বেরঙের অসংখ্য পাখির কলকাকলিতে ভরিয়া উঠিয়াছে।[২]

বিষয় বিচারে গল্পটি গুরুত্ববহ। প্রাকরণিক বিশ্লেষণে এটি ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যবাহী। গল্পটি সুফিয়া কামালের অভিজ্ঞ জীবনদৃষ্টির আলোকে উজ্জ্বল।

বিড়ম্বিত

সুফিয়া কামাল 'বিড়ম্বিত' গল্পটিতে সীমার মাঝে অসীমের উপলব্ধিজাত বেদনাবোধকে চিহ্নিত করেছেন। কাঙ্ক্ষিতের জন্য লালায়িত মানবমন একসময় কী অপার বেদনায় সমর্পিত হয় তা এ-গল্পের প্রতিপাদ্য। গল্পে দেখা যায়–বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার হামিদ চাকরিসূত্রে পার্বত্য প্রদেশে অবস্থানকালে তার বন্ধু দানেশ অসুস্থ স্ত্রী মালেকা এবং তার মাকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। এই আগমনের মূল কারণ অসুস্থ মালেকার সুস্থতার জন্য বায়ুপরিবর্তন। তিন মাস পর মালেকা সুস্থ হয় এবং দানেশ পরিবারসহ প্রস্থান করে। হামিদের বাড়িতে অবস্থানকালে দানেশ- মালেকার সুখী দাম্পত্যজীবন দেখে প্রীত হয় হামিদ এবং সিদ্ধান্ত নেয়–বিয়ে করে দাম্পত্য জীবন যাপন করবে। অবশেষে বোনের অনুরোধে সে বিবাহ করে হাসিনাকে। কিন্তু হাসিনাকে বিয়ে করে হামিদ তৃপ্ত হয় না। কারণ সে মালেকার মতো উচ্ছল-উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত, লাবণ্যময়ী নারী নয়। সে বড়ো বেশি নিরুত্তাপ। তবুও সে প্রচেষ্টা চালায় হাসিনাকে দাম্পত্য লীলায় জাগিয়ে তুলতে, কিন্তু পরিণামে ব্যর্থতাই সম্বল হয়। অনুজ্জ্বল,

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খন্ড*,প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৬২

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৬১

নিস্প্রভ হাসিনা নিরেট জড়-বস্তুর মতো আচরণ করে। তার মধ্যে নেই আবেগ, উচ্ছ্বাস, ভালোবাসা। হামিদ বার বার আহত হয় এবং অন্তরে আরো তীব্রভাবে জেগে ওঠে দানেশ-মালেকার আনন্দোচ্ছল মুখচ্ছবি। অবশেষে একদিন হামিদ জানতে পারে হাসিনার জীবনকথা। বাল্যবেলায় হাসিনা গুরুতর অসুস্থ হয়ে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়। সেজন্যে সে এখনও নিজ বুদ্ধি-আবেগ দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। কেবল অনুকরণ করে চলতে পারে। সত্যটা জানার পর হামিদ আরো ব্যাপক বেদনাবোধে আক্রান্ত হয়। এসময় দানেশের পত্রে মালেকার পুনরায় অসুস্থতার খবর পেয়ে মালেকাকে স্ত্রীসহ দেখতে যায় হামিদ। সেখানে অবস্থানকালে মালেকার মাধ্যমে জানা যায় হাসিনা অন্তঃসত্ত্বা। একসময় পুত্রসন্তান লাভ করলেও অন্তর্জগতে হামিদ থেকে যায় একা। এই পরিস্থিতিতে সে দানেশের চিঠিতে মালেকার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কষ্টের প্লাবনে নিমজ্জিত হয়। তার কেবলই মনে হয় সে একাকী, কী এক অভিশাপে যেন তার জীবন বিড়ম্বিত।

গল্পটির বিষয় উপস্থাপনের মাধ্যমে সুফিয়া কামাল মূলত মানুষমাত্রই যে একা ও নিঃস্ব, জাগতিক কোনো বৈভবই যে সে নিঃস্বতাকে উৎপাটিত করতে অপারগ–সে চরম সত্যকেই উন্মোচন করেছেন। দূরের সৌন্দর্যের জন্য মানবমন চিরকালই লালায়িত, নিকট-সৌন্দর্যে মন পূর্ণতা পায় না। হামিদ নিকট রূপের নিকট সমর্পিত হয়ে আত্মসুখ খুঁজে পেতে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছে। কারণ যার নিকট সে প্রেম-ভিক্ষা করছে সে নারীর প্রেম বোঝার ক্ষমতা নেই। গ্রহণেরও ক্ষমতা নেই। তাই বঞ্চিত বিড়ম্বিত হামিদের পিয়াসী-মন চেতনে-অবচেতনে মালেকাকেই কামনা করেছে।

গল্পটিতে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে। চরিত্র-চিত্রণে লেখকের পরিমিতিবোধ লক্ষণীয়। মালেকা চরিত্র উজ্জ্বল-স্নিগ্ধ, মনোগ্রাহী। তার মৃত্যু পাঠক-হৃদয়ে কষ্টের অনুভব জাগায়।

বিষয় ও প্রকরণগত দিক থেকে গল্পটি অনবদ্য। যাপিত জীবনপ্রবাহে অপ্রত্যাশিত বিড়ম্বনার শিকার হয় মানবমন। এ গল্পে জীবনের এক বিচিত্র সত্যের রূপাঙ্কন করেছেন সুফিয়া কামাল। গল্পটি লেখকের প্রয়োগ-নিপুণতায় উজ্জ্বল ও সার্থক। গল্পের নায়ক হামিদ পিতৃত্বের স্বাদ দিয়ে জীবনকে পূর্ণভাবে উপভোগ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যা সঙ্গত নয়। এই প্রাপ্তিকে অবহেলা করে লোকান্তরিত বন্ধু-পত্নী মালেকার জন্য তার হাহাকার অবাস্তব। তবুও প্রকরণ কৌশলে গল্পটি সুন্দর ও সার্থক।

অপমান না অভিমান

অবয়বগত দিক থেকে গল্পটি ক্ষুদ্রাকার। এখানে বর্ণনার আতিশয্য নেই, ঘটনার ঘনঘটা নেই। বিশেষ একটি সময়কে কেন্দ্র করে গল্পটি রচিত। মানুষ সময়ের নিকট পরাজিত- এই সত্যটি প্রতিবিম্বিত হয়েছে গল্পটিতে।

গল্পের নায়ক খ্যাতিমান অ্যাডভোকেট মিঃ এ, আমিন। তার সুসজ্জিত বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় তার প্রাক্তন প্রেমিকা, একসময়ের ছাত্রী শিরী। শিরীর আগমনে আমিন তুষ্ট হয় না। শিরীর দৈন্যরূপ তার বর্তমান পরিবেশে বেমানান। এই দৈন্যরূপকে সুফিয়া কামাল অঙ্কন করেছেন এভাবে :

> গাড়ি থেকে যে নামল তারও দেহে যেন দৈন্যের অন্ত নেই। উদ্বেগ আশঙ্কায় বিবর্ণ পাণ্ডুর তার মুখ, ভীত, ত্রস্ত ব্যাকুল তার চোখের চাউনি।[১]

আগমনের কারণ জানতে চাইলে শিরী প্রত্যুত্তর করে যে, সে তার স্ত্রীকে দেখার বাসনা নিয়েই এসেছে। আমিন জানায় যে, তার স্ত্রী বাসায় নেই এবং তাদের দেখা হোক তা সে চায় না। তাদের আলাপচারিতায় উন্মুক্ত হয় দুজনের সম্পর্কের স্বরূপ। অতীতে আমিন একান্তরূপে কামনা করেছিল শিরীকে। জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পাওয়ার তীব্র বাসনা থাকলেও শিরীর আত্মীয়রা বংশগৌরব ও আভিজাত্যের অহমিকায় দরিদ্র শিক্ষক আমিনের নিকট শিরীকে সমর্পণ করেনি। শিরী-আমিন পরস্পরকে ভালোবাসলেও এই প্রতিবন্ধকতার কাছে তারা ছিল অসহায়। আমিন তখন প্রত্যাখ্যাত হয়ে ক্ষুব্ধচিত্তে অন্য মেয়েকে বিয়ে করে সংসারী হয় এবং যথারীতি সংসারধর্ম পালন করতে থাকে। কিন্তু শিরী ভালোবাসার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে একাকী নিঃস্ব জীবন কাটায়। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে শিরী আমিনের বাড়িতে দেখা করতে এলে আমিন অনেকটা তাচ্ছিল্যভরে তাকে বসার অনুমতি দেয় এবং প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে দেয় তাকে প্রত্যাখ্যান করার সেই জ্বালা আজো তার অন্তরে জ্বলছে। শিরীর আগমন সে প্রত্যাশা করে না এবং শিরী যেন তাকে ভুলে যায় এবং সুখী হওয়ার চেষ্টা করে। আমিন শিরীকে বিদায় জানিয়ে শ্বশুরালয়ে স্ত্রীর উদ্দেশে যাত্রা করে। অপমানিত শিরী ব্যথাহত চিত্তে বাড়ি চলে যায়। এভাবেই গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটে।

গল্পের চরিত্র সংখ্যা স্বল্প। কেবল নায়ক ও নায়িকার উপস্থিতি লক্ষণীয়। নায়িকা শিরী জীবনযুদ্ধে পরাজিত, পরাজিত সময়ের কাছে। সে ভালোবাসার অন্ধ আবেগে আমিনের কাছে ছুটে এসে অপমানিত হয়েছে, বুঝতে সক্ষম হয়নি যে, তার প্রেমাস্পদ সময়ের স্রোতে পরিবর্তিত একজন। অন্য নারীকে গ্রহণ করে সে সুখী দাম্পত্য ধর্মে স্থিত। তবুও শিরী-চরিত্রটি

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৭৪

প্রেমের অনন্য মহিমায় উজ্জ্বল ও সার্থক। আমিন সময়ের সহজ ধারাকে স্বীকার করে নিয়েছে। সংসারব্রত গ্রহণ করে জীবনকে সাজিয়ে নিয়েছে সে। লেখক বাস্তববাদী হিসেবে আমিনকে অঙ্কন করেছেন সার্থকরূপে।

নারী-হৃদয়ের অমলিন ভালোবাসার ঔজ্জ্বল্যে গল্পটি বিশেষ মাত্রার দাবিদার ; বিষয় ও প্রকরণে সার্থক ও সুন্দর।

শামা-পরওয়ানা

'শামা-পরওয়ানা' একটি রূপকাশ্রিত গল্প। সুফিয়া কামালের শৈল্পিক-দক্ষতার পরিচয়বাহী এ গল্পে জীবনসত্য স্ফটিকাকারে প্রতিবিম্বিত। অসাধারণ নিপুণতায় তিনি এ গল্পটি রচনা করেছেন।

গল্পের বিষয় প্রেম ও বিরহ। চরিত্র শামা অর্থাৎ দীপশিখা এবং ক্ষুদ্র পতঙ্গ। গল্পের নামকরণে প্রকটিত হয় শামার 'পরওয়ানা' অর্থাৎ 'দীপের লিখিত আদেশ'। একটি দীপের হৃদয়-কথন বর্ণিত হয়েছে এ-গল্পে। প্রজ্বলিত দীপশিখা উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। শিখাটি কাঁচের আবরণে আবৃত। তারই চারপাশে ক্ষুদ্রকায় এক পতঙ্গ ঘুরে মরছে সে শিখাতে আত্মাহুতি দেয়ার বাসনায়। এ শিখা মূলত প্রেমের বহ্নিশিখা। পতঙ্গরূপ প্রেমিকসত্তা সে শিখাকেই কামনা করে। প্রেমিকসত্তার অনুনয়–শিখা যেন তার আবরণ ঘুচিয়ে তাকে বক্ষে ধারণ করে। কিন্তু শিখার সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রটি লেখকের বর্ণনায় অঙ্কিত হয় এভাবে :

> কী করে ঘোচাব আমার আবরণ, এইটুকুই যে সীমারেখা আমার।[১]

প্রেমোন্মত্ত পতঙ্গ বাধা ডিঙাতে ব্যর্থ। কণ্ঠে তার মিনতি :

> জ্বলে ওঠো তুমি আরো দীপ্ত হয়ে তোমার এই আচরণ আপনিই টুটে যাবে। তোমার সাথে মিলনের মূহূর্তে বিলম্ব যে আমার কাছে কতখানি অসহ্য তা তো জানো। শীঘ্র ঘুচাও ওই বাধা।[২]

দীপ-শিখা পতঙ্গকে কাছে আসতে বাধা দিলেও একসময় পতঙ্গ সে আবরণকে ভেদ করে সমর্পণ করে নিজেকে দীপ শিখার কাছে এবং সে মৃত্যু-বেদনা বুকে ধারণ করে অবশেষে স্থিরতায় সমর্পিত হয়।

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৭৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৭৮

গল্পটিতে সুফিয়া কামাল মূলত প্রেম এবং প্রেমসত্তার রূপকে দীপশিখা এবং পতঙ্গকে রূপায়ণ করেছেন। প্রেমের কাছে সমর্পিত হয়ে নিঃশেষ হলেও প্রেমসত্তা সার্থকতা অর্জন করে। এই বক্তব্যই লেখক আভাসিত করেন পতঙ্গ-সত্তার প্রেক্ষণ বিন্দু থেকে :

> জানি জানি, তবু মিনতি করে বলছি আমায় ঠাঁই দাও তোমার বুকে। তোমার ওই রূপের দীপ্তি আমার অন্তরে এসে পৌঁচেছে। তোমায় ভালোবাসি, তোমার বুকে ঠাঁই নিয়ে এ দেহ নিঃশেষ করে দিলেই আমার তৃপ্তি।[১]

প্রেম হচ্ছে সেই অধরা-অসীম-অপার্থিব সত্তা, যে স্বয়ং পরাজিত তার আপন রূপের কাছে। রূপকার্থে শামা বা দীপশিখার উচ্চারিত কথামালায় সে সত্যকে রূপায়িত করেছেন লেখক :

> আমি যে নিজেই জ্বলছি, আমি জ্বলবোই, বন্ধু। আমার রূপের আগুনে কত-জনা না পুড়ে মরলো–জানো না ত কত জ্বালা আমার এ বুকে; তোমরা জানো পুড়িয়ে মেরেই আমার সুখ; তা নয়, বন্ধু। নিজে জ্বলে অপরকেও জ্বালিয়ে যে কী বেদনা– কেউ বোঝে না ত তা![২]

রূপের প্রভায় অসহায় প্রেমিক সত্তারূপ পতঙ্গ। মৃত্যু আসন্ন জেনেও ঝাঁপিয়ে পড়ার আকুতিকে লেখক বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> আমি বুঝতে চাইনে, বুঝতে পারিনে; আমি শুধু চাই আমার ঠাঁই হোক তোমার ওই বুকে। কী সুন্দর-ভীষণ তোমার ওই শিখার দীপ্তি।[৩]

প্রেম অনির্বাণ শিখায় অপার বেদনাকে ধারণ করে জ্বলতে থাকে। তার শাশ্বত রূপের বহিঃপ্রকাশ সুফিয়া কামালের লেখনিতে উন্মোচিত হয়েছে :

> মরলে বন্ধু ! পুড়ে মরবার তৃপ্তি রইল তোমার, বেদনায় কালো হলো আমার বুকে! সবাইকে ঠাঁই দিই এ বুকে, কিন্তু আমার ঠাঁই হলো না কারো বুকে। এই বঞ্চিত ব্যথায় চাপাকান্না আমার দেখা দেয় নিশীথ গগনে আর বনের বুকে সিয়াহ্ কালি রূপে।[৪]

প্রেমানলে পুড়ে মরার জাগতিক দৃষ্টান্তকে রূপকাবরণে উপস্থাপনের দক্ষতা সুফিয়া কামালের অপরিসীম। গল্পটিতে সে স্বাক্ষর বিদ্যমান। দুটো চরিত্র দীপ ও পতঙ্গের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য নিরূপণ লেখকের মেধা ও প্রজ্ঞার সাফল্য বহন করে। বিষয়ের অসাধারণত্বে গল্পটি বাংলা কথা সাহিত্যের ধারায় উজ্জ্বল।

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৭৯
[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৭৯
[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৭৮
[৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৭৯

কমলের ব্যথা

'কমলের ব্যথা' গল্পটি 'শামা-পরওয়ানা'র মতোই। এ গল্পেও শাশ্বত ও চিরন্তন প্রেমকেই নির্বাচিত করেছেন সুফিয়া কামাল। লেখকের দৃষ্টিতে প্রেম পবিত্র ও এর আবেদন চিরন্তন। জাগতিক চাওয়া-পাওয়ার সীমায় প্রেমকে উপলব্ধি করা যায় না। বিরহবোধের মধ্যেই সার্থকতা অর্জন করে প্রেম; গল্পটিতে সে–সত্যকেই ব্যঞ্জিত করতে সক্ষম হয়েছেন সুফিয়া কামাল।

নীল সরোবরে অবস্থিত পদ্ম-কুঁড়িকে পদ্ম- মা তরুণ অরুণের নিকট সমর্পিত হতে বললে পদ্মকুঁড়ি লাজ-রক্তিম হয়ে আপত্তি জানায়। পদ্ম-মা তখন পদ্মকুঁড়িকে স্মরণ করায় তার জন্মের উদ্দেশ্য। লেখকের বর্ণনায় তা উল্লেখ্য :

> তোমার শুধু জন্ম নেবার সময়টুকুই আমার বুকে থাকবার অধিকার মা, তার পরে যে তুমি অরুণেরই। তার প্রতি ধরণীর আরতি তোমারই সৌরভে সৌন্দর্যে বিকশিত করে পূর্ণ করে দাও।[১]

মায়ের অনুরোধে পদ্মকুঁড়ি অরুণকে দেখতে পায়, এবং উপলব্ধি করে অরুণ দুয়ারে দাঁড়িয়ে পদ্মকুঁড়ির প্রতীক্ষায়। মুহূর্তে পদ্মকুঁড়ির ভয় দূর হয় এবং নিজেকে সমর্পণের উদ্দেশে পাপড়ি মেলে ধরে নিবেদন করে প্রেমার্ঘ্য। পদ্মকুঁড়ির দৃষ্টিকোণ থেকে লেখকের বর্ণনা :

> মুহূর্তে পদ্মের লজ্জা ভয় দূর হয়ে গেল, মনে হল এই তার স্বপ্নে পাওয়া প্রিয়তম, এরই প্রতীক্ষায় সে ছিল, এরই জন্য তার জন্ম, এরই তরে তার বিকাশ আশা। আনন্দে আগ্রহে সে বিকশিত হয়ে উঠলো– একের পর এক মর্মের দল মেলে সে অরুণের প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করে দিলো।[২]

পদ্মকুঁড়ি অধীর আগ্রহে অরুণের সঙ্গ কামনা করলেও দূরত্ব তাদের মিলনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পদ্মের মধু-সৌরভ লুটে নেয় ভ্রমর এবং মলয়। অরুণ একসময় অস্তপারে চলে যায়। বেদনায় আচ্ছন্ন পদ্মকে দেখে সহানুভূতি জানায় সন্ধ্যা, সান্ত্বনা দিয়ে বলে :

> এত রূপ, এত গন্ধ নিয়ে রবির চোখের আগে ফুটলে কেন ভাই?[৩]

সন্ধ্যার প্রশ্নের নিকট দীনতা প্রকাশ না করে পদ্ম তার সার্থকতার ইতিবৃত্তই বর্ণনা করে :

> সেও আমার সার্থকতা সখী! আমি ফুটি, লোকে কয় এ আমার বিলাস। কিন্তু কেন যে ফুটি তা কি আমিই জানি! পাঁকের বুকে আমার জন্ম, পাঁকেই লয়– তবু ওই যে রাজভিখারীর ক্ষণিকের খেয়ালী

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৭৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৭৯

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৮০

> দৃষ্টিতে তীব্র জ্যোতির পরশ আমার অঙ্গে অঙ্গে লাগে, আমার স্নিগ্ধতা দিয়ে তাকে তৃপ্ত করি– এ ত আমার বিলাস নয়, এ আমার সার্থকতা।[১]

পদ্মের পরিতৃপ্ত অভিজ্ঞানকে সমর্থন জানিয়ে তার বেদনাকে স্মরণীয় ও চিরন্তন করবার অভিপ্রায়ে সন্ধ্যা এই বলে প্রতিশ্রুতি দেয় যে–

> তোমার আত্মদানের ছবি আমার বুকে জাগবে- নিত্য অন্তক্ষণে ধরার মানব মনেও এই করুণতার ছায়াপাত হবে অ-জানা বেদনার রূপে নিত্য এমনি সময়ে। আজ তবে বিদায় ![২]

সন্ধ্যা বিদায় নেয়, সূর্যও ঢলে পড়ে। পদ্ম হতাশায় সখী সরোবরের বুকে ঢলে পড়ে। 'পুষ্পহীন বৃন্ত ক্ষোভে জলের তলে আত্মগোপন করলে!'– বেদনাময় উচ্চারণের মাধ্যমেই গল্পটির সমাপ্তি ঘটে।

এ গল্পে চরিত্রের সমাবেশ স্বল্প– পদ্ম, অরুণ, সন্ধ্যা ও পদ্ম-মা। মূলত পদ্মের বেদনাদীর্ণ হৃদয়ে প্রেমের সার্থকতা নিরূপিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় চরিত্র পদ্ম। অন্যান্য চরিত্র কেন্দ্রীয়-চরিত্রের প্রয়োজনে নির্মিত। 'পদ্ম' ও অরুণ- দুই প্রেমিক সত্তা। পদ্ম উজ্জ্বল ও সার্থক। অরুণ দূরে অবস্থানরত প্রেমিকসত্তা– পদ্মের অর্ঘ গ্রহণ করে তার গতিপথে সে অগ্রসরমান। বিরহ-বেদনা-শোক-তাপের উর্ধ্বে সে অবস্থান করে। সে পরিচয় গল্পটিতে অনুপস্থিত। অপূর্ণতা, অপ্রাপ্তির হতাশা কেবল পদ্মের। সুফিয়া কামাল কবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের যক্ষ-প্রিয়ার আকুতির মতোই পদ্মের আকুতি রূপায়ণ করেছেন।

নারী-হৃদয়ের প্রেমঘন নিবিড় আনন্দ ও বেদনাবোধকে সার্থকভাবে চিত্রিত করেছেন পদ্মের আবেগ-উচ্ছ্বাসের মাধ্যমে। প্রেমের পরিণতি বিরহ–বিরহবোধের অনুপম গল্প 'কমলের ব্যথা'।

বিষয়ের বৈচিত্র্যে, বর্ণনভঙ্গিমায়, ভাষার কারুকার্যে, গল্পটি অপরূপ।

সে এক তপস্যা

'সে এক তপস্যা' গল্পটিতে একজন উচ্চশিক্ষিত নারীর হৃদয়কথা উপস্থাপিত হয়েছে। গল্পটি 'যদি ব্যথী না আসিবে' গল্পের অনুরূপ। ভিন্নতা কেবল নায়িকার মনোজাগতিক পরিবর্তনে। গল্পটিতে বিধৃত হয়েছে লেখকের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহিষ্ণু নারী হৃদয়ের প্রসঙ্গ।

লুল ওরফে বদরুল লায়লা ওরফে মিস খান বি এ পাশ করে নিজ উদ্যোগে গড়ে তোলে মেয়েদের বোর্ডিং হাউজ। সেক্রেটারি পদে অধিষ্ঠিত লুলু ছোটভাইয়ের স্ত্রীর বোন

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৮০
[২] প্রাগুক্ত

জয়নাবকে কাজের সহযোগী করে নেয়। জয়নাব বিধবা। বিয়ের জন্য পুনরায় আত্মীয়রা উদ্যোগী হলে লুলু নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে ওকে বোর্ডিং হাউজের কাজে নিয়োগ করে। লুলু একা, নিঃসঙ্গ জীবন কাটায়, কর্মের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। যদিও অনেকেই বিশেষত, তার ভাবীর ভাইও তাকে জীবনসঙ্গীরূপে গ্রহণ করতে চায়। কিন্তু লুলু কাউকেই গ্রহণ করতে রাজি হয় না। লুলু ভালোবাসে তার ভ্রাতৃবন্ধু শওকতকে। শওকত শিক্ষিত, সুদর্শন, এবং লুলুর উপযুক্ত পাত্র; এই ভেবে লুলুর ভাইয়েরা পিতা প্রফেসর আহাদ আলীর সম্মতি প্রার্থনা করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে জানিয়ে দেন :

> 'তার (শওকতের) অন্যান্য জাতি গোত্ররা এখনও তাহারই দেশে চাষ বাস করিয়া কাল কাটাইতেছে। এ অবস্থায় শওকত লাট সাহেব হইলেও তাহার হাতে তিনি মেয়ে দেবেন না।[১]

এমতাবস্থায় লুলু প্রতিশ্রুতি দেয় যে, সে কখনো পিতার অবাধ্য হবে না, বরং শওকতকে ত্যাগ করবে। শওকত লুলুর কাছে পানি গ্রহণের প্রস্তাব দিলে সে চিঠিতে তার অপারগতার কথা জানিয়ে দেয়। এতে লুলুকে ভুল বুঝে শওকত, এবং নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি জমায়। একসময় লুলুর পিতা তার ভুল বুঝতে পেরে শওকতের সঙ্গে লুলুর বিয়েতে সম্মতি প্রদান করলেও নিরুদ্দিষ্ট শওকতের কোন খোঁজ মেলে না। পিতা আহাদ আলী মারা যাওয়ার পাঁচ বৎসর পর আইসিএস হিসেবে গেজেটে শওকতের সন্ধান পায় লুলু। কিন্তু আত্মসম্মানের স্বার্থে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে লুলুর ভাই। লুলু কর্মজীবনে প্রবেশ করে হৈচৈ হাসিখুশিতে দিন অতিবাহিত করলেও তার অন্তরের সুপ্তপ্রেম নিশীথে জাগ্রত হয়ে কান্নায় প্লাবিত করে তাকে। তাই একদিন সমস্ত অভিমান দূর করে শওকতকে চিঠি লিখে। কিন্তু শওকত বিমুখ করে লুলুকে পত্রমাধ্যমে জানায় :

> একদা তোমাকে আমার প্রয়োজন ছিল। সেদিন সে চাওয়ার মর্যাদা তুমি আমায় দাওনি। আজ তোমাকে চাওয়ার আমার প্রয়োজন যদি না থাকে সে কি আমার দোষ? অতীতের সেই দিন আমি ভুলে যেতেই চাই, তুমিও ভুলে যেয়ো।[২]

শওকতের আঘাত নিদারুণ কষ্টের আবর্তে নিক্ষেপ করলেও লুলু শওকতকে আর কোনো পত্র লেখেনি। কেননা, লুলুর তপস্যাকে শওকত মূল্যায়ন করেনি। পাষাণ প্রেমিকের নিকট তাপসীর তপস্যা পৌঁছে না। এভাবেই বিরহ ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে গল্পটির অবসান ঘটে।

গল্পটির বিষয় প্রেম; বিরহবোধেই যার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। গল্পটিতে সমকালীন সমাজ-পরিস্থিতি বিধৃত হয়েছে। বিশেষত চাকরিক্ষেত্রে মেয়েরা স্বাবলম্বী হতে না পারার বিবিধ বাধার প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'অনেক অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরা

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৮৬

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৮৯

পড়াশুনা করছে কিন্তু সদ্বংশ মধ্যবিত্ত ঘরের দুর্দশা আর ঘুচে' না। বেগম রোকেয়ার জীবনকালেও সদ্বংশীয় মেয়েরা স্কুলে আসতে পারত না বা সমাজ স্বীকৃতি মিলত না, অথচ নিম্নবিত্তের মেয়েরা উপবৃত্তি বা আর্থিক প্রাপ্তির কারণেই লেখাপড়ায় আগ্রহী হতো। সুফিয়া কামালও তাঁর গল্পে সে চিত্রই তুলে ধরেছেন।

চরিত্র সৃষ্টিতে সুফিয়া কামাল সিদ্ধহস্ত। কেন্দ্রীয় চরিত্র লুলু শিক্ষিত, মার্জিত ও সংযত। গোপন ব্যথা বুকে নিয়েও পরিবার ও সমাজের স্বার্থে সে হাসিখুশি প্রাণবন্ত। চরিত্রটির প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে লেখকের বর্ণনায় :

> অন্তর গৌরবে সে সকলের মাঝে রাণীর মতো; কিন্তু নিশীথ রাতের অবসাদ ভরা অবসর সময়ে সে এমনই কান্নায় লুটাইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে।

শওকত গতানুগতিক। সুফিয়া কামাল তাঁর প্রায় সব গল্পে পুরুষ চরিত্র নির্মাণে একই রীতি অনুসরণ করেছেন। দু-একটি গল্পে ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। শওকত সময়ের চাহিদানুযায়ী লুলুকে প্রার্থনা করেছে কিন্তু সময়ের ব্যবধানে লুলুর প্রতি তার ভালোবাসাও অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়েছে। তাই লুলুর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে সে প্রত্যাখ্যান করেছে। শওকতের উক্তির মধ্য দিয়েই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

> একদা তোমাকে আমার প্রয়োজন ছিল। সেদিন আমার সে চাওয়ার মর্যাদা তুমি দাওনি। আজ তোমাকে চাওয়ার আমার প্রয়োজন যদি না থাকে সে কি আমার দোষ?[১]

'সে এক তপস্যা' গল্পটি বিষয়গুণে নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

মধ্যবিত্ত

'মধ্যবিত্ত' গল্পটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির কঠিন জীবন বাস্তবতার প্রামাণ্য দলিল। গল্পটি জীবনঘনিষ্ঠ ও বাস্তবগন্ধী। গল্পটিতে নির্ণীত হয়েছে অর্থকষ্ট ও অভাবের তাড়নায় প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা।

কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়ে তিনমাস পর বাড়ি পৌঁছে প্রিয় স্ত্রী জয়নাব অর্থাৎ জয়কে দেখে মাসুম চিন্তিত হয়ে পড়ে। কারণ জয়নাব অসুস্থ। তাঁর মুখশ্রীর সেই লাবণ্য আর নেই। অথচ সে ছিল জমিদার জওয়াদ সাহেবের আদরের কন্যা। জমিদার নিজে ছিলেন সুরশিল্পী। তাই কন্যাকেও সেতারে পারদর্শী করে মার্জিত রুচির পরিচয় দিয়েছিলেন। জমিদারের বন্ধুপুত্র মাসুমের যাতায়াত ছিল সে বাড়িতে, আর সেখানেই উনিশ বছরের জয়নাবকে দেখে মুগ্ধ হয় মাসুম।

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৮৯

মায়ের ইচ্ছে অনুযায়ী জয়নাবকে পুত্রবধূ করার কথা ভাবছিলেন মাসুমের পিতা। মাসুমের এম এ পরীক্ষা শেষ হলেই প্রস্তাব রাখবেন পুত্রের জন্য- এমন ভাবনায় আন্দোলিত হলেও তাঁর সে ইচ্ছে পূরণ হয় না দেশবিভাগের হুজুগে। এ সময় প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হামলায় পিতা-মাতা হারা হয় মাসুম। জয়নাবও হয় পিতা ও ভ্রাতৃহারা।

দেশের এ দুর্যোগকালে মাসুম স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে জয়নাবকে। অতঃপর মাসুম-জয়নাব দম্পতির জন্ম নেয় একে- একে তিন সন্তান। ফলত ক্ষয়ে যেতে থাকে জয়নাবের স্বাস্থ্য। দীর্ঘদিন পর মাসুম বাড়িতে ফিরে মেয়ের মাধ্যমে জানতে পারে যে জয়নাব প্রায়ই জ্বরে ভোগে, কিন্তু প্রয়োজনীয় পথ্য ও ঔষধ সে সেবন করে না। মাসুম ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়, ঔষধ সংগ্রহ করে কিন্তু তার সব চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। জয়নাব সংসার– সন্তান ফেলে মৃত্যুবরণ করে। মাসুম অন্ধকারময় ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে নিজেকে খুব একা ও অসহায় বোধ করে। মাসুমের করুণ বিপর্যয়ের মাধ্যমেই গল্পের ইতি ঘটে।

সুফিয়া কামাল মূলত মধ্যবিত্তের সংগ্রামী জীবনের ট্রাজিক দিকই উন্মোচিত করেছেন গল্পটিতে। সৎ চাকরিজীবী মাসুম সীমিত আয়ের বৃত্তে বন্দি। তাই পূরণ হয় না খাওয়া-পরার মতো মৌলিক চাহিদাগুলো। ফলে রোগ-ভোগ আর অসুস্থতার শিকার হয়ে জীবনবিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় জয়নাবের। জয়নাবের মতো রুচিশীল, শিক্ষিত, মার্জিত নারী পরিবেশের আবর্তে অকালেই ঝরে পড়ে।

গল্পের চরিত্রসমূহ মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধিরূপে চিত্রায়িত করেছেন সুফিয়া কামাল। গল্পটি উত্তমপুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত। মাসুম মধ্যবিত্ত শ্রেণির একজন অসহায় ও দুর্বল প্রতিনিধি। স্ত্রীকে ভালোবাসা সত্ত্বেও তাকে সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপন করাতে সে ব্যর্থ। তার ব্যর্থতার কার্যকারণ লেখকের বর্ণনায় অঙ্কিত হয়েছে এভাবে :

> অদৃষ্ট–না আমার অযোগ্যতা? ভালো খাওয়া ভালো থাকার সম্বল আমার মতো শত শত মধ্যবিত্ত পরিবারেরই নেই। দিনে দিনে অন্ন বস্ত্র সমস্যা বিভীষিকার মতো আমাদের মধ্যবিত্তদের টুটি টিপে ধরেছে। ঘুষ খাইনে, উপরি নেই, চতুর্গুণ দাম দিয়ে খাওয়া পরা, ছেলে মেয়ের শিক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা কী দিয়ে করব আমরা। ওষুধ পথ্য উচিত মূল্যে পাওয়া যায় না, চোরাবাজারের অর্থ আমরা যোগাতে পারি না।[১]

জয়নাব ধৈর্যশীল নারী, স্কুলে শিক্ষকতা করে, সেতার বাজিয়ে সংসার নির্বাহের দায় কিছুটা সে বহন করতো। মৌন মুখে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে অসুখকে গোপন করে স্বামীর আর্থিক

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৯৩

বিঘ্ন না ঘটিয়ে নীরবে নিভৃতে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে সে। চরিত্রটি সর্বংসহা নারীরূপের প্রতীক এবং সার্থক।

মাসুম জয়নাবকে ভালোবেসে স্ত্রী হিসেবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। জয়নাব তার গর্ব, তার সম্পদ– এ উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের 'হৈমন্তী' গল্পের অপুর উপলব্ধির সমতুল্য। অপুর নিকট হৈমন্তী ছিল- 'সম্পত্তি নয়, সম্পদ'। এ গল্পেও মাসুমের অনুভূতি প্রকাশে সুফিয়া কামাল সেই অনুপম উক্তি ব্যবহার করেছেন। জয়নাব প্রসঙ্গে মাসুমের উপলব্ধি –'বন্ধুরা আত্মীয়রা যারা ছিল আমার স্ত্রী-ভাগ্যকে হিংসা করে নিজেরাই বলত- আমার গৌরব এ- এ আমার অনন্ত সম্পদ।'[১]

রবীন্দ্রনাথ পুরুষকণ্ঠে স্ত্রীর প্রশংসা গান করেছেন 'হৈমন্তী' গল্পে, সুফিয়া কামালও সেই মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে এ গল্পের পুরুষ চরিত্রের মাধ্যমে স্ত্রীর যথার্থ মূল্যমান নিরূপণ করেছেন।

'মধ্যবিত্ত' গল্পটি সুফিয়া কামালের সমাজ-সচেতনতার পরিচয়বাহী। মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন–সংগ্রামের চিত্রাঙ্কনে গল্পটি নিঃসন্দেহে সার্থক।

সসাগরা

'সসাগরা' গল্পটি সুফিয়া কামালের কিন্তু এর নামকরণ করেছেন কবি ফররুখ আহমেদ। গল্পের মেজাজ ও বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই তিনি এ নামকরণ করেছেন। গল্পটির বিষয় মাতৃত্ব। মাতৃচিত্তে সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা যে স্বতঃই ফল্গুধারার মতো বহমান থাকে তা গল্পের মাধ্যমে প্রতিপন্ন করেছেন সুফিয়া কামাল।

পদ্মাতীরের অধিবাসী সুলতান মিয়া জীবিকার সূত্রে আসাম গমন করে এবং কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্ত্রী জিনাত পুত্র হায়দার ও এক কন্যা ভানুকে নিয়ে দুরবস্থায় দিনাতিপাত করতে থাকে। সেলাই করে, ধান ভেনে, গম পিষে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতে হিমশিম খায় জিনাত। একদিকে অনশন-অর্ধাশন, অন্যদিকে কুজনের কুদৃষ্টি তার জীবনকে বিষিয়ে তোলে। সর্বপ্রকার বিরূপতার মুখে আত্মসম্মান রক্ষা করতে গিয়ে অনেকের শত্রুতা পরিণত হয় জিনাত। এমতাবস্থায় তার বিপদে যারা এগিয়ে আসে তারা সমাজের ভদ্রলোক শ্রেণির কেউ নয়, তথাকথিত চাষাভূষা।

[১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৯১

> অল্পবয়সের অসহায় বিধবা, উপকার করিবার ছলে আসিয়া কেহ কেহ আপন স্বরূপ প্রকাশ করিত, উপহাস করিয়া উপেক্ষার প্রতিশোধ লইত, সাহায্য করিতে আসিয়া অবস্থা জানিয়া নিয়া লাঞ্ছনা করিত। মানুষের উপর মানুষ তখনই বুঝি বেশি করিয়া অত্যাচার করে– যাহাকে তুচ্ছ ভাবিয়া মুঠায় পুরিতে চায়, সেই তুচ্ছ যখন আত্মমর্যাদায় বিরাট হইয়া উঠে। জিনাতেরও হইল তাই। ভদ্র ঘরের বৌ ঝি পর্যন্ত আর তাহার সাহায্যে বা সমদুঃখের দুঃখিতা হইয়া আসিল না, তাহার বান্ধব রহিল শুধু কয়েক ঘর চাষা চাষানী তথাকথিত ছোটলোকেরা।[১]

গ্রামের মাতব্বর কফিল মিয়াসহ অনেকেই জিনাতকে বিবাহের প্রস্তাব প্রদান করলে জিনাত তা প্রত্যাখ্যান করে। জমির মাঝির সহায়তার গমপেষা কাজে কিছু অর্থ উপার্জন করার পথও বন্ধ হয়ে যায় অসুস্থতার কারণে। জিনাতের দুঃখের কাহিনি জমিরের মাধ্যমে জানতে পারে হাফিজ। জমির মাঝির সহায়তায় জিনাতের প্রতি সমব্যথী হয়ে জিনাতের বাড়ি যায় হাফিজ। ডাক্তার হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়ে জিনাতকে সুস্থ করার ভার গ্রহণ করে। অসুস্থতা বেড়ে গেলে হাফিজ জিনাতকে নিজ গ্রামে নিজ গৃহে নিয়ে এসে সুস্থ করে তোলে। কিন্তু জিনাতপুত্র হায়দার অপছন্দ করে হাফিজকে । সে মায়ের গৃহত্যাগকে মেনে নিতে না পেরে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যায়। জিনাতের অসহায় অবস্থাকে দূর করতে হাফিজ জিনাতকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে। জিনাত নতুন জীবন ফিরে পায়।

পুত্র হায়দার ঘৃণাভরে মাকে পরিত্যাগ করে বরিশালে এসে আপন চাচার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। চাচা তার কন্যার সঙ্গে হায়দারের বিয়ের ব্যবস্থা করে। বিয়ের আসরে মা জিনাতকে কেন্দ্র করে আপত্তিকর বক্তব্য উত্থাপিত হলে হায়দার তা সহ্য করতে না পেরে চাচার বাড়ি ত্যাগ করে। এ-পর্যায়ে সে এক চিরকুমার গুড়-ব্যবসায়ী হাফেজ সাহেবের কাছে সন্তানরূপে আশ্রয় পায়। এখানে হায়দার ব্যবসার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। ঘটনাসূত্রে হাফেজ সাহেবের মৃত ভগিনীর স্বামী মারা গেলে একমাত্র কন্যা ও দ্বিতীয় স্ত্রী এবং কিছু সম্পত্তি দেখাশুনার ভার অর্পণের জন্য একজন যোগ্য পাত্রের সন্ধান করলে হায়দার স্বেচ্ছায় সে দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হয়। কারণ, হায়দারের উপলব্ধি হয় যে, তার মাতা জিনাতও একসময় এরকম অসহায় ছিল। অভিমানভরে মাকে অবজ্ঞা করে চলে এলেও দীর্ঘদিন পর হায়দার মার অসহায়ত্বের কষ্ট উপলব্ধি করতে পারে। এই পরিবারটিও অসহায় ভেবে সে এই পরিবারের কন্যা সাজেদাকে বিয়ে করে। বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা ভাবলেও ব্যস্ততার কারণে তা হয়ে ওঠে না। একদিন হায়দার মার উদ্দেশে রওনা হয় এবং অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর মা জিনাত, ভগিনী ভানু এবং হাফিজ সাহেবের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। নতুন সংসারে জিনাত আরেক পুত্র সন্তানের মা হয়, হায়দারকে কাছে পেয়ে জিনাতের মাতৃত্বের স্বাদ পূর্ণ হয়। হায়দারও মাকে কাছে পেয়ে সুখী হয়। মার কোলে মাথা রেখে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৯৫

সে। সসাগরা ধরণীর মতো জিনাত সন্তানকে শিয়রে নিয়ে পরম সুখে বিভোর। ধরিত্রী মাতার মতোই জিনাত সর্বংসহা।

মূলত নারীর অন্তরে সন্তান-বাৎসল্য সসাগরা ধরিত্রীর মতোই ব্যাপক ও বিশাল। এই সত্যটিই অন্তর্লীন হয়ে আছে গল্পটিতে। সুফিয়া কামালের নিজ জীবনের প্রভাব পড়েছে গল্পটিতে। সৈয়দ নেহাল হোসেনের মৃত্যুর পরবর্তী পর্যায়ে সুফিয়া কামালের জীবনে যে অসহায়তা, আর্থিক দৈন্য নেমে এসেছিল তারই বাস্তব প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়েছে নায়িকা জিনাতের জীবন প্রবাহে। জিনাত এবং হাফিজ সাহেবের বিবাহ বিষয়টিও লেখকের জীবনস্মৃতির সঙ্গে সাযুজ্যযুক্ত। সুফিয়া কামালের জীবনীসূত্রে জানা যায়–

> স্কুলে শিক্ষতার রুটিন মাফিক দায়িত্ব পালন, অর্থনৈতিক সংকট, সংসারের সামগ্রিক দায়-দায়িত্ব, সাহিত্য সাধনা সর্বোপরি সামাজিক ও পারিবারিক বিরূপ সমালোচনা, সব মিলিয়ে সুফিয়ার জীবন-যন্ত্রণা চরম আকার ধারণ করে। এরূপ তীব্র বৈরী পরিবেশে দীর্ঘ ৭ বছর আপোষহীনভাবে সংগ্রাম করতে করতে তিনি শারীরিক ও মানসিক চাপের তীব্রতা আর সহ্য করতে না পেরে অসুস্থ হয়ে একেবারে শয্যশায়ী হয়ে পড়েন। ডাক্তার তার জীবনের শঙ্কা প্রকাশ করলেন। এমতাবস্থায় সংসারেও নেমে আসে অনিশ্চিত অচলাবস্থা। সুফিয়ার জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে তাঁকে বাঁচানোর জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এলেন জনাব মিজানুর রহমান। ... সুফিয়ার কবি প্রতিভা দেখে মিজানুর রহমান সাহেব তাকে নিজ কন্যার মতো স্নেহ করতেন। সুফিয়াও তাকে পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা করতেন। .... সামগ্রিক দিক বিবেচনায় রেখে মিজানুর রহমান সুফিয়াকে পুনরায় সংসারধর্ম পালনের উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন : "এটা ইসলামের অনুমোদিত কাজ। তাছাড়া তোমার নিজের তোমার মা'র এবং ছোট মেয়েটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তুমি উদাসীন থাকতে পার না। এদের জন্য হলেও তোমাকে বাঁচতে হবে।" অপত্য স্নেহ-মমতার পরশ বুলিয়ে নানাভাবে বুঝানোর পর অবশেষে সুফিয়া বলেন : বাবা, আপনার যা অভিরুচি তাই করুন। আমি বড়ই অসুস্থ, তথাপি আপনার আদেশ অমান্য করবোনা।" কিন্তু এ শয্যাশায়ী রুগ্ন মেয়েকে বিয়ে করবে এমন কে আছে? এক্ষেত্রেও সমস্যা সমাধানের উদ্যোগী ভূমিকা পালন করলেন মিজানুর রহমান। তিনি বহু অনুসন্ধান করে সদ্বংশজাত, উচ্চশিক্ষিত, প্রগতিবাদী সাহিত্যিক জনাব কামাল উদ্দীন (এম.এস.সি.) কে অনুরোধ করলেন সুফিয়ার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে। চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার (বর্তমানে লোহাগাড়া থানা) চুনতী গ্রামের প্রখ্যাত খান পরিবারের উচ্চ শিক্ষিত সুদর্শন স্বাস্থ্যবান যুবক কামাল উদ্দীন খান ছিলেন অত্যন্ত চিন্তাশীল ব্যক্তি। তিনি সুফিয়ার কাব্য-প্রতিভার সম্মান করতেন। তাই রুগ্ন হলেও সুফিয়ার মতো সর্বগুণসম্পন্না প্রখ্যাত কবিকে সহধর্মিণী করতে সম্মত হয়েছিলেন। এই সম্মতি প্রদান, এই বিয়ে ছিল কামাল সাহেবের জন্য রীতিমত ভাগ্য ও চ্যালেঞ্জের বিষয়। কেননা নববধূ সুফিয়ার জীবন তখনও শঙ্কামুক্ত হয়ে ওঠেনি।... কামালউদ্দীন খান তখন সরকারি কার্য উপলক্ষে বহরমপুর ছিলেন। মিজানুর রহমান সাহেব চিঠি পেয়ে ৭ই এপ্রিল ১৯৩৯ 'গুড় ফ্রাইডে'র ছুটিতে কোলকাতা আসেন। পরের দিন ৮ই এপ্রিল মিজানুর রহমান সাহেবের উদ্যোগে তারই শ্বশুর খান বাহাদুর ওয়ালিউলাহ ইসলাম সাহেবের ৪৫ নং লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ বাসভবনে কনের

> অনুপস্থিতিতেই 'কলেমা' হওয়ার পর বরপক্ষ পার্ক সার্কাসের 'দাস ভবন' এ গেলেন শয্যাশায়িনী 'কনে সুফিয়া' কে দেখতে।[১]

উল্লিখিত ঘটনা সুফিয়া কামালের 'সসাগরা' গল্পের সঙ্গে অনেকাংশে সঙ্গতিপূর্ণ।

জিনাত চরিত্রটি লেখকের প্রতিচ্ছায়ারূপে প্রতিবিম্বিত। রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থায় নির্ভার জীবন কাটানো কোনো নারীর পক্ষে সম্ভব নয়, বিশেষত তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায়; যার ফলে জিনাতকে লেখকের মতোই নতুন পরিবারে ঠাঁই নিতে হয়েছে। স্থান এবং ঘরবদল হলেও তার মাতৃত্ববোধ ম্লান হয়নি। জিনাতের বাৎসল্যপ্রেমের পরিচয়দানের মধ্য দিয়ে লেখক সেই চরম সত্যটি স্পষ্ট করেছেন। জিনাত যেন সগাগরা ধরণীর মতোই বিশালঃ

> বহুকালের বহুকথার পর একে একে সকলের চোখে ঘুম আসিল। বেশি করিয়া যেন হায়দারের চোখে। মায়ের প্রসারিত হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া সে কথার মধ্যেই তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছিল। ....রাত্রি বাড়িয়া চলিয়াছে। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে প্রত্যেকটি বস্তু সুন্দর স্নিগ্ধরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। সকলেই সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন। জিনাত স্বামীর মুখ হইতে শিশু ভানুর মুখ পর্যন্ত দেখিল। দেখিল কোলের উপর শায়িত নিদ্রিত হায়দারের মুখ। চক্ষুর ফোঁটা অশ্রু কপোল বাহিয়া নামিয়া আসিল। দুরন্ত দুর্বার সাগর যেন ধরিত্রীর কোলে সুপ্ত। সেই নিশীথে সকলেই নিদ্রিত। শুধু সসাগরা ধরণীর মতো জিনাত জাগিয়া সন্তানের শিয়রে! দুরন্ত সাগর। সর্বংসহা মাতা ধরণী।[২]

সুফিয়া কামাল গল্পটিতে সাগরকে ধরণীর সন্তানতুল্য বিবেচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় সমুদ্রকে ধরণীর মাতা এবং ধরণীকে সমুদ্রের কন্যারূপ সন্তান হিসেবে উপমিত করেছেন। দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা থাকলেও মা-সন্তান পরস্পরের ভালোবাসার অবস্থানে ভিন্নতা নেই। এক্ষেত্রে দুজনই সার্থক।

চরিত্রের নামকণের ক্ষেত্রে সুফিয়া কামাল একই নাম স্বরচিহ্নভেদে দু ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। যেমন জিনাতের স্বামীর নাম 'হাফিজ' আর হায়দারের আশ্রয়দাতার নাম 'হাফেজ'। গল্পটি পাঠকালে পাঠক নাম দুটোতে বিভ্রান্ত হতে পারেন। এক্ষেত্রে লেখক বিকল্প নাম ব্যবহার করলে গল্পের বিভ্রান্তি দূর হতো।

গল্পের ঘটনাবিন্যাসে নাটকীয়তা লক্ষ করা যায়। হায়দার নতুন উপলব্ধিজাত ভাবনায় সাজেদার মতো পিতৃহীন অসহায় কন্যাকে বিয়ে করতে রাজি হয়। এই পরিবর্তনই গল্পটির নাটকীয় ঘটনা এবং ক্রমশ গল্পটি পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যের আলোকে গল্পটি সার্থক।

---

[১] *ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, সুফিয়া কামাল*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬-৩৮

[২] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহঃ প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫০৯*

প্রকৃতি বর্ণনায় সুফিয়া কামাল চরিত্রের মনন-চেতনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হায়দার মা-জিনাতের সাথে দেখা করার উদ্দেশে নদীপথে স্টিমারে রওনা হয়। এসময় হায়দারের ভাবনালোকে সন্তান এবং মায়ের সম্পর্ক যেন প্রকৃতির সাথে একীভূত হয়ে যায়। লেখকের বর্ণনা সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর :

> ভাটির দেশের বর্ষার নদী, মাঠে নদীতে একাকার, নদীর বুকে গৈরিক আভাস মাঠের বুকে শ্যামলতার রূপ নয়নাভিরাম। নৌকা ভেলা ডিঙ্গিতে মানুষের আনাগোনা। এদিক হইতে মনে হয় দিগন্ত নামিয়া নদীকে চুম্বন করিতেছে, কি–নদী রবিকর স্নাত হইয়া পুলকে ফুলিয়া উঠিয়াছে বুঝিবার উপায় নাই। জ্যোৎস্না রাতের দৃশ্য আরও অপরূপ। চাঁদে নদীতে প্লাবন জাগিয়াছে, প্রতি তরঙ্গ বক্ষে চাঁদ ভাসিয়া গড়াইয়া হাসিয়া মিশিয়া খেলা করিতেছে। হায়দার নৌকার মধ্যে বসিয়া সে দৃশ্য দেখিতেছিল। আবাল্যের পরিচিত নিজের পিতৃ মাতৃভূমির আবেষ্টনে সে ফিরিয়া আসিয়াছে।[১]

গল্পের ভাষায় সাধুরীতি এবং তৎসম শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। গল্পটিতে পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক কথ্যভাষা সংযোজন করা হয়েছে চাষী চরিত্রের সংলাপে। যেমন :

> হয়– মাইয়াডার বয়েসত বেশি না, এইত চাইর পাঁচ বছর গেল সুলতান মিয়ার এন্তেকাল অইছে, এর মধ্যে দোসরা বিয়া শাদীর কথা, মুখের কথা কাড়িয়া জমির বলিল– হে কথা আর কইও না, হুমন্দির পোলারা বহুত চেষ্টা করছে, খোদারও ত বুদ্ধি আছে কিন্তু অমন সবরী কলাডা কোন্ বান্দরের মুহে দেবে কও দেহি। একটাও ত মানুষের বাচ্চা নাই আমাগো গেরামে, দুই তিনজন বউ লইয়াত এক একটায় দিনরাত্রি কাইজা কচকচি লইয়া আছে। হেইয়া দেইখয়া ওই মাইয়া যাইবে ওগোর ঘরে? আল্লার বান্দা আল্লায় দেখবে–যাই ভাই এখন, যাইও মোগো বাড়ি।[২]

'সসাগরা' গল্পটিতে সুফিয়া কামালের শিল্পদৃষ্টি অনন্যমহিমায় উদ্ভাসিত। এটি একটি সার্থক ছোটগল্প।

নূরজাহান

কেয়ার কাঁটা গল্পগ্রন্থের ব্যতিক্রমী সংযোজন 'নূরজাহান'। বিষয়, আঙ্গিক ও প্রকরণে এটি নাট্যগুণসম্পন্ন। একটি বিশেষ সময়ের প্রেক্ষাপটে মহীয়সী ও মমতাময়ী ঐতিহাসিক চরিত্র নূরজাহানের বুদ্ধিমত্তা ও শক্তিমত্তার পরিচয় প্রদানই এ নাট্যধর্মী গল্পের মূল বিষয়। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের চৈতন্যলোকে ইতিবাচক জীবনভাবনা সঞ্চারিত করতে স্ত্রী নূরজাহানের ভূমিকা যে কতো বেশি সুদূরপ্রসারী ছিল তা এ গল্পের উপজীব্য।

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫০৭-৫০৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৯৭

সংলাপ-নির্ভর এ গল্পের মাধ্যমে সুফিয়া কামাল বিশেষ সময়ে বিশেষ নারীর অবদানকে চিহ্নিত করেছেন। ঐতিহাসিক ঘটনা, চরিত্র, ভাষা ও সংলাপের সমন্বয়ে 'নূরজাহান' সার্থক।

স্পষ্টত *কেয়ার কাঁটা* গল্পগ্রন্থ সুফিয়া কামালের ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিভার স্বাক্ষর। প্রধানত কবি হলেও গল্প রচনায়ও যে তিনি উজ্জ্বল কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা স্পষ্ট। সমকালীন পত্র-পত্রিকায় এ গল্পগ্রন্থ সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়েছে। মাসিক মোহাম্মদী মন্তব্য করে :

> ইহাকে গদ্য-কাব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গল্প সাহিত্যে নজরুলের ব্যথার দান; ও 'রিক্তের বেদন' ছাড়া এর সমতুল্য এই বাংলা ভাষায় আর নাই বলিলেও চলে। ... বাংলার মহিলা কবিদের মধ্যে ইনি নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ একথা পাঠকগণ জানেন। ... 'কেয়ার কাঁটা' পড়িয়া সকলেই আমাদের মত স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন, কবিতার মত তাঁর গল্প রচনাও সুমধুর সুন্দর। যে কয়টী গল্প এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সব কয়টীই আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে এক নিঃশ্বাসে পাঠ করিয়াছি। ... মনে হয় নারীর অন্তর-রহস্যের এমন সুমধুর বর্ণনা বাংলার আর কোন গল্পগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। লেখিকার গদ্য-রচনাও তাঁর কবিতার মতই মনোহর- এ গ্রন্থকে অনায়াসে গদ্য-কাব্য নামে অভিহিত করা যায়।[১]

দৈনিক আজাদের মন্তব্য :

> গল্পগুলি সুন্দর ও মধুর সর্বত্র একটা কবিজনসুলভ আবেগ ও ভাবোচ্ছ্বাস বেশ উপভোগ্য। ... আমরা গল্পগুলি পাঠ করে আনন্দ লাভ করেছি।[২]

ইংরেজি দৈনিক 'স্টার অব ইন্ডিয়া'র মন্তব্য :

> গল্পগুলি অনাড়ম্বর মনোরম ভাষায় লেখা এবং ইহার বিষয়বস্তুর সমাবেশ যে কোন পাকা গল্প লেখকের পক্ষেও গৌরবের বিষয়।[৩]

কেয়ার কাঁটা গল্পগ্রন্থটি সুফিয়া কামাল উৎসর্গ করেন তাঁর মাতাকে। উৎসর্গপত্রটি ছিলো নিম্নরূপ :

> উৎসর্গ : নির্বাসিতা হাজেরার মতো মহিমাময়ী আমার মাকে দিলাম।

গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে এ গ্রন্থের গল্পগুলো মূলত 'সওগাত' পত্রিকায় এবং দু-একটা অন্যান্য পত্রিকায় যেমনঃ 'বুলবুল' 'জয়তী' ইত্যাদিতে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পের শিরোনাম মূলত সুফিয়া কামালেরই নিজস্ব। তবে 'সসাগরা' এবং 'সত্যিকার' গল্পের নামকরণ সুফিয়া কামাল করেননি। গল্পের বক্তব্য ও মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সংশ্লিষ্ট সম্পাদক নামকরণ করেছেন।

---

[১] *ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, সুফিয়া কামাল*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬০
[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬০
[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬০

বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকটি ছিল সুফিয়া কামালের জন্যে যথার্থই সংকটময় অধ্যায়। স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের মৃত্যু, বৈধব্যবরণ, আত্মীয়-স্বজনের বিমুখতা- প্রভৃতি ঘটনা সেই প্রতিকূল পরিবেশে তাঁর জীবনকে এক ভয়াবহ অনিশ্চিয়তা ও বিরূপতায় নিক্ষেপ করে। আর এই সময়েই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্য ও গল্পগ্রন্থ *সাঁঝের মায়া* এবং *কেয়ার কাঁটা*। সওগাত সম্পাদক নাসিরউদ্দীন *সাঁঝের মায়া* প্রকাশের দায়িত্বভার গ্রহণ করেও সমাপ্ত করতে পারেননি। দুভার্গ্যবশত এর পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়। অর্থনৈতিক সংকটসহ নানাবিধ সংকটে সুফিয়া কামালের গ্রন্থ দুটো প্রকাশের সম্ভাবনা যখন প্রায় বিলীয়মান তখনই এর দায়ভার গ্রহণ করেন কবি বেনজীর আহমদ। তিনি নিজ অর্থব্যয়ে*কেয়ার কাঁটা* (১৯৩৭) এবং *সাঁঝের মায়া* (১৯৩৮) গ্রন্থ দুটি প্রকাশ করেন। কেবল প্রকাশই করেননি লেখক-সম্মানীর ব্যবস্থা করে সেই দুর্দিনে সুফিয়া কামালের বিরাট উপকার করেছেন তিনি। সুফিয়া কামালের চারপাশে যখন কঠোর সামাজিক বিধি নিষেধ, চরম অর্থনৈতিক সংকট, তখন বেনজীর আহমেদের এই সাহায্য তাঁকে নতুন জীবন দান করে। এই সহযোগিতা সুফিয়ার কাছে ছিল সঞ্জীবনী সুধার মতো। এ-সূত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিদর্শন-স্বরূপ সুফিয়া কামাল তাঁর *মন ও জীবন* কাব্যটি উৎসর্গ করেন বেনজীর আহমদকে। বেনজীর আহমদকে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, বক্তৃতা, স্মৃতিচারণ ইত্যাদিতে 'দুঃখ দিনের বন্ধু' বা 'আল্লাহর দেওয়া সাথী' বলে উল্লেখ করেছেন।

কেয়ার কাঁটা গল্পগন্থটি প্রকৃতপক্ষে বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবনের বিশ্বস্ত দলিল। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে বাঙালি মুসলমানের ঘরোয়া জীবন, বিশেষ করে নারী সমাজের ভাবভাবনা, জীবনাচরণ এই গ্রন্থে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন সুফিয়া কামাল। গ্রন্থটি তাই একটি বিশেষ সময়ের সমাজজীবনের আকরগ্রন্থরূপে বিবেচিত হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভ্রমণবিষয়ক রচনা

সোভিয়েটের দিনগুলি

সুফিয়া কামালের ভ্রমণবিষয়ক রচনা *সোভিয়েটের দিনগুলি* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে 'সব দেশের সংগ্রামী মেয়েদের স্মরণে'। এটি সুফিয়া কামালের প্রকাশিত অষ্টম গ্রন্থ। ৯০ পৃষ্ঠা সংবলিত গ্রন্থটিতে মোট ৪টি রচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। রচনাসমূহের শিরোনাম :

১. সোভিয়েটের দিনগুলি,
২. সংবর্ধনার উত্তরে,
৩. নারীস্থান,
৪. সোভিয়েটের সুখী সমাজ।

গ্রন্থটির সুচনায় সুফিয়া কামাল একটি কবিতা সংযোজন করেছেন। মহান নেতা লেনিনের উদ্দেশে জয়গানমূলক এ-কবিতাটি নিবেদিত হয়েছে। কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ :

শতাব্দীর অর্ধপথ পাড়ি দিয়ে আসে
জাগ্রত যে জনগণ মুখর উলল্লাসে
বিপুল বিস্ময় পৃথিবীর–
জয় জয় জয়গান কাস্তে হাতুড়ির !
জয় মানবতা। স্বাধিকার
যে জাগালো নব চেতনায়
মহান লেনিন
তার জয়গানে ভরে দিন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কাস্তে-হাতুড়ি প্রতীক চিহ্নিত পতাকার স্তবগান করেছেন সুফিয়া কামাল। লেনিনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত সুসাম্য ও শান্তির দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রত্যক্ষ করে সুফিয়া কামাল এই মহান নেতার প্রতি নিবেদন করেছেন বন্দনা-গান।

'সোভিয়েটের দিনগুলি' শীর্ষক রচনাটি আকারে-প্রকারে বেশ বড়ো। সুফিয়া কামাল এ-রচনায় তাঁর ভ্রমণবিষয়ক অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। ৬ মার্চ ১৯৬৭ থেকে ২৩ মার্চ ১৯৬৭ পর্যন্ত তিনি ভ্রমণ করেছেন করাচি হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থান। ভ্রমণ বর্ণনায় স্থান পেয়েছে সে দেশের আতিথেয়তা, শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ; সেই সঙ্গে কবির

স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশভাবনা। জীবনকে নতুন করে উপলব্ধি করার, দেখার ও জানার সুবর্ণ সুযোগকে সুফিয়া কামাল স্মরণীয় করে রেখেছেন 'সোভিয়েটের দিনগুলি'তে। সমকালীন প্রেক্ষাপটে এই রচনাটি গুরুত্বপূর্ণ। তৎকালীন অবরোধবাসিনী একজন নারীর বিদেশভ্রমণ রক্ষণশীল ও ধর্মাচ্ছন্ন একটি সমাজের জন্য অত্যন্ত বিরল ঘটনা। যাঁর ছিল না কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কিংবা ডিগ্রির অলঙ্কার, এবং যিনি ছিলেন স্বশিক্ষায় শিক্ষিত, জীবনাভিজ্ঞতার আলোকে শুদ্ধ, সেই তিনিই এই ভ্রমণ-অভিজ্ঞতাকে পরিবেশন করেছেন অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে। রচনাটিতে মানবমাহাত্ম্য, মানবকল্যাণের সুরধ্বনি ঝংকৃত হয়ে উঠেছে বার বার। তিনি দেশ-বিদেশ নির্বিশেষে মানুষকেই যে সবার উপরে ঠাঁই দিয়েছেন তা তাঁর এ রচনাসূত্রে অনুভব করা যায়।

১৯৬৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ইসলামাবাদের মিনিস্ট্রি অব লেবার থেকে টেলিফোন করে সুফিয়া কামালকে জানানো হয় যে, ৮ মার্চ ইন্টারন্যাশনাল ইউমেনস ডে অনুষ্ঠিত হবে মস্কোতে, সেখানে সুফিয়া কামালকে আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে যেতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমন্ত্রিত হয়েছেন বেগম হাবিব রহিমতুলাহ এবং পূর্বপাকিস্তান থেকে সুফিয়া কামাল। এর আগেও দুবার আমন্ত্রণ পেয়েছেন সুফিয়া কামাল, কিন্তু পাসপোর্ট না পাওয়ায় যাওয়া হয়নি। এবারের আমন্ত্রণও সফল হবে কিনা সেই অনিশ্চিত ভাবনায় ভাবিত ছিলেন কবি। ৩ মার্চ মস্কোতে উপস্থিত থাকার কথা বলা হলেও পাসপোর্ট, হেলথ সার্টিফিকেট, টিকিট কিছুই যোগাড় হয়নি। ২ মার্চ টেলিফোন ও টেলিগ্রাম করার পর চিঠি আসে। এ ভ্রমণযজ্ঞে কবিকে সহায়তা করেন শাহাবউদ্দীন ও শহীদুল্লাহ কায়সার। এক্ষেত্রে কবির ভাষ্য স্মরণীয় :

> ৩ তারিখ মস্কো উপস্থিত থাকতে হবে। মিনিস্ট্রি অব লেবার চিঠি পাঠাচ্ছে। আরও অবাক কান্ড! আজ ১ লা, আজ করাচী রওয়ানা না হলে ৩ তারিখ মস্কো উপস্থিত থাকা যে অসম্ভব এটা ত একান্তভাবে জানা কথা। কিন্তু কোথায় পাসপোর্ট-হেলথ সার্টিফিকেট-টিকিট-পাথেয়। অদ্ভুত ব্যবস্থা! ফোন করলাম শাহাবউদ্দীন, শহীদুল্লা কায়সারকে। ওরাও শুনে অবাক! চিঠি আর আসে না। ওরা টেলিগ্রাম, টেলিফোন করে করে হয়রান। ২ তারিখ সন্ধ্যায় চিঠি এল। ওরা তো টিকিটের কথা কিছু লেখেনি, কে পাঠাচ্ছে? পাথেয় কে দিচ্ছে? আবার শহীদুল্লা কায়সার টেলিগ্রাম দিল, জওয়াবে জানা গেল সোভিয়েত কনস্যুলেটের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। শাহাবউদ্দীন, শহীদুল্লা যেন ক্ষেপে গেল। খবর নিল ৩ তারিখ ত মস্কো পৌঁছতে পারবই না। তবে ৭ তারিখে রাশিয়ান এয়ারোফ্লোট-এ আমার সীট পাওয়া যাবে। ৬ তারিখ করাচী রওয়ানা হতে হবে। সরকারী চিঠি নিয়ে পাসপোর্ট-সার্টিফিকেট-পাথেয় জোগাড় হল। ... শহীদুল্লা কায়সার 'ডন'-এর বার্তা সম্পাদক জাহেদীকে টেলিগ্রাম করে দিল ৬ তারিখ ৩টায় আমি ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়ে যাচ্ছি, সোভিয়েট দুতাবাসে গিয়ে যেন সে আমার ভিসা যোগাড় করে রাখে।
>
> ভূতের মতো খেটে শহীদুল্লা কায়সার ৫ তারিখ টিকিট নিয়ে এল।[১]

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫২১

প্রাথমিক সমস্যা কাটিয়ে কবি রওয়ানা হলেন ৬ তারিখ ২টায় পি. আই. এ. বোয়িং ৭৭১-এ চড়ে। কবির অনুভূতি গভীরভাবে স্পর্শ করল দেশ ও মাটির ভালোবাসাকে। বিরল সম্মানে বিভূষিত সুফিয়া কামাল, অভিভূত ও আবেগে আপ্লুত হয়েছেন বার বার। স্বদেশে ও স্বজাতির সম্মান রক্ষার্থে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তার উপলব্ধিতে–

> পূর্ব পাকিস্তানের–শ্যামল কোমল বাংলাদেশের সমস্ত মা-বোন মেয়েদের তরফ থেকে এত সামান্য এতো ক্ষুদ্র আমি যে যাচ্ছি, কতটুকু আমার শক্তি, কতটুকু সাধ্য! এ যে কত বিপুল দায়িত্ব। বিরাট ভার! আল্লাহ্ আমাকে এ ভার বইতে দিলেন, আমার চেয়ে যোগ্যতর কারুর হাতে না দিয়ে– এ কি আমি বইতে পারব ? আমার দেশের মান সম্মান সম্ভ্রম ইজ্জত, আমার দেশের সন্তানদের পরিচয় তাদের পথযাত্রার আলো রেখা কি আমি বয়ে নিতে পারব অচেনা অদেখা সেই দেশে? এত গুরুভার যে এ যাত্রার, পেন ছাড়বার আগে তা অনুভব করতে, ভাবতে পারিনি– মনেই হয়নি। মনে মনে আল্লাহকে বলাম; তুমি আমার দেশের, তোমার দেওয়া শ্যামল কোমল বাংলার মেয়েজাতির ইজ্জত যেন বজায় রেখো। ফিরে আসি বা না আসি– বাংলার মেয়ে ভীরু নয়, ভীতু নয়, সংগ্রামে সাহসে সংকল্পে স্বদেশে বিদেশে তারা মাথা উঁচু করে চলতে জানে, এ প্রীতি যেন তুমি আমাকে দিয়ে ক্ষুণ্ন করো না।[১]

ভ্রমণ বর্ণনায় সুফিয়ার স্বদেশ-ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। স্বদেশের মানুষকে নিয়েও তাঁর ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। ঢাকা থেকে করাচী পৌঁছে স্টেট ব্যাংক থেকে পি-টু ফরম দেরীতে আসায় মস্কোর ভিসা পেতে দেরী হলো কবির। ৭ তারিখ ভোর ছয়টায় রাশিয়ান এয়ারোফ্লোটে কবি মস্কোর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে বিকেল চারটায় মস্কোয় পৌঁছেন। ক্রেমলিনে প্যালেস অব কংগ্রেস-এ মহিলা সমাবেশে যোগ দিয়ে মহিলা-নেত্রী নীনা পাপোভাসহ বিদেশের অন্যান্যদের সাথে পরিচিত হন কবি। বিশাল সমাবেশ, সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা কবিকে বিস্মিত করে। ৩ তারিখে কবির উপস্থিত না হওয়ার কারণ অবগত আছেন নীনা পাপোভা; তা তিনি কবিকে জানালেন। সুফিয়া কামাল তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করলেন এভাবে–

> ঈস্ট পাকিস্তান–এই কথাটি আর কবি ও সমাজসেবিকা বলে আমার পরিচয় দেওয়াতে অত অল্প সময়ের মধ্যেই এতজন আমাকে আদরে আপ্যায়নে এমন আন্তরিকতার সাথে কাছে টেনে নিলেন যে আমি যে কবি এবং কবি যে সর্বজনপ্রিয় এবং সম্মানিত সে যেন নতুন করে জানলাম। কেউ বলে তোমার ভাষায় নাম লিখে দাও, কেউ বলে দুলাইন বাংলা কবিতা লিখে দাও। আল্লাহর কাছে শোকর করি, ২ দিনের পেন জার্নির ধকলেও মাথা ঠিক রেখেছিলেন। আর বার বার মনে পড়ছিল শাহাবউদ্দীনকে– ছেলেটা ভাগ্যিস বাক্সভর্তি কার্ড ছাপিয়ে দিয়েছিল, তাই রক্ষা । সবাইকে দিয়ে রেহাই পেলাম।[২]

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫২২

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫২৪-৫২৫

৮ মার্চ ফ্রেন্ডশিপ হাউজে শুরু হয় ইন্টারন্যাশনাল উইমেনস ডে-র অধিবেশন। ৮৫টি দেশের দুইশত মহিলা এ অধিবেশনে যোগদান করেন। বিভিন্ন দেশের মহিলা বিভিন্ন পোশাক, অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে মঞ্চে উপবেশন করে নিজ ভাষায় বক্তব্য প্রদান করেন। সে বক্তব্য ইংরেজি ও রাশিয়ান ভাষায় অনূদিত হয়ে সাথে সাথে হেডফোনে সবাই শুনতে পায়। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধি হাবিব রহিমতুলল্লাহ কিছু বলবেন বলে সুফিয়া কামাল আশা করেছিলেন। কিন্তু তিনি এতো আগে যোগদান করেও কিছু না বলেই রইলেন। এ সম্পর্কে সুফিয়া কামালের অনুভূতি প্রকাশ করা হলো–

> সব দেশের মেয়েরা তাদের দেশের হয়ে কিছু না কিছু বলছে, আমাদের পাকিস্তানের পরিচয় অজ্ঞাত রেখে খেয়েদেয়েই বাড়ী রওয়ানা দিতে হবে নাকি।[১]

দেশের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ববোধের ব্যাপারটি সুফিয়া কামাল গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন। দেশের পরিচিতি আন্তর্জাতিক সভায় উপস্থাপন করার তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করলেন, এবং নীনা পাপোভার অনুরোধে ভাষণ দেবার জন্য মনস্থির করলেন। পাকিস্তানের অ্যামব্যাসাডর জনাব সলমান আহমদ আলী জানতে চেয়েছেন ইংরেজি ভাষায় ভাষণ দেয়া হবে কিনা। উত্তরে সুফিয়া কামাল জানালেন– ইংরেজি ভাষায় দিতে নির্দেশ থাকলেও তিনি স্বভাষা বাংলায় ভাষণ দেবেন। মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও মমত্ববোধকে অবস্থার খাতিরে বা পরিবেশের প্রভাবে তিনি বিসর্জন দিতে অপারগ ছিলেন। তাঁর এই সাহসিকতাই তাঁকে প্রকৃতই বিরল সম্মানের অধিকারী করেছে। বিরাট সমাবেশে বক্তৃতা রাখার সাহসিকতার জন্য অনেকেই তাঁকে বাহবা দিলেন। তাঁর এই সাহসী সিদ্ধান্তের নেপথ্যে রয়েছে স্বদেশী মা-বোনদের মুখ– এমনটি মন্তব্য করেছেন সুফিয়া কামাল–

> এমন বিরাট সমাবেশে বক্তৃতা দেবার সাহস দেখে বাহবাও দিলেন অনেকে। আমি ত জানি কতটুকু আমার সাধ্য। শুধু আল্লাহর ইচ্ছায় ও আমার দেশের মা-বোন-মেয়েদের মুখ মনে করেই না আমার এত সাহস। আল্লাহ যেন আমাদের মেয়েদের মুখ রক্ষা করেন।[২]

১১ মার্চ শেষ অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন সুফিয়া কামাল। ভাষণে প্রকাশ পেয়েছে স্বদেশের গৌরব ঐশ্বর্য ও কীর্তির প্রশংসা। ভাষণে প্রদত্ত বক্তব্য প্রসঙ্গে সুফিয়া কামালের ভাষ্য প্রদান করা হলো :

> আমি অবশ্য বাংলায় বললাম। সোভিয়েত নারীদের জাগ্রত মহান জীবনাদর্শ আজ ৫০ বছর ধরে ও দেশকে কর্মে সাধনায় মহীয়ান করে তুলেছে। আমাদের মাত্র ২০ বছর আজাদী লাভের মধ্যেও আমাদের মায়েরা মেয়েরা বোনেরা পিছিয়ে নেই। নারী জাগরণের অগ্রদূতী মহীয়সী নিত্যস্মরণীয়া মরহুমা বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নাম আমি সগৌরবে উচ্চারণ করলাম, বুকে বল

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫২৭
[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৩১

> এল। আমাদের মেয়েরাও স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে আদালতে সমাজসেবায় নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে এসেছেন। ডাক্তার, নার্স, কবি, সাহিত্যিক-সংঘ উৎসাহের সঙ্গে বিজ্ঞ ললিতকলায় উৎকর্ষ সাধন করে চলেছেন–এ পরিচয় দিতে বুক ভরে উঠল। ভাষার জন্য, স্বাধীনতার জন্য, মারী-মড়কে, দুর্ভিক্ষে, সংগ্রামে আমার দেশের ছেলেরা মেয়েরা এক সাথে এগিয়ে এসেছে। বাইরে আমাদের দেশের পরিচয় অনুন্নত দরিদ্র দেশ বলে। হয়ত কিছুটা আমরা তাই, কিন্তু চিত্তের ঐশ্বর্য আমাদের প্রচুর। সব দেশের সব কালের সভ্যতার সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করে এসেছি। এখন বাংলার মায়েরা বোনেরা মেয়েরা-ছেলেরা যে কোন সভ্য দেশের সাথে মেলামেশা করে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে এগিয়ে আসতে দৃঢ়সংকল্প। পাকিস্তানের ধর্ম কর্ম সাংস্কৃতিক আদর্শকে আমরা আরও উন্নততর করব। সোভিয়েত মহিলাদের কর্মদক্ষতা দেশপ্রেম আতিথেয়তা এবং সৌহার্দ্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ জানালাম।[১]

সুফিয়া কামালের কৌতূহলী ও ভ্রমণপিয়াসী মন অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে খুঁজে নিয়েছে সারাবিশ্বের বিরলপ্রজ ব্যক্তিবর্গকে। অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন নোবেল বিজয়ী খালেদা এদিব হানুম, মহাকাশচারিণী ভ্যালেনটিনা তেরেশকোভা, আলজিরিয়া প্রতিনিধি, ভিয়েৎনামী সংগ্রামী নারীবৃন্দ এবং আরো অনেকে। মহাকাশচারিণীকে দেখার পর তাঁর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেন সুফিয়া কামাল। এ ক্ষেত্রে কবির নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশ করা হলো :

> মঞ্চের দিকে চাইলাম, দেখি উঠে দাঁড়িয়েছে মহাকাশচারিণী ভ্যালেনটিনা তেরেশকোভা। পরম বিস্ময় যে সে সামনে। মহাকাশচারিণী এই অল্প বয়সে ক্ষীণাঙ্গী একটি মেয়ে। জবরদস্ত বিরাট বিপুল কেউ নয়। কী আশ্চর্য! আমার মেয়ের মতো, সে তখনও বলে চলেছে তার অনায়াস আকাশ ভ্রমণ, মহাশূন্যের দৃশ্যাবলী এবং অভিজ্ঞতার কথা। বেলা ২টা এবেলার অধিবেশন শেষ। ভ্যালেনটিনা মঞ্চ থেকে নামবে। বিপুল করতালির শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই। সে চলে যাচ্ছে আমি আর অপেক্ষা করলাম না। পাশের দরজা দিয়ে ভিড় ঠেলে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। রক্ত যেন আমার কথা কয়ে উঠল। শান্ত মৃদু হাসিতে মুখ ভরিয়ে সেও আলিঙ্গন করল। পরিচয় দিলাম। ব্যাগে শঙ্খের আংটি ছিল, ওর আঙ্গুলে পরিয়ে দিলাম। তখন যদি আরও মহামূল্যবান কিছু পেতাম, ওকে দিয়ে খুশী হতাম। বাংলাদেশের মেয়েদের তরফ থেকে মেয়েদের হয়ে ওকে অভিনন্দন জানালাম। বললাম, শ্যামল কোমল পূর্ব পাকিস্তানে একবার আস না কেন। ও ধন্যবাদ জানাল। বলল : সব মেয়েই চেষ্টা করলে তার মতো মহাশূন্যচারিণী হতে পারে, কোনই কঠিন কাজ নয়।[২]

অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার পর সুফিয়া কামাল নির্ধারিত দলের সাথে ভ্রমণ করেন লেনিনগ্রাদ, জর্জিয়া, তিবিলিস, তেলাবিব শহর। ১২ মার্চ থেকে ১৮ মার্চ ভ্রমণ শেষে আবার মস্কোতে ফিরে আসেন তিনি। জর্জিয়ায় ভ্রমণকালে পাকিস্তানের অ্যাম্বেস্যাডার সলমন আলী সুফিয়া কামালকে ফোন করে জানান যে, মিনিস্টার ও সোভিয়েত-পাকিস্তান মৈত্রী সমিতির প্রেসিডেন্ট ড. সিদোরেস্কো সুফিয়া কামালকে মস্কোতে আরো তিন দিনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৩২

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫২৯-৫৩০

করেছেন। ফলে ২৩ মার্চ পর্যন্ত সুফিয়া কামাল মস্কো অবস্থান করেন। লেলিনগ্রাদের মিউনিসিপ্যাল হল, ম্যারিনেস্কি থিয়েটার, কীরোভ অপেরা, কাপড়ের মিল, স্মল্‌নে প্যালেস, হারমিটেজ, উইন্টার প্যালেস, ক্রিয়োভস্তি প্যালেস– প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন সুফিয়া কামাল। এসময় তিনি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্বাক্ষরবাহী স্থানগুলোর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং উপভোগ করেছেন বৈচিত্র্যময় আনন্দোৎসব; দেখেছেন ককেসাস পর্বত; যে পর্বতের কথা ছোটবেলায় রূপকথার গল্পে শুনেছেন। পরীর দেশ কোহ্‌কাফ মুলুক– সেই স্মৃতিময় দৃশ্য বাস্তবে অবলোকন করে অভিভূত হন তিনি। লেলিনগ্রাদ সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে এভাবে–

> লেলিনগ্রাদে এত দেখবার জিনিস আছে যে বছর ধরে দেখলেও বোধ হয় শেষ হবে না। সেন্ট পিটার্সবুর্গ-এর নাম বদলে 'লেনিনগ্রাদ হলি সিটি' রাখা হয়েছে। দেশীয় ঐতিহ্যের প্রধান কেন্দ্র এই শহর। এখানে স্মলনে প্যালেস, হারমিটেজ, সমাধি ক্ষেত্র, মর্মর মূর্তি, ক্যাথিড্রেল, উইন্টার প্যালেস, এসেম্বলি হাউজ, আর্টস বিল্ডিং, ক্রিয়োভস্কি প্যালেস, রাষ্ট্রাল প্যালেস, যেন পটের ওপর সাজানো ছবির মেলা। নেভা নদীর উপরে ছয়শো সেতু আছে। ২৫০টা বিশ্ববিদ্যালয় এখানে। ২ হাজার মেয়ে ডাক্তার আছেন। আর ১৭ হাজার শিক্ষিকা। ২৫ হাজার ছাত্র আছে ইউনিভার্সিটিতে। মহিলারাই প্রধানতঃ শিক্ষা বিভাগে বেশী। সমস্ত দেশে (লেলিনগ্রাদ) ষাট লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা লাভ করছে। সাংস্কৃতিক শিক্ষালয় আছে ৪৫টি। অসংখ্য দেখবার জিনিসের মধ্যে কতটুকু বা আমরা তিনদিনে দেখব। অনেকেই হাঁপিয়ে পড়লেন। আমি, সিলোনী মেয়েরা আর বুলগেরিয়ান বৃদ্ধা মহিলাটি বিশ্রাম না নিয়ে ঘুরে ঘুরেই দেখবার আগ্রহে তবু কিছু দেখলাম।[১]

১৫ তারিখ কবি জর্জিয়ায় পৌঁছলেন। জর্জিয়ায় পুরোনো নাম মুন্সনেভা। ইন্টারপ্রেটার সাবিনা ও নীনা কবিকে সকল তথ্য জানিয়ে দেন। এখানে অক্টোবর বিপবের শহীদ স্মরণে অনির্বাণ শিখা, মুনমেন্ট, গার্ডেন অব হিরোজ-প্যালেস অব স্পটস প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। তিবিলিস থেকে তেলাবিব গ্রামে রওয়ানা হয়ে গ্রামবাসীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন সুফিয়া কামাল এবং ওদের সাথে ভোজন-পর্বও খুব উপভোগ করেন তিনি। তবে ভাত খেতে পারেন নি বলে খাওয়ার তৃপ্তি খুঁজে পাননি কবি।

সিটি মিউজিয়ামে কবি ৬ষ্ঠ থেকে ১১শ শতাব্দীর ঢাকা, এবং মোগলযুগের আসবাবপত্র দেখতে পান। সে সাথে প্রত্যক্ষ করেন ধর্মের নামে অধর্ম করে যারা বিলাস-ব্যসনে মত্ত ছিলো সে সকল পাদ্রীদের ব্যবহৃত সামগ্রী। সুফিয়া কামাল আজীবন ধর্ম-ব্যবসায়ীদের ঘৃণার চোখে দেখেছেন। বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসেও তাঁর ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে উপদ্রবী ধর্মধ্বজীদের প্রতি। তাই তিনি বলেছেন, 'জরিনার বিলাস-সজ্জা, মদ্যপাত্র, সাধু পুরোহিতদের বিলাস বৈভব মনে

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৩৫

ঘৃণা এনে দেয়'। বিদেশি ঐতিহ্যের সঙ্গে তুলনায় কবি মনে মনে নিজ দেশে সুষ্ঠু-ব্যবস্থাপনার অভাব প্রকটভাবে উপলব্ধি করেন। সে উপলব্ধির বর্ণনা এসেছে এভাবে–

> মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি প্রজ্ঞায় উজ্জ্বল বিভাসিত এক একটি কাল। উত্থান পতন গৌরব হৃতমান এই নিয়ে কালচক্রের আবর্তন বিবর্তন কী অদ্ভুত। মানুষের শক্তি সাধ্য সাধ সাধনায় আশা আকাঙ্ক্ষায় গড়ে উঠে সভ্যতা। মহাকালের ভ্রুকুটি কুটিল নেত্রপাতে কঠোর কলের হাতে আবার তার অবসান। কী যে আশ্চর্য! দেখে দেখে আমার মনে হল দিলী আগ্রা লক্ষ্ণৌ ফতেপুর সিক্রি লাহোর হায়দরাবাদ মূলতান পেশোয়ার-এর মুসলিম ভাস্কর্য ঐশ্বর্যের কথা। এখানেও মুসলিম কালচারের প্রাধান্য। আমাদের বাংলাদেশ, ঢাকা, বরিশাল, রাজশাহী, চাটগাঁর পুরাতন ঐতিহ্য কি কোথাও কম? কিন্তু এত সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা অনেক জায়গায় শিথিল।[১]

সুফিয়া কামাল মানবসেবাকেই জীবনের সবচেয়ে বড় ধর্ম বলে জেনেছেন। তারই প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা যায় গ্রন্থটিতে মুদ্রিত একটি ঘটনাসূত্রে। মস্কো আসার পূর্বে ঢাকায় একটি ছেলের চোখের সমস্যা দেখে এসেছেন সুফিয়া কামাল। একজন রাশিয়ান ডাক্তার থেকে প্রেসক্রিপশন নিলেও ঔষধ জোগাড় করতে পারেনি সে। ফলে ছেলেটির প্রায়-অন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। কবি সোভিয়েতে আসার সময় প্রেসক্রিপশনটি নিয়ে এসেছিলেন এবং মিসেস বিকোবা নাম্নী একজন রাশিয়ান নারী, যিনি বাঙলার একটি সংকলন রচনা করেছেন, তিনি সুফিয়া কামালের সাথে দেখা করতে এলে পেসক্রিপশনটি তাকে দেয়া হয়। মিসেস বিকোবা পেসক্রিপশন অনুযায়ী কবিকে ঔষধ এনে দিলেন। এক বৎসরের কোর্স দেয়া হলো অসুস্থ ছেলেটির জন্য। কবি বিকোবাকে ধন্যবাদ জানালেন এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। সুফিয়া কামাল ভ্রমণকালেও মানবসেবার মহান ব্রতের কথা বিস্মৃত হননি। তাঁর চারিত্রিক মাহাত্ম্য এই একটি ঘটনার মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়েছে চমৎকারভাবে।

জর্জিয়াতে কবি ৭৬০ ফুট উঁচু ককেসাস পবর্তে অবস্থিত মিনিস্ট্রি অব কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট মাদাম কামাদার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এখানকার যাত্রাপথের সঙ্গে কবি সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম এবং সিলেটের। সেখানে ভোজের ব্যবস্থা হয়। ভোজের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন কবি এভাবে–

> আমরা ৬টায় গিয়ে পৌঁছলাম। অনেক ভদ্রমহিলা, ভদ্রলোক, মিনিস্টার, ডাক্তার, প্রফেসর, ফটোগ্রাফার, ব্যালে নর্তক-নর্তকী এবং গ্রাম্য নর্তকী, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন। অত উচুঁতে বাতাসে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বহু সমাদরে সবাই সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। ... এখানে কেউ ইংরেজী তো জানেই না, জর্জিয়ান ফারসী মিশ্রিত ভাষা ছাড়া রাশিয়ান ভাষাও জানে না। কিছুই কিন্তু তাতে আটকাল না। আমাদের ইন্টারপ্রেটার সাবিনা নীনা আর একজন ফটোগ্রাফার ইংরেজি জানা ও রাশিয়ান জানা ছিলেন। ওখানের একজন মিনিস্টারও ইংরেজী ও জর্জিয়ান ভাষা জানেন। এঁদেরই মাধ্যমে কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা সব কিছুই চল। ছেলেরা কেউ আমাকে মা

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৪১

ডাকল, কেউ বোন ডাকল, হাতের লেখা নিল। ফুল দিল, গান গেয়ে শোনাল, নাচল। ... ৭টায় খাওয়া শুরু হল আর রাত সাড়ে দশটায় শেষ হল। খাবারেও কি রকমের অন্ত আছে ? রুটি বিস্কুট কেক চকোলেট গরুশুয়ার ভেড়া মুরগী মাছ ব্যাঙের ছাতা ডিম আলু পেঁয়াজ শসা কুমড়া কফি টমাটো, মরিচ পুদিনা ধনিয়া পাতা রসুনের রস শসা সরিষা শাক মটর গমসিদ্ধ দই আইসক্রিস পনির ছানা; কে কত খাবে খাও। আমার জন্য আর সিলোনের মেয়েটার জন্য ঠাণ্ডা পানি এল। আর সোডা লেমনেড মিঠাপানি মদ। মদ যে কত রকম। আমার গা গুলিয়ে উঠল। খাব কি। শেষ হলে বাঁচি।[১]

১৮ তারিখ জর্জিয়া থেকে মস্কোতে ফিরে এলেন কবি। এয়ারপোর্ট থেকে কো-অপারেটিভ হাউজে এবং পরে ট্রেড ইউনিয়ন হাউজ ভ্রমণ করেন কবি। ট্রেড-ইউনিয়নের সুব্যবস্থা অবলোকন করে কবি মুগ্ধ হন এবং নিজ দেশের মেয়েদের দুরবস্থার কথা ভাবেন। খাঁটি দেশপ্রেমিক কবি, তাঁর সত্তায় অন্তর্লীন হয়ে আছে স্বদেশভাবনা। সেই ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে মস্কোতে ভ্রমণকালীন কর্মসূচিতে–

তক্ষুনি গাড়ীতে উঠে যেতে হল ট্রেড ইউনিয়ন হাউসে। সেখানে বহু মহিলা অপেক্ষা করে আছেন। পরিচয় আদান-প্রদান হল। ফল-শরবত খাওয়ালেন। এখানে যাঁরা সভ্য হবেন, মাসে পাঁচ রুবল দিয়ে তাঁরা খাওয়া পাবেন। সমস্ত কিছু মহিলারা ব্যবস্থা করছেন অত্যন্ত সুষ্ঠু সুন্দরভাবে। ঘুরে ফিরে বিভাগগুলি দেখে বড় ভালো লাগল। আমাদের দেশে কি এ রকম হতে পারে না? আমাদের মেয়েরাও খাটছে, বাড়ী গিয়ে স্বামী সন্তান-সংসার সামলে অক্লান্ত পরিশ্রমে শরীর যে অল্প দিনেই ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। অথচ এরা সন্তানদের সুষ্ঠু পরিচর্যায় স্বাস্থ্যবান হতে দেখছে পাইওনিয়ার হাউজে। স্বামী-স্ত্রী ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে পরিশ্রমের পর নিশ্চিন্ত বিশ্রাম পাচ্ছে। সন্ধ্যায় স্বামী-সন্তানসহ গৃহের আনন্দ পরিবেশে জীবনকে নিশ্চিন্ত করে প্রচুর প্রাণশক্তি জোগাচ্ছে। এ যে আমাদের স্বপ্ন। কখনও হয়ত এ আশা সফলও হতে পারে।[২]

কবি হতাশ নন, আশাবাদী। এই আশাবাদই তাঁর সংগ্রামী জীবনের পাথেয়। দেশের দিশা তিনি। তাঁরই প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে নিবেদিত হয়েছে সন্তোষ গুপ্তের কবিতা। কবিতাটি উলেখ করা হলো :

ঘরে ঘরে শুভ মাঙ্গলিক
বারুদের গন্ধভরা হাওয়া উন্মন,
আমাদের ক্ষুব্ধ জাগরণ
পেয়েছে তোমার মুখে ভাষা–
মায়ের অপত্য স্নেহে বিপন্ন স্বদেশে
দিশা দিলে যৌবনে বাহিত
দুঃখের ভালোবাসা।[৩]

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহঃ প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৪১

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৪২

[৩] লুৎফর রহমান রিটন (সম্পা.), *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, প্রথম প্রকাশ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ফাল্গুন ২০০০, পৃষ্ঠা-৩৬

১৯ মার্চ থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত মস্কো অবস্থান করেন কবি। এ পর্যায়ে তিনি তখন আর ইন্টারন্যাশনাল উইমেন ডে-র অতিথি হিসেবে নয়, সোভিয়েত-পাকিস্তান মৈত্রী সমিতির অতিথি হয়ে। ইন্টারপ্রেটার সাবিনা নীনা বিদায় জানালে নতুন ইন্টারপ্রেটার হিসেবে বাংলা জানা স্টেট ইউনিভার্সিটির ছাত্র নিকোলাইকে কবির জন্য নিয়োগ দেয়া হয়। কবি তাকে সঙ্গে নিয়ে পুশকিন লাইব্রেরি, লেনিন লাইব্রেরি, জার-জারিনার সমাধি দর্শন করেন।

২০ মার্চ কবি বৈরুতগামী সাহিত্যকদের সাথে পরিচিত হন। সবাই এসেছেন পশ্চিম বাংলা থেকে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও এ দলে ছিলেন। ওদের সাথে বৈরুত সাহিত্য অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার ইচ্ছে থাকলেও অ্যামব্যাসি থেকে অনুমতি না পাওয়ায় কবির সে-ইচ্ছে পূরণ হয়নি।

২১ মার্চ ফ্রেন্ডশিপ হাউজে রাজনীতিবিদদের সাথে কবির আলোচনা অনুষ্ঠান হয় কফি পার্টিতে। আলোচনায় রাজনীতির বিষয় ঠাঁই পায়নি বরং কবির দেশের খাবার, পোশাক, সংস্কৃতি বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়। সেখান থেকে কবি উপস্থিত হন ইনস্টিটিউট অব এশিয়ার পাকিস্তান বিভাগে উপস্থিত হন। ইনস্টিটিউটের প্রধান ও পাক-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির সহ-সভাপতি অধ্যাপক ইউ. বি. ডি. গানকোভস্কি, পাকিস্তান বিষয়ে গবেষক ড. ভস্কালিয়েভ, প্রফেসর দিয়াকভ, মাদাম ড. পলোস্কায়া, পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি বিষয়ক গবেষক ড. বায়ানভ, মাদাম বিকোবা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মাদাম বিকোবা বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ লিখেছেন। সবার সাথে কবি পরিচিত হন এবং ভিজিটার্স বুক-এ বাংলায় মন্তব্য লেখেন।

২০ মার্চ ফ্রেন্ডশিপ হাউজে উৎসবময় পরিবেশে আতিথ্য গ্রহণ করেন কবি। সিদোরেঙ্কো কবিকে সবার সাথে পরিচিত করিয়ে দেয়ার পর সবাই কবিকে ফুলের মালায় বরণ করলেন। সে দিনের বর্ণনা কবির বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করা হলো :

> সিদোরেঙ্কো আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, অনেক প্রশংসাবাদ করলেন। আমি বাংলায় বললাম। নিকোলাই রাশিয়ান ভাষায় তা অনুবাদ করে শোনাল। সবাই ফুলের মালায় আমাকে ঢেকে দিলেন, সবচেয়ে বিপদ ও দারুণ অবস্থা হল আমার যখন মিঃ গান্‌কোভস্কি বললেনঃ বহু যুগ আগে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছিলেন এদেশে, আর আজ এক কবিকে পেলাম। তখন আমার মাথা ঘুরে ঘামে সর্ব শরীর ভিজে উঠছিল অত শীতের মধ্যেও। কোথায় রবীন্দ্রনাথ! আর কোথায় আমি! তওবা! তওবা! ও কথা ভাবা যায় নাকি! ওরা বলে বলুক। সবাই বড় আনন্দে আদরে আমাকে আপ্যায়িত করলেন। বার বার 'পাসিভা' (ধন্যবাদ) বলে আমি মাথা পেতে ওদের দেওয়া ফুলমালা গ্রহণ করে তৃপ্ত হলাম। সব সময়ই কিছু আদান-প্রদান কিংবা একটু সাহায্য পেলেই 'পাসিভা' শব্দটি আপনিই মুখ থেকে বের হয়ে আসে। ভাষা ত আমি কিছুই বুঝতে পারিনি, শুধু 'পাসিভা' (ধন্যবাদ), 'খরোশা' (ভালো), 'দা, দা' (হ্যাঁ)-এই পর্যন্তই; কিন্তু আন্তরিকতায় পূর্ণ হয়ে ভাষার সমস্যা মিটে গেছে।[১]

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহঃ প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৪৭

সভায় সিদোরেঙ্কোর বক্তব্যে পাকিস্তানের আতিথেয়তার প্রশংসা শুনে কবিচিত্ত মুগ্ধ। তবুও কবির আক্ষেপ– নিজ দেশের মানুষ প্রকৃতির অজস্র দানকে যথাযথ কাজে লাগাতে পারছে না বলে। অনুষ্ঠানে সেখানকার প্রসিদ্ধ ব্যালে 'সোয়ান লেক' উপভোগ করেন কবি। সভা শেষে সবাই কবিকে আরো সপ্তাহ খানেক মস্কোয় থেকে যাবার অনুরোধ করলেও কবির আপত্তি ছিল বাড়ি থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং সে সাথে বৈরুত যাবার অনুমতি না মেলায়। হোটেলে ফিরে কবি শেষ বারের মতো মস্কোর রাত্রি অবলোকন করলেন– 'শেষবারের মতো বিনিদ্র রজনীর মস্কো-বাস। বরফ পড়ছে। অদ্ভুত সুন্দর মহানগরী অর্ধচেতন। আমার বিদেশ-বাস শেষ হতে চলেছে।' সকাল বেলা কবি মস্কো ত্যাগের উদ্দেশ্যে এয়ারপোর্ট রওনা হলেন। সেখানে বিকোবা, কাতায়েভ, নীনা, ড. দানিলচুক, নিকোলাইসহ সবাই টিকিট-পাসপোর্ট নিয়ে কবির জন্য অপেক্ষা করছে। সবার আন্তরিকতা ও ভালোবাসায় মুগ্ধ কবির অন্তর। সে আন্তরিকতার বর্ণনা কবি মুদ্রিত করেছেন এভাবে–

> এয়ারপোর্ট পৌঁছে আর বসবার সময় নেই, জলিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্লেনে উঠলাম। দানিলচুক প্লেন এর মধ্যে এসে এয়ার হোস্টেসকে বললেন, আমি শূয়ার, সসেজ ভদকা খাইনা, আমাকে যেন ভালো পছন্দ মতো খাবার চা কফি পানি দেওয়া হয়। প্লেন-এর সিঁড়ি টানবে, তখনও পরম আগ্রহে বার বার করে দানিলচুক এয়ার হোস্টেসকে আমার কথা বলছেন, যত্ন নিতে বলছেন, পরম সমাদরে হাতে চুমু খেয়ে তিনি নেমে গেলেন। আমার দুই চোখ পানিতে ভরে উঠল। যেন ছোট ভাইটি বড় বোনকে বিদেশ যাত্রা করিয়ে দিয়ে গেল। মমতায় সিক্ত হয়ে উঠল মন, মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের কবিতা :
>
> কত অজানারে জানাইলে তুমি
> কত ঘরে দিলে ঠাঁই
> দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
> পরকে করিলে ভাই![১]

সুফিয়া কামালের মহৎ গুণের মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মানুষের প্রতি ভালোবাসার গুণটি। সদাপ্রফুল্ল হাস্যময় মানুষটি সকলকেই পরম আপনজন ভেবে কাছে টেনেছেন, সুখ-দুঃখে ছায়াতরুরূপে প্রশান্তি দিয়েছেন। মস্কোতে স্বল্প সময়ের অবস্থানেও তিনি অপরিচিত, অজানা বিদেশিদের সহজেই আপন করে নিয়েছেন। তাঁর বিদায়কালে সে আন্তরিকতারই প্রকাশ লক্ষ করা যায়। ঢাকাগামী সুফিয়া কামাল তেহরানের মেহেরাবাদ এয়ারপোর্টে সহযাত্রী অস্ট্রেলিয়ান মহিলার সঙ্গী অসুস্থ হয়ে পড়লে খুব বিব্রত হয়ে পড়েন। তাৎক্ষণিকভাবে সুফিয়া কামাল বরফের ব্যবস্থা করে মাথায় বরফ ও মুখে কিছু খাওয়ানোর পর সুস্থ হয়ে ওঠে যাত্রীটি। বিদেশে অপরিচয়ের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে তিনি মানবসেবায় নিজেকে এভাবে নিয়োজিত করেছেন। দেশ, কাল পাত্র বিচারে নয়, তিনি যে সর্বজনীন মানব কল্যাণ কামনায় উদ্বোধিত

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৪৮

ছিলেন তা এর মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়। তাঁর এই সেবাব্রতী মনোভাবের পরিচয় যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা উপকৃত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আতাউস সামাদের মন্তব্য স্মরণীয় :

> তিনি ছিলেন মায়াবতী অর্থাৎ স্নেহাশীলা। তাঁর সেই পরিচয় আমরা সরাসরি পেয়েছিলাম ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে, যদিও বিষয়টির সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্পর্ক ছিল না। আমাদের ছেলে সন্তু ছোটবেলায় হাঁপানিতে খুব ভুগত। আমার স্ত্রী রেণুকে সম্ভবত আমার ভাবী শহীদ আশফাকুস সামাদের মা সাদেকা সামাদ বলেছিলেন যে, বেগম সুফিয়া কামাল ভালো দেশী বা টোটকা ওষুধের কথা জানেন এবং অসুখ সারার জন্য দোয়াও করেন। সেই যুদ্ধের দিনগুলোতে ধানমন্ডির বিশ্বখ্যাত ৩২ নাম্বার রোডে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের একচ্ছত্র নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের তখন পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে দিয়ে বেশ কয়েকবার রেণু ও আমি বেগম সুফিয়া কামালের কাছে গেছি এবং সন্তুর জন্য ওষুধ ও দোয়া এনেছি। তিনি হাসিমুখে দোয়া দিয়েছিলেন।[১]

২২ তারিখ মস্কো থেকে করাচি এসে পৌঁছেন কবি। করাচি এসে কবির অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে এভাবে– 'ঢাকার সময় সাড়ে দশটায় এসে প্লেন করাচী থামল। বরফ নয়, পাথর, পাথরে মাটি হোক, তবু মাটির গন্ধ পেলাম।' সোভিয়েটের দিনগুলি গ্রন্থের দ্বিতীয় রচনা 'সম্বর্ধনার উত্তরে'। ৪ঠা এপ্রিল ১৯৬৭ সালে ঢাকাস্থ সোভিয়েট কন্সাল জেনারেল কর্তৃক সুফিয়া কামালকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। সংবর্ধনার উত্তরে সুফিয়া কামাল সোভিয়েত রাশিয়ায় ভ্রমণ বিষয়ে ভাষণ দেন এবং সে দেশ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন এবং সে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সফলতা সম্পর্কে দেশবাসীকে অবগত করেন। ভাষণের সূচনায় তিনি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন অত্যন্ত বিনয়সহকারে ঢাকার রুশ কন্সাল-জেনারেল মিঃ আদিরখায়েভকে। ভাষণের কিয়দংশ নিম্নে উল্লেখিত হলো :

> ঢাকার রুশ কন্সাল-জেনারেল মিঃ আদিরখায়েভ যে আমার সংবর্ধনার জন্য এত বড় আয়োজন করলেন তাতে আমি সঙ্কুচিত বোধ করছি। আমি দেশবরেণ্য নেতাও নই, স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিকও নই; আমি সামান্য একজন কবি এবং সমাজসেবিকা। তবে আমি ধরে নিচ্ছি যে এখানে তিনি আমাকেই শুধু ব্যক্তিগতভাবে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন না, বরং আমার মারফত পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র নারী সমাজকে সম্মানিত করেছেন।[২]

ভাষণে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুষ্ঠু আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের উল্লেখ করা হয়। বিশেষত, নারীর আত্মোন্নয়ন ও রাষ্ট্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণে যে এক বৈপ্লবিক ধারার সূচনা হয়েছে তা অবলোকন করে তিনি যে অভিভূত হয়েছেন তা উল্লেখ করেছেন তাঁর বক্তৃতায় :

> স্বদেশ থেকে সোভিয়েত জনগণের বিভিন্নমুখী সাফল্যের সংবাদ আমরা প্রায়ই পেয়ে থাকি। এবারে আমি তা স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ পেলাম। সেখানকার লোকদের মহান দেশপ্রেমমূলক কার্যকলাপ

[১] লুৎফর রহমান রিটন (সম্পা.), *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪০
[২] *সুফিয়া কামাল রচনা সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫০

> দেখে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। বিশেষ করে মেয়েদের যে শক্তিময়ী রূপ রাশিয়ায় দেখলাম তা অভূতপূর্ব। আমরা মস্কো থেকে লেনিনগ্রাদ-তিবিলিসি ঘুরে এলাম। দেখলাম মেয়েদের হাতে মিল, ফ্যাক্টরী, কারখানা, ট্রেড ইউনিয়ন, কো-অপারেটিভ কর্মসংস্থা সমস্তই আশ্চর্য শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে। মা হিসেবে নারী জাতির এই উন্নতিতে আমি গৌরব বোধ করছি।[১]

রাশিয়ার উন্নতির মূলে যে নারীশক্তি নিহিত তা তিনি মনেপ্রাণে অনুভব করেছেন। স্বদেশের মাটিতেও একদিন এই উন্নয়নের বৈপ্লবিক-জোয়ার বইবে– এরকম আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি :

> রাশিয়া যে আমাদেরই মত অনুন্নত অবস্থা থেকে সভ্যতার উঁচু শিখরে উঠতে পেরেছে, তা অনেকটা সম্ভব হয়েছে সে দেশের নারীদের জন্য। তারা আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন। সমাজের সর্বস্তরে পুরুষের সাথে পাশাপাশি মেয়েরা কাজ করে চলছে। এমন কি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র পরিচালনার কাজেও তাঁরা পিছিয়ে নেই।
>
> সোভিয়েট ইউনিয়নে মহিলাদের যে কর্মক্ষমতা, স্বাধিকার বোধ ও আত্মচেতনা দেখতে পেয়েছি তাতে আমি চমৎকৃত হয়েছি। আমি বিশ্বাস করি, সোভিয়েট মেয়েদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং তাঁদের পথ অনুসরণ করে আমাদের মত অনুন্নত দেশগুলির মেয়েরাও একদিন সারাবিশ্বে গৌরবের স্থান পাবে। রাশিয়ার মেয়েদের ত্যাগ, শ্রম এবং জীবনবোধ আমাকে বিস্মিত করেছে, আমি মুগ্ধ হয়েছি তাঁদের আন্তরিকতায়।[২]

মস্কোর হোটেল ইউক্রিনায় অবস্থানকালে কবি রাত্রের আলোতে মস্কো নদীর পাশে মাথায় তুষার কিরীট পরিহিত একটি কৃষ্ণমূর্তি দেখতে পান। এক দেশভক্ত কৃষক কবির মূর্তি ছিলো সেটি। সামান্য একজন কৃষক-কবির মূর্তি স্থাপনে রাশিয়াবাসী যে বিরল কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছেন তা তিনি উল্লেখ করেছেন এবং স্বদেশের কীর্তিমান ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে আমাদের যে অনীহা তা তিনি ব্যক্ত করেন এভাবে–

> আমি যে একজন কবি, তা আমি সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়ে যেন নতুনভাবে উপলব্ধি করলাম। সে দেশ কবি সাহিত্যিকদের কদর জানে। লেখক আর পাঠকের মধ্যে এমন নিবিড় সম্পর্ক বোধ হয় আর কোন দেশেই নেই। নিরক্ষরতা নেই বলে পাঠকের সংখ্যা খুব বেশী–বলা যায়, সারাদেশ জুড়েই তাদের পাঠক। এক একটি বই ছাপা হচ্ছে লাখ লাখ কপি; আর সে যদি ইয়েভতুসেনকার কবিতা হয়, তা হলে ত কথাই নেই। সব কপিই মুহূর্তে নিঃশেষ। শুনলাম সোভিয়েত সমাজে লেখকরা ও বৈজ্ঞানিকরা সবচেয়ে বেশী মর্যাদার অধিকারী। আর্থিক দিক থেকেও তারা সবচেয়ে বেশী স্বচ্ছল। আর সে তুলনায় অনেক পশ্চিমা দেশে আজও লেখকরা খ্যাতি অর্জন করেও আর্থিক দিক থেকে প্রয়োজনমত স্বচ্ছলতা অর্জন করতে পারেন না।[৩]

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫১

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫১

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫১

তাঁর ভাষণে স্থান পেয়েছে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতার কথা, যা তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যক্ষ করে এসেছেন এবং প্রত্যাশা করছেন বাংলাদেশেও যেন এরকম সুদিন প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈষম্যহীন সুন্দর সমাজ নির্মাণে সুফিয়া কামালের যে আন্তরিক প্রয়াস তা এ ভাষণে আবারও নতুন করে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর জবানিতেই সে কথা উল্লেখ করা হলো :

> সারা দুনিয়ার মেয়েদের জন্য এই আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসটি স্মরণীয় হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশের ক'জন মা-বোনই বা এ খবরটি রাখেন– কজন পুরুষ– বা এ দিনটিতে তাঁদের মাকে বোনকে স্ত্রীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, উপহার দিচ্ছেন? আমি রাশিয়ায় দেখে এলাম ৮ মার্চ পুরুষরা কিভাবে মেয়েদের সম্মান জানান। তাঁরা এগিয়ে এসে কর্মরতা মহিলাদের সাহায্য করেন, অনেক সময় তাঁদেরকে বিশ্রাম নিতে দিয়ে নিজেরা সে কাজ সেরে নেন– এমনকি রান্নাবান্নার কাজও। তাছাড়া, ফুল আর হরেক রকম উপহার তো আছেই। আমি আশা করি, আগামীতে আমাদের মেয়ে-পুরুষেরা এই দিনটি সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। আজকের এই সভায় উপস্থিত মহিলা কর্মীদের আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করবো তারা যেন ঢাকাতে প্রত্যেক বৎসর মার্চের ৮ তারিখে 'মহিলা দিবস' উদযাপনে সচেষ্ট হন। তাহলে এ দিনটি ঈদ, নববর্ষ এবং অন্যান্য উৎসবের মত আমাদের জাতীয় জীবনের অঙ্গে পরিণত হবে।[১]

সোভিয়েটের দিনগুলি গ্রন্থের তৃতীয় রচনা 'নারীস্থান'। রচনাটিতে সুফিয়া কামাল প্রাতঃস্মরণীয় মহীয়সী রোকেয়াকে স্মরণ করেছেন এবং তাঁর অমর স্মৃতি এদেশের নারীদেরকে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করুক– এই প্রার্থনা জানিয়েছেন। ছোটবেলায় বেগম রোকেয়ার 'মতিচূর' বইতে 'নারীস্থান' রচনা পড়েছিলেন তিনি। সেই নারীস্থানকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছে সোভিয়েত রাশিয়ায়। তাই সোভিয়েতের সর্বত্র ভ্রমণকালে তাঁর হৃদয়-জমিনে বিরাজ করেছিলেন সেই আদর্শ ব্যক্তিত্ব–বেগম রোকেয়া :

> মায়েরা বোনেরা মেয়েরা সন্তান ভাই স্বামীর সহযোগিতায় সংসার সমাজ দেশ জাতিকে কী করে উন্নত মহান সাম্য ও শান্তির পথে চালিত করেছে তা বিস্ময়কর। সেবায়, মিল-ফ্যাক্টরী-কারখানা কো-অপারেটিভে, ট্রেড ইউনিয়ন– সবস্থানে। তাদের দাওয়াত রক্ষা করতে গিয়ে বেগম রোকেয়ার কথাই মনে হল। তাঁরই স্বপ্নের সৃষ্টি এ নারীস্থান সত্যিই বাস্তবায়িত হয়েছে–হোক না সে পৃথিবীর যে কোন দেশে, যে কোন জাতির মধ্যে।[২]

'সোভিয়েটের সুখী সমাজ' রচনায় সুফিয়া কামাল সুখের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনাকে। বিশেষত রাষ্ট্রকর্তৃক শিশুদের পরিচর্যার দায়িত্ব পালিত হওয়ায় সেখানে মায়েরা হয়েছে ভারমুক্ত। এর ফলে সমাজ-উন্নয়নে নারীরা জোরালো ভূমিকা রাখতে

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫২

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫৪

সক্ষম হয়েছে। সর্বোপরি তারা তাদের মেধা ও শক্তিতে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। রাষ্ট্রও মায়েদের জন্য দীর্ঘ সময় বরাদ্দ করেছেন সন্তান জন্মদানের প্রয়োজনে। অর্থাৎ 'মেটারনিটি লীভে'র সময়সীমা করা হয়েছে ৬ মাস থেকে ১ বৎসর পর্যন্ত। গর্ভের শিশুই আগামী দিনের কর্ণধার। সে সত্যতা উপলব্ধি করেই মায়ের বিশেষ পরিচর্যা পর্বটিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শিশুর ভারও রাষ্ট্র বহন করে। শিশুদের খাওয়া, পড়া, শিক্ষা, চিকিৎসা, জীবনযাপন পন্থা সমস্তই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সুফিয়া কামাল মনে করেন–

> বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর ধরে সোভিয়েট রাষ্ট্র যা কিছু মহান কাজ করেছে, শিশুদের সমস্যা সমাধান তার মধ্যে প্রধান বলেই আমার বিশ্বাস। মহান দেশের এই মহতী প্রচেষ্টাকে আমি সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করি। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হোক আমাদের উত্তরসূরিরা।[১]

সোভিয়েটের দিনগুলি গ্রন্থটিতে সুফিয়া কামাল সে দেশের আলোকে নিজ দেশকে গড়ে তোলার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। সে আন্তরিক প্রয়াসের অনুরণন লক্ষ করা যায় তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে। মূলত, নারীর জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরিতে তিনি সোচ্চার ছিলেন। দেশের উন্নয়ন যে এর অভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়–সে সত্যতা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এ প্রসঙ্গে মহিলা পরিষদের নারীনেত্রী মালেকা বেগমের মন্তব্য স্মরণীয় :

> নারী আন্দোলনের ডাক এসেছে। বিনা দ্বিধায় হেঁটেছেন। কথা বলেছেন। জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে গিয়েছেন। ভাষাহারা অধিকারহারা দরিদ্র নির্যাতিত, নারী সমাজের মুখে হাসি ফোটাতে তিনি পরিশ্রম করেছেন। ... নারী কেন বৈষম্যপীড়িত, কিভাবে আইন সুষ্ঠু হতে পারে, স্বাধীন বাংলাদেশের নারী কেন নির্যাতিত হবে, পারিবারিক নির্যাতন সহ্য করে কেন? নিহত হবে কেন, যৌতুকসহ নানা কারণে, তিনি বলেন, মানব নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বেগম রোকেয়ার আদর্শ অনুসরণ করে নির্যাতিত অসহায় নারীর জন্য সহায়তা করা, নারীর সার্বিক সমতার জন্য সংগ্রাম করা, আইন সংস্কার করা, নারী আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে তিনি অবিচল।[২]

গ্রন্থটিতে সুফিয়া কামালের অনবদ্য শৈল্পিক দৃষ্টির পরিচয় বিধৃত। বর্ণনাধর্মী ভাষার সঙ্গে আলঙ্কারিক সৌকর্যময় শব্দগুচ্ছও এতে ব্যবহৃত হয়েছে। উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা-সমাসোক্তি অলংকারের ব্যবহারও লক্ষণীয়। যেমন :

১. মুহূর্তে সে যন্ত্রবিহগ আকাশে পাখা মেলল। (স. ক. র. স-৫২২)

২. প্রথমেই এল শিশুরা–পাইওনিয়ার হাউজের শিশুর দল। ফুলের মতো সুন্দর। (স. ক. র. স-৫২৫)

৩. পথের উপর পাহাড়ী ঝরণার স্বাগতম ধ্বনি গ্রামের প্রবেশপথে এলে কানে বাজে। (স. ক. র. স-৫৩৯)

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫৬

[২] মালেকা বেগম (সম্পা.) *রাজপথে জনপথে সুফিয়া কামাল*, প্রথম প্রকাশ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, জুন ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১৪

৪. এক সময় বারান্দায় শীতের মধ্যেও এসে দেখলাম ঈদুজ্জোহার চারদিনের চাঁদ মেঘশূন্য গগনে হাসছে। (স. ক. র. স-৫৪২)

৫. আর তার পাশে আমাকে আর পুরিকে মনে হল দৈত্যপুরীর দেশের মানুষের পাশে গালিভারের মতো। (স. ক. র. স-৫৪২)

৬. এত বিচিত্র দেখবার জিনিস আছে, ক্ষণে ক্ষণে যার রূপ বদলায়, মুহূর্তে যার উদ্ভব আর বিলয়, তাই আমি বাইরে চেয়ে চেয়েই চোখের তৃষ্ণা মেটাতে চেষ্টা করি। (স. ক. র. স-৫৪৯)

ভ্রমণ মানুষের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে, মনকে করে পরিশীলিত। সুফিয়া কামালের *সোভিয়েটের দিনগুলি* ভ্রমণকাহিনীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে একটি অনুকরণযোগ্য দেশের কর্মকাণ্ড যা আমাদের দেশের উন্নয়নের স্বার্থে গ্রহণযোগ্য। তবে আজকের বাংলাদেশ সে দেশের প্রায় সমপর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। নারীর অব্যাহত উন্নয়নে দেশ এগিয়ে চলছে। সুফিয়া কামালের আশাবাদ একদিন নিশ্চয়ই সফলতার মুখ দেখবে। গ্রন্থটিতে সুফিয়া কামালের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা তাঁর পরিশীলিত চিন্তা-চেতনা এবং নারী-উন্নয়ন বিষয়ে প্রাগ্রসর ভাবনার স্বাক্ষর বিধৃত।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আত্মজীবনীমূলক রচনা

একালে আমাদের কাল

সুফিয়া কামালের আত্মচরিতমূলক রচনা *একালে আমাদের কাল*। ১৯৮৮ সালে প্রকশিত গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে পৃথিবীর নিপীড়িত শোষিত নারী সমাজকে। স্বয়ং প্রকাশক গ্রন্থটির উৎস প্রসঙ্গে 'প্রকাশকের কথা' শিরোনামে বলেছেন :

> ... মাসিক সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা গণসাহিত্য প্রায় দশ বছর আগে (১৩৮৫ সালে) সুফিয়া কামাল রচিত 'স্মৃতি : আমার কথা' (অসম্পূর্ণ) প্রকাশিত হয়েছিল। সে লেখার সাথে তাঁর কাছ থেকে সংগৃহীত আরো কিছু অপ্রকাশিত লেখা যোগ করে প্রকাশিত হলো 'একালে আমাদের কাল'।... এটি আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা কোনটিই নয়, কিন্তু তাঁর আত্মজীবনীর সূচনা হিসেবে 'একালে আমাদের কাল' পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে বলে আশা করি।[১]

স্বয়ং সুফিয়া কামাল এ গ্রন্থ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা এরকম :

> কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীতকার সিকান্দার আবু জাফর আমাকে অনুরোধ করেছেন সেকালের কথা কিছু কিছু লিখে যেতে। আমি যা লিখতে পারি লিখে যাব। কিন্তু সে লেখা যেন আত্মজীবনী বলে কেউ মনে না করেন। আত্মজীবনী মহাত্মা গান্ধীই সার্থকভাবে লিখেছেন। অন্য মানুষের তা অসাধ্য। আমি মাত্র সেকালে আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, দেশীয় প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার যতটুকু জানতে পেরেছি তাই লিখে রাখবার চেষ্টা করব।[২]

*একালে আমাদের কাল*কে আত্মজীবনীধর্মী বা স্মৃতিকথাধর্মী না বলে বলা যায়, এটি সুফিয়া কামালের জীবনের খণ্ডাংশের কিছু বিচ্ছিন্ন বিবরণমাত্র; যা স্মৃতিকথার আদলে বর্ণিত হয়েছে। নওয়াব পরিবার বা জমিদার-পরিবারের চালচিত্র; তাদের ঐশ্বর্য, বিলাস-ব্যসন, পারিবারিক আনন্দ-উৎসব, পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ইত্যাদির পাশাপাশি ইংরেজ-সরকারের খাজনা আদায়, গান্ধীজির আগমন, শায়েস্তাবাদের নামকরণ-প্রসঙ্গ, বেগম রোকেয়ার কর্ম-প্রবাহ প্রভৃতি গ্রন্থটিতে স্মৃতিচারণমূলক অনুষঙ্গে বিধৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি আত্মজীবনবৃত্তান্ত না কি সমকালীন জনজীবনবৃত্তান্ত সে সম্পর্কে পাঠকচিত্তে কৌতূহল জাগতেই পারে। এই গ্রন্থে বিধৃত বক্তব্য প্রসঙ্গে সুফিয়া কামালকে নিয়ে বিস্ময়কর মন্তব্য করেছেন দ্বিজেন শর্মা। তিনি বলেছেন–

> তাঁর স্মৃতিচারণ (একালে আমাদের কথা, ১৯৮৮) আমাকে বড়ই ধন্ধে ফেলে, মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে বংশানুসৃতি ও পরিবেশের তুলনামূলক গুরুত্বের হিসাব ও নিকাশে গোলমাল বাধায়

[১] *সুফিয়া কামাল রচনা সংগ্রহ: প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৬৭
[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫৯

> অবরোধবাসিনী। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সকল সুযোগ-বঞ্চিত এক নারী কীভাবে জীবনের এতটা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে শেষাবধি একজন মহীয়সী হয়ে ওঠেন, তাও আবার নির্বিরোধী কোন লেখিকা বা সমাজসেবী নন, রীতিমতো বিপ্লবী– সেটা আমার কাছে এক বড় বিস্ময়ের। কল্পনার চেয়ে বিস্ময়কর এই বাস্তব আমাদের একটি বড় সম্পদ যা মৃত্যুতেও হারায় না, যা অবিনশ্বর ও অক্ষয়।[১]

সুফিয়া কামাল তাঁর শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের একটি সময়খণ্ড স্মৃতিময় অনুষঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন এই গ্রন্থটিতে। ত্রিকালদর্শী সুফিয়া কামাল ব্রিটিশ, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক গতিবিধির প্রত্যক্ষদর্শী। সুফিয়ার বয়স যখন মাত্র সাত মাস তখন তাঁর পিতা দেশান্তরী হন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আব্দুল বারী বি.এল.। তিনি ত্রিপুরা জেলার শিলাউর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এই বিদ্বান ব্যক্তির নয়টি ভাষা আয়ত্তে ছিল। দীওয়ান-ই হাফিজ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। সুফিয়া কামাল এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর পিতা এস্‌মে আজম জপতে জপতে উন্মাদ হয়ে গেলে তাঁর নানা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন দোয়া-দরুদ করে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। কিন্তু কিছু দিন পর তিনি সাধকদের পথ অনুসরণ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। দীর্ঘ দিন তিনি নিরুদ্দেশ ছিলেন। সুফিয়ার বয়স যখন সাত-আট বছর তখন তাঁর এক মামাতো ভাই হজ্জ করতে গিয়ে তাঁর পিতার খোঁজ পান। তখন তিনি পুরোপুরি সংসার বিবাগী হয়ে গেছেন। সংসারধর্মে ফিরে আসার জন্য আকুল আবেদন করলেও তিনি মানতে রাজি হননি। বরং মামাতো ভাইয়ের মাধ্যমে সবার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তিনি মনে করেন আল্লাহ যেহেতু তাঁকে এই পথে এনেছেন সেহেতু তিনি আর সংসারধর্মে ফিরে যাবেন না। সুফিয়া কামালের পিতা সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিচারণায় এর চেয়ে বেশি কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

মাতা সম্পর্কে সুফিয়া কামালের বক্তব্য এ গ্রন্থে যৎসামান্য। মাতৃঋণ স্বীকার করে তিনি বলেছেনঃ 'মাটিকে বাদ দিয়ে ফুলগাছের যেমন কোন অস্তিত্ব নেই আমার মাকে বাদ দিয়ে আমারও তেমন কোন কথা নেই'। তাঁর মাতার নাম সৈয়দা সাবেরা খাতুন। সুফিয়া কামালের ভাষ্যে জানা যায়, তিনি বাংলা পড়তে জানতেন। মায়ের উৎসাহেই সুফিয়া কামাল লেখাপড়া শেখেন। নানা বাড়ি জমিদারি দেখাশুনার কাজে লোকাভাব দেখা দিলে তাঁর মামানির সঙ্গে তাঁর মাতাও জমিদারির হিসেব-নিকেশে অংশগ্রহণ করতেন। কারণ তাঁর মামানি উর্দু ছাড়া অন্য কোনো ভাষা পড়তে পারতেন না। মাতা সাবেরা খাতুন বাংলা পড়তে পারতেন এবং তাঁকে এ ব্যাপারে সহায়তা করতেন।

পিতৃস্নেহ বঞ্চিত সুফিয়া কামাল বেড়ে উঠেছেন নানাবাড়ির বিশাল ঐশ্বর্যের মধ্যে। এ গ্রন্থ থেকে তাঁর স্মৃতিচারণের কিয়দংশ উল্লিখিত হলো :

---

[১] দ্বিজেন শর্মা,অগ্রযাত্রার অনির্বাণ শিখা, উদ্ধৃত, সন্তোষ গুপ্ত সম্পাদিত *বেগম সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ,* প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০১, সমুদ্র প্রকাশনা সংস্থা, পৃষ্ঠা-১৩৩

> আমার প্রথম স্মরণে জাগে ঐশ্বর্যের সমারোহ। বর্তমানের পাঁচতলা সমান উচুঁ দোতলা বাড়ীর বিরাট দরওয়াজা, আবলুস কাঠের চিক্কন সূক্ষ্ম কারুকাজের উপর রোদের আলো পড়ে চক চক করে উঠত। ছাদ ভর্তি টানা পাখার আওতা বাঁচিয়ে বিরাট বিরাট ঝাড় ফানুস হাওয়ার টুংটাং আওয়াজ। টানা পাখাগুলো খস-এর পালা দেওয়া, গরমের দিনে তাতে পিচকারী দিয়ে পানি দিত বাঁদীরা। দুপুর বেলা ছায়া ছায়া, অন্ধকারের মধ্যে সেই পাখার হাওয়া, খস-এর খুশবু; চারিদিকে বাঁদী-খেলাই। আতুজী মোগলানীরা বসে আছে, আর মামানী, খালাআম্মারা, মা বোনেরা শুয়ে বসে পান খেতে খেতে বা হাতে পায়ে মেহেদী লাগাতে লাগাতে, কেউ বা সেলাই হাতে কেউবা সরুসুন্দর সুপারী কাটার অভ্যাস করতে করতে 'আমীর হামজা' বা 'হাতেম তাই'-এর পুঁথি পড়া শুনছেন– পড়ছেন বসে আমার আম্মা– টুকটুকে ঠোঁট নেড়ে রূপে অরূপা, গুণে অতুল্যা, ধৈর্যে অনিন্দিতা- সেই আমার মা।[১]

সুফিয়া কামাল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারেননি। বাল্যশিক্ষা পর্যন্ত বিদ্যা আয়ত্ত করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ছেলেবেলায় মসজিদে সুর করে 'কয়েদা বোগদাদী' পড়তে পড়তে ভাষার দুর্বোধ্যতায় প্রায়ই কান্না পেতো সুফিয়া কামালের, তবুও পড়তে হতো। সেই বিরক্তিকর শিক্ষা ব্যবস্থার কথা তিনি উলেখ করেছেন এ গ্রন্থেঃ

> মসজিদ গিয়ে সুর মিলিয়ে জোরে 'কায়েদা বোগদাদী পড়তে হত। আমরা তিন চারজন মেয়েও যেতাম। ভাইয়া যখন আরবী-ফারসী পড়তে শিখলেন, আমরা তখন জের-জবর-পেশ তশ্‌দীদ শিখছি। তাঁরা সুর করে পড়তেন :
>
> করীমা বেব্‌খশা য়ে বর হালেমা
> কে হাস্তম আসীরে কমন্দে হাওয়া
> ০ ০
> নেগাহ্‌দার মারা-জারায়ে খাতা
> খাতা দর্‌ গোজারো সওয়াবেন্নামা ...
>
> তখন কিছুই বুঝবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি হয়নি। কিন্তু কি জানি কেন আমার ভীষণ কান্না পেত। আর আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় এক বোনঝি আমার চোখ মুছিয়ে এসব আলাহর কথা, কাঁদতে নেই। সিপারের আমপারা পর্যন্ত মসজিদে আমাদের পড়া; তারপর কোরআনের সবক আম্মার কাছ থেকেই নিতে হয়েছে, কেননা তখন আমরা বড় হয়ে গিয়েছিলাম। তবে সেই জুবিলি স্কুলে প্যারীলাল মাষ্টার মশায়ের কাছে আমিও দু-এক সবক পড়েছি। পায়জামা-কুর্তা আবার আচকান-পায়জামা পরে গিয়ে তাও। বাল্যশিক্ষা পর্যন্ত আমার বিদ্যা হবার পর ভাইয়ারা সব চলে গেলেন.. ।[২]

শিক্ষানুরাগী সুফিয়া কামাল তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার কোপানলে লালিত হওয়ায় শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তবে প্রাতিষ্ঠানিক বাঁধা-ধরা শিক্ষার চেয়েও প্রকৃত শিক্ষা তিনি

---

[১] *বেগম সুফিয়া কামাল রচনা সংগ্রহ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫৯-৫৬০

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৬৭-৫৬৮

অর্জন করেছেন প্রকৃতি থেকে, এবং স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যে আত্মস্থ করেছেন বিশাল প্রকৃতির রহস্যময়তাকে :

> ছোট বেলায় আমি খুব চাপা ছিলাম। কারুর কাছে কোন কথা বলা বা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা বা সাহসই হত না। কিন্তু একা মনে মনে আমি বলতাম অনেক কিছু। দেখতাম ফুলপাখি চাঁদতারা আলো-আঁধার মেঘ-বৃষ্টি-নদী-পুকুর। এরা আমার মনে কত অদ্ভুত ভাবের প্রশ্ন তুলত। এসব কেন? এসব কি? এরা কোথা থেকে আসে? কেন-এল? কি হবে এদের? আর আমার অফুরন্ত আগ্রহ ছিল ফুল ফোটা দেখতে। কি করে একটির পর একটি পাপড়ি মেলে? কি করে এরা গন্ধ ছড়ায়? বহু রাত আমি এই নিয়ে ভেবেছি।[১]

প্রকৃতিপ্রেমী সুফিয়া কামাল ছেলেবেলায় শায়েস্তাবাদ থেকে প্রথম যখন কোলকাতায় তাঁর খালাম্মার বাড়িতে এলেন তখন তিনি উপলব্ধি করলেন গ্রামীণ প্রকৃতির সঙ্গে কলকাতার প্রভেদ বিস্তর। এ পরিবেশে তাঁর শিশুমনে কী বিরূপতার সৃষ্টি করেছে এবং তিনি কতোটা হাঁপিয়ে উঠেছেন তার উল্লেখ রয়েছে নিম্নোক্ত বর্ণনা-ভাষ্যে :

> কোলকাতার জীবন অন্য জীবন।... পরিবেশও অনেকখানি অপরিচিত ও বিরূপ। বিরাট বাড়ী হলেও গাছ নেই, পুকুর নেই, পাখী নেই, ফুল নেই। আমি যেন হাঁপিয়ে উঠতাম। ... টিয়া ময়নাগুলির গান নেই, পুতুল খেলা নেই। পৌষ মাসের শীত। কিন্তু খেজুর রস, পিঠা আর সেই সবজী বাগানের সোঁদা সোঁদা গন্ধ নেই– কী যে বেখাপ্পা লাগত। আর খালি কান্না পেত।[২]

প্রকৃতি ছিল তাঁর শিক্ষক। তবে ছেলেবেলায় সবচেয়ে কাছের সাথী বা প্রকৃত শিক্ষক বলে তিনি যাঁকে মনে রেখেছেন তিনি ছিলেন তাঁর মাতার দুধভাই, যাকে সুফিয়া কামাল 'জামাই' বলে ডাকতেন। তাঁর কোলে বসে তিনি পুঁথিপাঠ শুনতেন, গান শুনতেন, শুনতেন বেহালার সুর, পালাগান; দেখতেন সোনাভান পালার অভিনয়, হোসেনের বীরত্বগাথা প্রভৃতি।

মূলত, সুফিয়া কামাল শায়েস্তাবাদের পারিবারিক সমারোহের মধ্য থেকেই কবি-প্রতিভার রসদ পেয়েছিলেন। সে-পরিবেশে উন্মেষিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যবোধ, মানবতা; মহীরুহসম বেড়ে উঠার নেপথ্য–শক্তি। ধর্মীয়-বিশ্বাসে দৃঢ়মূল ছিলেন তিনি। সম্প্রীতির মিলনমেলা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় ছিল অটুট। তাঁর আত্মজীবনীতে সেই সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে :

> মক্তব-মসজিদ-লঙ্গরখানা, স্কুল-পাঠাগার, হিন্দু কর্মচারীদের পূজা-পার্বন অনুষ্ঠান-উৎসব আনন্দ ছড়ানো একটি পরিবেশ। ছোটবেলায় এসব আনন্দ উৎসবে শরীক হতে বাধা ছিল না। বারো মাসে তের পার্বণ লেগেই থাকতো। তখনকার জমিদাররা শাসন করতেন কড়া হাতে আবার পালন করতেন উদার মন নিয়ে। ঈদে-বকরীদে সারা রাজ্যের প্রজারা এসে নামাযের পর জড়ো হয়ে

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৬৬
[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৬৯

> জমিদারের সাথে কোলাকুলি করত। মামারা ঘেমে যেন বেহুঁশ হয়ে পড়তেন। তবুও গলা মিলাবার পালা ক্ষান্ত হতো না। সবাই খেতে বসত। একসাথে হাজার হাজার মানুষ খাচ্ছে। শুধু দুই ঈদেই নয়। শবে মেরাজ, শবে বরাত, শবে কদরেও এ ধরনের উৎসব অনুষ্ঠিত হত। আমাদের নবী করিমের জন্মদিন 'বারে ওফাত' ঈদ-ই মিলাদুন্নবী বড়ই সমারোহের সাথে সম্পন্ন হত; আলোতে জেয়াফতে ধনী-দরিদ্র বারো দিন ধরে মিলাদ মহফিলে সমাবেত হত। বারো দিনের দিন জেয়াফত খাওয়ানো হত সকলকে এক সাথে করে। আখেরী চাহার শোম্বা– হযরতের আরোগ্যস্নানের দিনটিতে সকলে দোয়া লেখা পানি মাথায় দিয়ে গোসল করে বৎসরের মতো রোগের হাত থেকে বাঁচবার আরামের নিঃশ্বাস ফেলতো। ... মহররমের দশ দিন এলাকার প্রজারা বাড়িতে রাঁধত না। সারাদিন রোজা রাখার পর খিচুরী ও শরবত খাবার জন্য দলে দলে আমাদের বাড়ীতে সমবেত হত। সন্ধ্যায় কোরআন তেলাওয়াত, দরুদ পাঠ আর মর্সিয়া জারীগানের সুরে আকাশ বাতাস বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে উঠত। 'শহীদে কারবালা', 'জঙ্গনামা' পুঁথিও পড়া হত। নিকটের দূরের গাঁয়ের 'পণ্ডিতেরা এসে সরকারী বাড়ীতে পুথিপড়া শুনিয়ে ইনাম বখশিস নিয়ে যেতেন। জমিদার বাড়ীকে সবাই বলত 'সরকারী বাড়ী' বা 'নওয়াব বাড়ী'। আমার নানা নওয়াব ছিলেন। কিন্তু 'নওয়াব বাড়ী' কথাটা তিনি পছন্দ করতেন না। বলতেন এটা সবার বাড়ী– তাই 'সরকারী বাড়ি' কথাটাই চালু ছিল।[১]

একালে আমাদের কাল-এ অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের চালচিত্র বিধৃত হয়েছে বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে। সুফিয়া কামাল তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তা বর্ণনা করেছেন। নওয়াব-মহলের নারীদের পরিচর্যা, বিলাস-ব্যসনের পাশাপাশি বাঁদি-চাকরাণি-দাই-খেলাইদের কথাও বর্ণনা করেছেন তিনি। গয়নার প্রসঙ্গে তাঁর বর্ণনা এসেছে গ্রন্থটিতে এভাবে–

> আমাদের খানদানে সোনা কেউ বড় একটা পরতেন না; সাচ্চা পাথরের 'জড়াও' গয়না এবং সাধারণত মোতির ব্যবহার বেশী ছিল। মুরুব্বীরা বলতেন, সোনা যদি আমরা পরব তবে বাঁদী-চাকরাণী-দাই খেলাইরা কি পরবে?[২]

সমকালীন প্রেক্ষাপটে সুফিয়া কামাল নর-নারীর ঐতিহ্যবাহী পোশাকের বর্ণনাও উপস্থাপন করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে :

> কাপড় চোপড়ে ও ঢাকাই শাড়ী, থানের উপর চিকনের কাজ করা, আবেরওয়াঁ আর আসল মসলিন না হলেও নামে মসলিনের উপর চিকনের কাজ করানো কাপড়ের ব্যবহার ছিল। পুরুষদেরও কুরতা, বেনিয়ান শেরওয়ানী তাই দিয়ে তৈরী হত। বিয়ে-সাদীতে সাচ্চা কাজ করা সিল্কের কাপড়ে পেশোয়াজ, ওড়না, পাজামা এবং জোড়া বদলাইয়ের জন্য বেনারসী শাড়ীর প্রচলন ছিল। তারপর এল বোম্বাই শাড়ী। গয়নাপত্র ঢাকা, লক্ষ্ণৌ, কলকাতার হ্যামিল্টনের দোকানে অর্ডার দিয়ে আমদানী করা হত। চিকনের কাজ, বদলার কাজ মোগলানীদের সাথে বসে ঘরের বৌ মেয়েরাই পছন্দমত তৈরী করে নিতেন। ছোট থাকতে কাপড় দরজী সেলাই করবে; কিন্তু একটু বড় হয়ে উঠলে ঘরের মেয়েদের গায়ের মাপ অন্য পুরুষ জানবে-এটা বড় বেহায়াপনা ও শরমের কথা ছিল। নিজেদের

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৬০
[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৬১

> নিমা নিজেরাই তৈরী করে নিতে হবে। তার উপর ঢিলা কুর্তা ও কলিদার পায়জামা এবং তার সাথে ওড়না ব্যবহার করার রেওয়াজ ছিল। আমাদের পরিবারে সেলোয়ার-কামিজের প্রচলন হয়নি। উৎসব খুশীতে শাড়ী পরতে বড় ভালো লাগত। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত মেয়েরা পায়জামা কুর্তা পরত। অবিবাহিত মেয়েদের সিঁথি করে চুল আঁড়চানো বা সাজগোজ করা, পান খাওয়া ইত্যাদি একদম নিষিদ্ধ ছিল।[১]

বারো বৎসর বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন সুফিয়া কামাল। শায়েস্তাবাদ ছেড়ে বরিশালে আগমন করেন তিনি। তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয় বিবাহ-উত্তরকালীন পর্বে। শৈশবে যাঁদের ভাবাদর্শে তাঁর মানসক্রিয়া পরিস্রুত হয় তারা হলেন তাঁর বড়মামা, জামাই (মায়ের দুধভাই) এবং তাঁর মাতা। বিশেষত, তাঁর বড় মামার বিশাল লাইব্রেরি থেকে বই চুরি করে পড়ার নেশাই তাঁকে সাহিত্যানুরাগী হওয়ার নেপথ্য-শক্তি জোগায়।

সুফিয়া কামালের বিবাহিত জীবনে প্রতিভাবিকাশে অনুকূলসঞ্চারী পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন তাঁর স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন। কোনো এক বর্ষণমুখর দিনে শুরুহয় তাঁর সাহিত্যবোধের আকাঙ্ক্ষা। মুসলিম সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুল ইসলামের 'হেনা' রচনা পাঠের মাধ্যমেই প্রথম সাহিত্যের স্বাদ অনুভব করেন তিনি। এরপর 'প্রবাসী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা (যার নাম স্মৃতিতে নেই) পড়েন চুরি করে। আর এভাবেই সূচনা হয় তাঁর সাহিত্যিক পথযাত্রা। আরো উৎসাহ বোধ করতেন বেগম রোকেয়ার, বেগম সারা তাইফুর এবং মোতাহেরা বানুর লেখা পড়ে। তখন থেকেই সুফিয়া লেখা শুরু করেন অতি গোপনে, লুকিয়ে। একসময় তা প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র খুঁজে পায়। বরিশালের অশ্বিনী বাবুর ছেলের 'তরুণ' নামক মাসিক পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন সৈয়দ নেহাল হোসেন। তারই সহায়তায় সেই পত্রিকায় সুফিয়ার প্রথম গল্প 'সৈনিক বধূ' প্রকাশিত হলে হিন্দু-মুসলিম উভয়শ্রেণি ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং লেখার জন্য উৎসাহ ও তাগিদ প্রদান করেন। সুফিয়ার স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন ছিলেন মুক্তচিন্তার অধিকারী, নারীস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। তবে সুফিয়া কামালের এ-গ্রন্থে নেহাল হোসেন প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়নি। ড. সেলিম জাহাঙ্গীর তাঁর গ্রন্থে সৈয়দ নেহাল হোসেন সম্পর্কে সুফিয়া কামালের নীরবতা তাঁর মূল্যবোধজনিত বলে মন্তব্য করেছেন। অবশ্য একটি সাক্ষাৎকারে নেহাল হোসেনের অবদান প্রসঙ্গে সুফিয়া কামাল অকপটেই বলেছেন:

> তিনি ছিলেন প্রগতিশীল। আমার ভেতরের সমস্ত আবেগ, আগ্রহ, ইচ্ছাকে প্রকাশের পথ করে দিতেন। কতো মানুষ কতো কিছু বলেছে, পরোয়া করেননি। চাঁদনী রাতে বেড়িয়েছি দু'জনে। লাঠির

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত-পৃষ্ঠা-৫৬১

> আঘাত খেয়েছেন স্ত্রীকে নিয়ে বেপর্দা বের হবার জন্য। ভয় পাননি ... আমার স্বামী আমাকে শিখিয়েছেন মনের পর্দা, শালীনতা, সততা কিভাবে রাখতে হয়। তিনিই অবরোধবাসিনী এক কিশোরীকে মুক্ত মনের তরুণীতে রূপায়িত করেন। ... তাঁর সঙ্গে আমার সংসার জীবন মাত্র ১০ বছরের। এই দশটি বছর তাঁর উৎসাহেই আমি লেখার চর্চা চালিয়েছিলাম। ... আমার প্রথম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন আমাকে সমাজের সমস্ত গ্লানি থেকে বাঁচিয়েছিলেন, আমার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে সাহায্য করেছেন, অবরোধ থেকে মুক্তি দিয়েছেন।[১]

প্রথম গল্প প্রকাশিত হওয়ার খবর জানতে পেরে সুফিয়ার বড়মামা ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। জরুরি টেলিগ্রাম করে ভাইপো নেহাল হোসেনকে বরিশালে নিয়ে আসেন। তখন পরিস্থিতি কীরূপ দাঁড়িয়েছিল সুফিয়া কামালের বর্ণনায় উল্লেখ করা হলো :

> আমার লেখা বেরিয়েছে, বড় মামা মহা খাপ্পা, ধর্ম-টর্ম নয়, পরিবারের ঐতিহ্য নষ্ট হচ্ছে– আপত্তিটা সেখানে। আমার স্বামীকে ডেকে বললেন– হারামজাদা, শুয়রকা বাচ্চা, কলা লে লেংগে, জিন্দা ঘাড় ভেংগে, বেইজ্জত কর দেয়া, ইজ্জত খো দেয়া, খান্দানকা নাম ডুবা দিয়া।[২]

বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, সুফিয়ার বড় মামা জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর বিশাল লাইব্রেরিতে দেশ-বিদেশের অসংখ্য মননশীল গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন নারী-প্রগতি বিরোধী। এ্যারোপ্লেনে-চড়া সুফিয়া কামালের ছবি 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় ছাপা হলে তা দেখেও তিনি ক্ষিপ্ত হন নেহাল হোসেনের ওপর এবং ভাইপোকে নির্দেশদেন এই বলে–

> পড়াশুনা চুলায় যাক, 'ল' পাশ করার দরকার নেই। বাড়িতেই থাক।[৩]

সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি সুফিয়া সমাজসেবার কর্মে নিযুক্ত করেন নিজেকে। সুকুমার দত্তের স্ত্রী বিএ পাশ করে বরিশাল এলে তাঁর সাথে যোগ দিয়ে সুফিয়া কামাল মাতৃমঙ্গল, শিশুসদন সমিতিতে যেতেন। একবার গান্ধীজি এলেন বরিশালে। এই বিশাল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ লাভের জন্য সুফিয়া কামাল হিন্দুনারীর সাজে সভায় যোগ দেন এবং নিজের হাতে চরকায় কাটা সুতা গান্ধীজীকে উপহার দিতে পেরে ধন্য হন।

একালে আমাদের কাল গ্রন্থে রোকেয়ার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে বিশদভাবে। সুফিয়া কামাল রোকেয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন আজীবন। দীক্ষা-গুরু হিসেবে তাঁকেই মান্য করেছেন সুফিয়া। মহীয়সী এই নারীকে প্রথম দেখার সুযোগ মেলে কোলকাতায়, তাঁর খালাম্মার বাড়িতে। তখন সুফিয়ার বয়স ছিল মাত্র ৭ বছর। একমাত্র ভাই সৈয়দ আবদুল ওয়ালী কোলকাতায় খালাম্মার বাসায় পড়াকালে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলে খবর পেয়ে সুফিয়া

---

[১] উদ্ধৃত, *ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, সুফিয়া কামাল*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৬-২৩৭
[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৩৬
[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৩৬

মাতাসহ কোলকাতা আগমন করেন। সেখানেই প্রথম সাক্ষাৎ রোকেয়ার সাথে। সেই সাক্ষাতের বর্ণনা তিনি উপস্থাপন করেছেন এভাবে :

> বেগম রোকেয়ার সাথে আমার যখন দেখা হয় তখনত আমি ছোট। ৬/৭ বছর বয়স, সাত বছর হয়ে গেছে। বেগম রোকেয়ার দারুণ প্রভাব আমার জীবনে। তাই তাঁর প্রসঙ্গে কিছু বিস্তারিত কথা বলবো। আম্মাকে ফুফু আম্মা ডাকতেন বেগম রোকেয়া। রক্তের সম্পর্ক কিনা জানিনা তবে কুটুম্বিতা ছিল। ... একদিন শুনি সে স্কুলের গাড়ী এসেছে 'ইস্কুলকা গাড়ী আয়া' বলে হাঁক। ... আম্মা খালা-আম্মা সবাই বারান্দায় বসে আছেন। দেখি যে ছোটখাট সুন্দর একটি মেয়ে মানুষ উঠে আসছেন। তা উঠে এসে পরপর আম্মাকে খালাম্মাকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলেন। 'রুকু', তুমি কোলকাতায় আছ, আস না যে? জী হ্যাঁ, আমি ত কোলকাতায়ই আছি। আমিত আসি না কিন্তু আপনারাই বা আমার কত খবর নেন? বললেন উনি হাসি মুখেই। ... আমি ওখান দিয়ে যাচ্ছি– আম্মা বললেন, 'সালাম কর, তোমার আপা হয়'। আমিও সালাম করলাম। উনি আম্মাকে বললেন, 'ফুফু আপনার মেয়ে?' আম্মা বললেন, হ্যাঁ। তখন উনি বললেন, 'আমার ইস্কুল আমি করেছি, সেখানে অনেক মেয়ে পড়ে, হিন্দু মুসলমান সব মেয়েরা পড়ে, কিন্তু আমার আত্মীয় স্বজনের কোন মেয়ে আমার স্কুলে পড়ে না।[১]

রোকেয়ার স্কুলে পড়ার সুযোগ হয়নি সুফিয়া কামালের। কদিন পরেই তাঁরা কোলকাতা থেকে শায়েস্তাবাদে চলে আসেন। স্কুলে পড়ার ইচ্ছে বাস্তবায়িত হয়নি কখনো সুফিয়া কামালের জীবনে। তাঁর আক্ষেপোক্তি অভিব্যক্ত হয়েছে নিম্নোক্ত স্মৃতিময়তায় :

> আমার খুবই ইচ্ছা তখন থেকে আমি যদি পড়তে পারতাম। কি জানি ছোটবেলা থেকে স্কুলেও কোনদিন যাই নাই। যাবার একটা ইচ্ছা ছিল।[২]

সাত বছর বয়সে রোকেয়ার দেখা পেয়েছিলেন সুফিয়া কামাল। তারপর আবার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে বিবাহের পরে কোলকাতায়। সুফিয়া কামালকে বেগম রোকেয়া 'ফুলকবি' বলে সম্বোধন করতেন এবং বলতেন 'ফুলকবি' তুইত লেখাপড়া শিখিলি না, কিন্তু কবি ত হয়ে গেলি।' কোলকাতায় সুফিয়া কামাল আগমন করেন নেহাল হোসেনের মৃত্যুর পর। সে দুঃসময়ের কথা সুফিয়া কামাল বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ সে কী সর্পিল সংঘাত সংগ্রামময় জীবনধারা বয়ে চলেছিলাম দুঃস্বপ্নের মতো। ... ভাগ্যের বিপর্যয়ে যখন বিত্তহীনা আশ্রয়হীনা সন্তানটিকে ও মাকে নিয়ে কলকাতা করপোরেশনে সামান্য মাইনেতে কাজ করি, তখন সহৃদয়া মরিয়ম আপার সাহায্য দান, আশ্রয়দান সে কথা ভুলব না। তখনই ফররুখ এসেছিল মা ডেকে, উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত অবুঝ এক কিশোর। কী করে আমাকে বাঁচাবে আমাকেই জিজ্ঞেস করতো। সান্ত্বনা দিয়ে, আশা দিয়ে চিঠি লিখতো। সাহিত্যিক আবুল

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৮১
[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮১

> ফজল, সবার শ্রদ্ধেয় আত্মীয় লেখক (মাহবুবুল আলম) মাহবুবদার কথা মনে পড়ে। কত স্নেহ প্রীতি মমতা ভরসাদানে ভরা সে সব আশ্বাসবাণী! হিন্দু মুসলিম সাহিত্যিক রসিকজন সমবেদনা সহানুভূতি জানিয়েছেন। লেখা প্রকাশ করেছেন। কিছু পারিশ্রমিক দিয়েছেন। হয়ত দয়া মায়া করে। তখন তা না নিয়েও আমার উপায় ছিল না। সকৃতজ্ঞ চিত্তে আজও তাঁদের স্মরণ করি।[১]

সুফিয়া কামাল তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর দ্বিতীয় স্বামী কামাল উদ্দীন খানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেননি। নেহাল হোসেনের মৃত্যুর পর দুঃসহ জীবন থেকে সুফিয়া কামাল মুক্তির উপায়স্বরূপ যাকে অবলম্বন করেছেন– তিনি কামালউদ্দীন খান। কামালউদ্দীনের সাথে কোলকাতায় বসবাসকালে বেগম রোকেয়ার ঘনিষ্ঠতায় আসেন সুফিয়া কামাল। রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীন ইসলাম' নামক সমিতির সভ্য ছিলেন সুফিয়া কামালসহ লেডি গজনবী, লেডি ফারুকী, মিসেস মোমেন, মিসেস গাফফার, শামসুন্নাহার মাহমুদসহ আরো অনেকে। সেখানে কাজ করতে গিয়ে রোকেয়াকে কাছ থেকে দেখার, জানার এবং তাঁর আদর্শকে আত্মস্থ করার প্রেরণা জাগ্রত হয় সুফিয়ার অন্তরে। তখন রক্ষণশীল, অভিজাত, মুসলিম সমাজে উর্দু ভাষার প্রচলন ছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় নয়, উর্দুতেই রোকেয়া তাঁর প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের সমিতির নাম করেছিলেন 'খাওয়াতীনে ইসলাম' ; কিন্তু বাংলা ভাষা ও বাংলা জাতির উপর রোকেয়ার যে নিগূঢ় টান ছিলো– সুফিয়া কামাল তা উপলব্ধিতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর স্কুল সম্পর্কে সুফিয়া কামাল মন্তব্য করেন–

> ওনার যে স্কুলটা ছিল সেটা খালি স্কুল না। বেগম রোকেয়ার জীবনটা পড়লে দেখা যাবে 'তারিণী ভবন' বলে একটা কথা আছে তাতে। 'পদ্মরাগ' বলে একটা উপন্যাস উনি লিখেছেন। সেখানে, 'তারিণী ভবনের উল্লেখ আছে, ওনার স্কুলটা ছিল সেই তারিণী ভবন। সেখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ফার্সি সবরকম মেয়েরা পড়তো। কেউ শিক্ষয়িত্রী, কেউ সুপারিনটেনডেন্ট, কেউ পড়ছে, কেউ অনাথ, কেউ আসছে সেখানে থাকতে, কাজ করতে। এত সুন্দর প্রতিষ্ঠান আমি এখন পর্যন্ত আর কোথাও দেখি নাই। দেশে-বিদেশে এ দেশের মেয়েরা কিম্বা অন্যান্য দেশের মেয়েরা মহিলারা কত সুন্দর সুযোগ সুবিধা পায়। গভর্নমেন্টের সাহায্য পায়। কিন্তু উনিত সেসব পেতেনই না বরঞ্চ তখনকার দিনের সেই ধর্মান্ধ সমাজ ওনাকে গলাগালি করেছে। কত উড়া চিঠি লিখেছে। কত রকম করে উনাকে নির্যাতন করেছে। ঢিল মেরেছে। কিন্তু ঐ স্কুল নিয়েই উনি ছিলেন।[১]

জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে 'মানুষ'কেই সবার উপর ঠাঁই দিয়েছেন রোকেয়া। সুফিয়া কামাল তাঁর এই আদর্শকে গ্রহণ করে আজীবন মানবসেবা করে গেছেন। রোকেয়ার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব সুফিয়ার বর্ণনায় :

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৯১

[১] *সুফিয়া কামাল রচনা সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮২

> তা এই রকম শিক্ষা দিতেন উনি যে, মানুষ হিসেবে সবাইকে দেখবে। হিন্দু না, মুসলমান না, খৃষ্টান না, কিছু না। মেথর না, চামার না, সব মানুষ। উনার ঘর যে ঝাড়ু দিত, বাগান সাফ করত, ঐ জমাদারদের মেয়েকে, বউকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। বলতেন, ওরাওত মানুষ–শিখবে না কেন? বিদ্যা সবার জন্য।[২]

সুফিয়া কামাল তাঁর বিশেষ একটি ঘটনার উলেখ করেছেন এ গ্রন্থে। সেটি হলো তাঁর এ্যারোপ্লেনে চড়া। এরোপ্লেনে চড়া উপলক্ষে রোকেয়া সংবর্ধনা দিয়েছেন সুফিয়াসহ নাহারকে এবং মিসেস রেশাদকে। প্রতিকূলতার মাঝে শামসুন্নাহার মাহমুদ ম্যাট্রিক পাশ করেছেন এবং মিসেস রেশাদ তার সন্তানকে প্রথম এরোপ্লেনে চড়ার সুযোগ দিয়েছেন– সেই বীরত্বসূচক কাজের জন্য রোকেয়া তাদের সংবর্ধনা দিয়েছেন। নারীশিক্ষার অগ্রগতি, বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণ, অসাম্প্রদায়িক বোধবুদ্ধি রোকেয়ার কাছ থেকেই শিখেছেন সুফিয়া কামাল। কারণ সুফিয়ার ভাষায়, 'নাহারকে আর আমাকে বড় ভালবাসতেন বেগম রোকেয়া' এই দীক্ষা-গুরুর উদ্দেশ্যে শিষ্য-সুফিয়া কামাল নিবেদন করেছেন তাঁর সশ্রদ্ধ স্মৃতিফলক। সে-কথা সুফিয়ার বর্ণনায় এসেছে এভাবে–

> তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে ডাকবাংলোর জন্য ওই জমিটা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এক হাজার টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে। যে দখল করে ছিল তাকে এক হাজার টাকা দিয়ে মহিলা পরিষদ থেকে আমরা জমিটা নিয়ে নিয়েছি। দেখি এখন তাঁর নামের একটা স্মৃতি যদি হয়। এরকম একজন মহিয়সী নারীর নাম কজনে জানে বাংলাদেশে? ডাকবাংলো বানালে অনেক লোক যাবে দেখতে, এখনও যায়। থাকবে একটা স্মৃতিসৌধ তাঁর পায়রাবন্দ গ্রামে, সবাই দেখবে যে ওখান থেকে একটা পায়রাবন্দের বন্দিনী পায়রা উড়ে এসে সারা দুনিয়াতে এখন ওনার নাম। উনি না হলে এই মেয়েরা আরও পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে থাকত।[৩]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করেছেন সুফিয়া কামাল। রবীন্দ্রনাথ নিজ হাতে নাম লিখে সুফিয়া কামালকে 'গোরা' উপন্যাসটি উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর স্নেহধন্য সুফিয়া কামাল সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন :

> কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহও কি কম পেলাম ? তাঁর জন্মদিনে একটা কবিতা লিখে পাঠিয়ে ছিলাম। তিনিও সুন্দর করে ক'টি কবিতার লাইন লিখে আমাকে পাঠালেন। সাদর আমন্ত্রণ জানালেন কলকাতায় তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে যেতে। গেলাম একদিন বোরখা পরে। সে মূর্তি দেখে তিনিও বলেছিলেন, তুমি এত ছোট, এত কচি, ভেবেছিলাম বেশ ভারিক্কি কোন মহিলা হবে তুমি। আর যখন শুনলেন বরিশালে আমার বাড়ী তখন বলেছিলেন, 'তুমি আমার বেয়াইয়ের দেশের মানুষ। তোমার সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্ক আর মধুর মিষ্টি তুমি। লজ্জায় আমার যে কি অবস্থা

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮৮
[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৯০

হয়েছিল। তিনি ছিলেন সুরসিক সুন্দর মনের মানুষ। কতবার তাঁর বাড়ী গিয়েছি। তাঁর নিজের অভিনয় করা নাটক দেখতে আমাকে ডেকেছেন। নিজ হাতে নাম লিখে তাঁর 'গোরা' বইখানা আমাকে উপহার দিয়েছেন।[১]

কবির সাথে প্রথম পরিচয় হওয়ার পর সুফিয়া কামাল কবির জন্মদিনে 'পঁচিশে বৈশাখ' নামে একখানা কবিতা লিখে পাঠান। কবিতার কিছু অংশ উল্লেখ করা হলো :

পঁচিশে বৈশাখ
চৈত্রের নিশীথ ভরি কাননে কাননে আম্র শাখে
কথা যেন গুঞ্জরিতে থাকে,
মোহাচ্ছন্ন বসন্তের মদির দখিনা বায়ু শেষে
চৈতালি হাওয়ায় ভরে এসে–
চম্পক সুগন্ধ ভরা নবীন প্রভাত দেয় ডাক
দুয়ারে দুয়ারে শুনি, এসেছে বৈশাখ।
এসেছে নবীন রবি! পূর্ব দিগন্তের পানে চাহি
বেদনার হৃদে অবগাহি।...
গ্রীষ্মে বর্ষায় স্নিগ্ধ শরতে হেমন্তে শীতে যার
বসন্তের ঋতু ভরি দিয়াছ যতেক উপহার
সে সম্পদ অফুরন্ত, সু-সম্পূর্ণ, কাল তারে করিবে না ক্ষয়
হে কবীন্দ্র তোমারই জয়।
* * * * *
তোমারে লইয়া বক্ষে অসহ সৃজনসুখে কাঁপে
দুরন্ত আনন্দে কাল যাপে
কালের রথের চক্র আবর্তিয়া দিয়ে যায় ডাক
রবীন্দ্রের জন্মতিথি পঁচিশে বৈশাখ।
(পঁচিশে বৈশাখ : *উদাত্ত পৃথিবী*)

কবিতাটি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যুত্তর করেন কয়েক চরণ কবিতা রচনার মাধ্যমে। কবিতাটি উল্লেখ করা হলো:

বিদায় বেলায় রবির পানে
বনশ্রী যে অর্ঘ্য আনে
অশোক ফুলের করুণ অঞ্জলি,
আভাস তারি রঙিন মেঘে
শেষ নিমেষে রইবো লেগে
রবি যখন অস্ত যাবে চলি।

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৯১

রবীন্দ্রনাথের রচিত পঙ্‌ক্তিগুলো সুফিয়া কামালের জীবনে গভীর রেখাপাত করেছে, যার প্রামাণ্য স্বাক্ষর তিনি উৎকীর্ণ করেছেন *মন ও জীবন* কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা অংশে। কবির আশিস-বাণীও সুফিয়া কামালের জীবনে সত্যরূপে প্রতিভাত। সে আশিস-বাণীটি কবি পাঠিয়েছিলেন যখন বেনজীর আহমদ সুফিয়া কামালের একখানা গ্রন্থ *সাঁঝের মায়া* উপাহার পাঠিয়েছিলেন।

আশিস-বাণীটি নিম্নরূপ :

> কল্যাণীয়া সুফিয়া কামাল,
>
> তোমার কবিত্ব আমাকে বিস্মিত করে। বাংলা সাহিত্যে তোমার স্থান উচ্চে এবং ধ্রুব তোমার প্রতিষ্ঠা। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো।
>
> ইতি ২/১২/৩৮
>
> শুভার্থী
>
> রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১]

রবীন্দ্রনাথের বাড়িতেই সাক্ষাৎ ঘটেছে নেতাজী সুভাষ বোস, মৈত্রেয়ী দেবী ও কবির পুত্রবধূর সঙ্গে। সেই সুখ-স্মৃতিকে সুফিয়া কামাল বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> তাঁর বাড়ীতেই দেখা হয়েছে নেতাজী সুভাষ বোসের সঙ্গে। মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে। তাঁর পুত্রবধূর সঙ্গে। কত সুখ স্মৃতি সেসব। অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন আমার লেখার। উৎসাহ দিয়েছেন। শান্তি-নিকেতনে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু তখন কি আমার অবরোধ ঘুচিয়ে যাবার উপায় ছিল? বন্দিনী খাঁচায় পাখির শুধু পাখা ঝাপটানোই সার হয়েছে। বাধার পর বাধা। কত যে নিগড় ভেদ করে এ জীবন মুক্তি লাভ করতে চেয়েছে।[২]

এ কালে আমাদের কাল গ্রন্থে কাজী নজরুল ইসলামকে স্মরণ করেছেন সুফিয়া কামাল। স্নেহ-মমতায় অকৃপণ, উদারহস্ত নজরুলকে তিনি দেখেছেন কাছ থেকে; তাঁর স্নেহে ধন্য হয়েছেন, পেয়েছেন তাঁর আশীর্বাদ। সুফিয়ার জীবনে নজরুলের প্রভাব ব্যাপক। নজরুলকে 'দাদু' বলে সম্বোধন করতেন সুফিয়া আর নজরুল সুফিয়া কামালকে 'সুফু' বলে সম্বোধন করতেন। নজরুল ইসলামের স্মৃতিচারণ সুফিয়ার বর্ণনায় উল্লেখ করা হলো :

> সেটা তিরিশের কথা। 'সওগাত' এ লেখা দিলাম। কাজী নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরে থাকতেন। মাঝে মাঝে সওগাত অফিসে আসতেন। এসে শুনলেন আমি কলকাতায় আছি। হঠাৎ এক দুপুরে প্রাণোচ্ছ্বাসের পাবন ছড়িয়ে আমাদের বাসায় উপস্থিত। বাসায় তখন আমার মা ও আমি ছাড়া কেউ ছিল না। আর তাঁর সুফিয়া ডাক শুনে আমরা ত হতভম্ব। কোনদিন বাইরের কোন পুরুষের সাথে দেখা করিনি। কিন্তু এঁর আহক্ষানে সাড়া না দিয়ে কি থাকতে পারি? কী আনন্দে কী লজ্জায় বুক কাঁপা অবস্থায় তার সামনে আসতেই তিনি বলেন– আরে! এই তুমি। আমি ত ভেবেছিলাম কী জানি

[১] ব্যক্তিগত সংগ্রহ

[২] *সুফিয়া কামাল রচনা সমগ্র : প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত,* পৃষ্ঠা-৫৯১

> এক মস্ত বড় লেখিকা। এতো দেখি একটা পুতুল। তোমাকে আমি লুফব। কী ভয়ানক। আমি ত ভয়ে পিছিয়ে এলাম। নেবেন নাকি কোলেই তুলে। কী হাসি আর কী মমতা ভরা কণ্ঠে লেখার তারিফ করলেন। এর মধ্যে আমার স্বামীও বাইরে থেকে এসে গেলেন। নাশতা তৈরী করে দিলাম। তাতেও খুশী। বলেন, লেখার তারিফ বেশী করব না, নাকি রান্নার তারিফ বেশী করব বুঝতে পারছি না। সুফু। আমার বোন নেই। তুমি আমাকে দাদু ডাকবে আর 'তুমি' বলবে। একদিনে এত অকপটে স্নেহ মমতা উদারতায় কাছে টেনে নিলেন যিনি তাঁকে ভক্তি না করে পারি?[১]

কবি নজরুল *সাঁঝের মায়া* কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন। সুফিয়ার প্রতি তাঁর মমতার হাত সর্বদাই প্রসারিত ছিলো। সে কৃতজ্ঞতার স্বীকারোক্তি সুফিয়ার উচ্চারণেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে :

> কবি হিসেবে তাঁর যা পরিচয়, মানুষ হিসেবে তার চেয়ে কম নয়। তাঁর উদারতা অন্য কোন কবির মধ্যে দেখা যায়নি। তখনকার যুগের অনেক লেখক-লেখিকা তাঁর স্নেহধন্য হয়েছেন। এমনও অনেকে আছেন যে নজরুলই তাঁদের সাহিত্য আসরে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। তাঁরই সস্নেহ প্রেরণায় আজ আমার মতো নগন্যাও সুধী সমাজে পরিচিতা হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছি।[২]

সুফিয়া কামাল সম্পর্কে নজরুল যে প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেছেন তা নিম্নরূপ :

> কবি সুফিয়া এন. হোসেন বাঙলার কাব্যগগনে উদয়তারা। অন্ততোরণ হতে আমি তাকে যে বিস্মিত মুগ্ধচিত্তে আমার অভিনন্দন জানাতে পারলাম। এ আনন্দ আমার স্মরণীয় হয়ে থাকবে।[৩]

সুফিয়া কামালের প্রতি কবি নজরুলের আন্তরিকতাপূর্ণ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে। নজরুলের দুঃসময় উৎকণ্ঠিত করতো ভগিনীতুল্য সুফিয়া কামালকে। তারই প্রামাণ্য তথ্য সংকলিত হয়েছে সওগাত সম্পাদককে লিখিত সুফিয়ার পত্রে। ৪ঠা জুলাই ১৯২৭ সালে লিখিত পত্রের কিয়দংশ উল্লেখিত হলো:

> শ্রদ্ধেয় সম্পাদক সাহেব,
> কাগজে সেদিন দেখলুম, তাকে ঢাকায় কারা নাকি আক্রমণ করে মারধোর পর্যন্ত করেছে। – যদি সত্যিই হয় যে, সে এমন কোনো কাজ করায় তাকে এরূপভাবে অপমানিত হতে হয়েছে, তা হলে আরো বেশি করে দরকার ওকে আগলাবার...
> বর্তমান সময়ে ওর একটা মান অপমানে আমাদের সমস্ত মোসলেম সমাজের মান অপমান জড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে আপনাদের আরো। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর লোক আমাদের সমাজে আছেন বটে কিন্তু তারা শুধু অহং-ই। এরা নিজের অঙ্গে একটু আঘাত পেলে উহুঁ করবেন কিন্তু সমাজ কিংবা জাতীয় কোনো কাজে এদের টান নেই, এটা আপনি ভালোই জানেন। নয়ত আমাদের বাঙালী মোসলেম জাতির মধ্যে একটি মাত্র সাহিত্য জগতের আশাপ্রদীপ ঐ কাজী ওর কি এমনি হেলার দশা হয় কখনো? এমন কেউ নেই যে ওকে আপন বলে স্বীকার করে। তাই-ত তার এ দশা।

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ: প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৯০
[২] উদ্ধৃত, ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *সুফিয়া কামাল*, পৃষ্ঠা-২২১
[৩] *ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, সুফিয়া কামাল*, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ-৬৪

...

আমার স্বামী এখন পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছেন, নয়ত ওঁকে দিয়ে কাজীর খোঁজ নেওয়াতুম। ... ওর মা হয়ে বোন হয়ে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। হতভাগাটাকে পথ থেকে এনে স্নেহ দিয়ে বাঁধুন। এ দুরন্ত, শাসনে শায়েস্তা হবেই না। ... ভেবে দেখবেন একটু। তার মাও মারা গেছে শুনলুম। এখন কাজী কোথায় আছে ও তার স্ত্রীপুত্র কোথায় আছে, অনুগ্রহ করে সত্বর জানাবেন। কি কি ঘটনা হলো আমাকে জানাবেন। ওর মা বেঁচে থাকলে হয়ত এমনি অধীর আগ্রহে আকুল অনুরোধ জানাত। আপনাকে, আমিও জানাচ্ছি। আমি কাজীর বোন, আমাকে অনুগ্রহ করে কষ্ট স্বীকার করে সব কথা জানাবেন ও তার দিকে একটু খেয়াল করবেন। রবীন্দ্রনাথের পরে আর এক রবীন্দ্রনাথ হয়ত হবে কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম আর হবে না।

ইতি এন সুফিয়া কামাল হোসেন।[১]

নজরুলের প্রতি পীড়নকারীদেরকে ঘৃণা করতেন সুফিয়া কামাল। নজরুলের অবমূল্যায়নকে তিনি মেনে নিতে পারেননি কখনো। কেবল নজরুল নন, তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি স্মরণ করেছেন তাঁদেরকে যাঁরা তাঁর দুঃসময়ের সহমর্মী ছিলেন। এঁদের কয়েকজনের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে নিম্নবর্ণিত বর্ণনাংশে :

কবি দাদুর মাধ্যমেই সওগাত সম্পাদক নাসিরউদ্দীন সাহেবের বাড়ী ১১নং ওয়েলেসলী স্ট্রীটে যাওয়া আসার সূত্রপাত। সেই থেকে নাসিরউদ্দীন সাহেব আমার সুখে দুঃখে বিপদে শোকে অগ্রজের ভূমিকা পালন করে সদাসর্তক স্নেহ দিয়ে সাহিত্য সাধনায় আমাকে নিয়োগ রেখেছেন। একথা আমি কখনও ভুলব না। দুর্দিনে আরও যারা আমার কাছে এসেছিলেন, যেমন কবি খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, কবি বেনজীর আহমদ, এঁরা আমার দুঃখের দিনে আল্লাহর দেওয়া সাথী হয়েছিলেন। কবি বেনজীর আহমদ বেনুভাই আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাঁঝের মায়া' ও 'কেয়ার কাঁটা' প্রকাশ করে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত এবং আর্থিক সহায়তা করেছেন। অকপট অমলিন তাঁদের স্নেহ মমতার কথা আমার স্মৃতিতে অমূল্য রত্নের মতো উজ্জ্বল।[১]

সুফিয়া কামাল অতীতস্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে স্মরণ করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত দুঃসময়কে, দেশের ক্ষুব্ধ-তরঙ্গায়িত মানবপরিবেশকে, একাত্তরের যুদ্ধ, যুদ্ধ-উত্তরকালীন স্বার্থান্ধ কুচক্রীর ষড়যন্ত্র, স্বনামধন্য লীলানাগ প্রতিষ্ঠিত নারীশিক্ষা মন্দির এবং শান্তি কমিটির কার্যক্রম, উয়ারী মহিলা সমিতি, চাঁদের হাট ও কচিকাঁচার মেলার বলিষ্ঠ-পদচারণার কথা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা এবং তৎ-পরবর্তী প্রতিকূল বিষময় পরিবেশকে তিনি চিহ্নিত করেছেন এভাবে :

সাইমন কমিশনের পর ক্রিপ্‌স কমিশনেরও কত আন্দোলন আলোচনায় কত প্রাণনাশ, হত্যাকাণ্ড, রক্ত বিনিময়ে এল 'পাকিস্তান'। মুসলমানদের সর্বহারার অসীম আশা প্রত্যাশা ভরা পাকিস্তান। কিন্তু সে স্বপ্নের স্বর্গ রক্তস্নাত লাখো শহীদের পুত্রহীনা পিতামাতা, স্বামীহারা নারী, স্বজনহীন মানুষের

[১] উদ্বৃত, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে সওগাত, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-৬৮১

[১] *সুফিয়া কামাল রচনা সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৯০-৫৯১

> হাহাকারের হাওয়ায় অধীনতা দূর করা পাকিস্তানও ছিলনা পথের দিশা। দেশ বিভাগের পর যারা দেশ গড়ার ভার নিলেন তারা মোহাচ্ছন্ন, ভ্রান্ত, স্বার্থ-কুটিলমনা। লোভ হিংসা পদমোহের জগদ্দল পাথরে চূর্ণ হয়ে গেল সে সাধের সৌধ। যারা প্রাণ দিল তাদের কথা ভুলে গেল শাসকগোষ্ঠী।[২]

লীলানাগ প্রসঙ্গে সুফিয়া কামাল বলেন,

> অসীম ধৈর্য ছিল লীলাদির। বলতেন, ওদের সাথে না মিশলে, সমব্যথী না হলে ওরা আমাদের কথা শুনবে কেন? এই একটা শিক্ষা তাঁর কাছে পেয়েছি, এবং আজও সেই শিক্ষার জন্যই আমি আন্তরিকভাবে যেটুকু পারি সমাজ সেবায় অংশ নিয়ে, দুঃখীদের সাথে দরিদ্রদের সাথে মিশতে পারি।[৩]

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপনে শাসকগোষ্ঠীর কোপানলে পড়েন সুফিয়া কামাল। অকুতোভয় সুফিয়া সকল বৈরিতাকে উপেক্ষা করে এ কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সফলভাবে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেন। এ বিষয়টি তাঁর স্মৃতিচারণায় জাগ্রত হয়েছে এভাবে :

> এল রবীন্দ্র শত বার্ষিকী। অজুহাত পেল মূর্খের দল। নিষেধ জারী করতে তৎপর হয়ে উঠে পড়ে লাগল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বন্ধ করার জন্য। রাজধানী ঢাকা থেকে গ্রামে গঞ্জে মফস্বলে ছড়িয়ে পড়ল অর্বাচীন দলের এ অবিশ্বাস্য আদেশের কথা। রাজধানীর গুণী সুধীজন তরুণ কিশোর দল বিক্ষুব্ধ। বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। ... আমার কাছে তখনকার দিনের শিল্পী সাহিত্যিক সমাজসেবীরা এসে নানারূপ পরিকল্পনায় রবীন্দ্রজয়ন্তী অবশ্য পালন করার প্রতিজ্ঞা শপথ গ্রহণ করলেন। সরকার তা শুনে আমার বাড়ীতে তৎকালীন অনেক পদস্থ কর্মচারী, উপদেষ্টা, ধর্মীয় ব্যক্তি পাঠাতে লাগলেন। আমার স্বামী তখনও সরকারী চাকুরে। কিন্তু তিনিও উৎসাহিত হয়ে আমাদের সমর্থন করলেন। কত যে বাধা ব্যাঘাতের মধ্য দিয়ে অসম সাহসে ঝাঁপিয়ে পড়লাম সে আন্দোলনে। মহাসমারোহে পালিত হল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সাহেবকে দিয়ে উদ্বোধন করানো হল সে অনুষ্ঠান। তারপর সারা বাংলাদেশে চট্টগ্রাম থেকে সিলেট, রংপুর, দিনাজপুর বগুড়া থেকে বরিশাল পর্যন্ত চল্‌ল মাস ধরে সে উৎসব।[১]

সে সময়ই সুফিয়া কামাল প্রতিষ্ঠা করেন 'ছায়ানট'। সুস্থ ও পরিশীলিত সংগীতচর্চার মাধ্যম হিসেবে জনপ্রিয় এই ছায়ানটকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল আন্তরিকতা ও প্রাণবন্ততার মহাসমারোহ। সে সময়কে মনে করে সুফিয়া কামাল আক্ষেপোক্তি করেন–

> আজ ভাবলে বেশ বিস্মিত প্রশ্ন জাগে সেই প্রাণবন্ত সুন্দর আনন্দঘন মনগুলি কোথায় গেল? এখন কেন হয় না তেমন নিষ্ঠায় একতায় আন্তরিকতায় একটি প্রতিষ্ঠান একটা সেবামূলক সংগঠন।[২]

---

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৯২
[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৯২
[১] *সুফিয়া কামাল রচনা সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৯২-৫৯৩
[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৯৩

'কচিকাঁচার মেলা' প্রতিষ্ঠা সুফিয়া কামালের অন্যতম সার্থকতা। এ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন–

> আমি বহুদিক দিয়ে বহুজনের দানে ধন্য, কিন্তু কচিকাঁচার মেলা আমার গৌরবের। সারা বাংলাদেশের ছড়িয়ে তখনকার দিনের পাকিস্তান এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও পুরস্কার লাভে কচি কাঁচা আজ শিশু কল্যাণমূলক একটি বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। ... রোকনুজ্জামান দাদা ভাইয়ের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের এ ফসল।[৩]

সুফিয়া কামাল তাঁর স্মৃতিচারণে দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশকে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণদৃষ্টি দিয়েই অবলোকন করেছেন। পাকিস্তানি সামরিক শাসন, তার পতন, শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, তার কার্যক্রম, বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি তিনি অঙ্কন করেছেন অত্যন্ত নিস্পৃহ ভঙ্গিতে। মানুষের বিপর্যয়ে তিনি কখনোই নিশ্চুপ ছিলেন না, গড়ে তুলেছেন নানা সংগঠন, সমিতি, সংস্থা। মহিলা পরিষদের মাধ্যমে বুভুক্ষ, আর্ত-পীড়িত মা-বোনদের সেবা করেছেন পথে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে। এ প্রসঙ্গে মহাদেব সাহার মন্তব্য স্মরণীয় :

> এদেশের যে কোন দুর্যোগে, জাতির বিপদের মুহূর্তে অভয়দাত্রীরূপে তিনি পাশে দাঁড়িয়েছেন। স্বৈরাচার দুঃশাসন, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, অশুভ আস্ফালন সর্বক্ষেত্রেই তাঁর কণ্ঠ ছিল সর্বাগ্রে সোচ্চার। ... তিনি সকল বিপদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, ডাক দিয়েছেন, শুভ শক্তিকে একত্রিত ও সংগঠিত করেছেন। এই কাজ করেছেন তিনি প্রায় এক শতাব্দী, আমৃত্যু। ... যেখানেই গোঁড়ামি, যেখানেই অন্ধকার, সেখানেই দ্বীপ জ্বালিয়েছেন তিনি। একদা কৈশোর-উত্তীর্ণ জীবনে তিনি যে মানবমুক্তির ও মানবসেবার ব্রত কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন সেখানে অবিচল। তাকে বলা হয় বেগম রোকেয়ার পথ ধরে নারীমুক্তির জন্য নিবেদিত প্রাণ, কিন্তু তিনি মেধায় মানবমুক্তিরই ব্রতে নিয়োজিত ছিলেন। নারীদের দুর্গতি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাদের মুক্তির জন্য কাজ করেছেন তিনি, সেও তো এই সামগ্রিক মানবমুক্তির এষণা থেকেই, তাই তাঁর চিন্তা কর্মসাধনার মধ্যে কোনো ফাঁক ছিল না। ... তিনি যে আলোর শিখা জ্বালিয়ে গেছেন তা অনিবার্ণ, সেই আলোই হবে আমাদের দীপ শিখা।[১]

একালে আমাদের কাল গ্রন্থে সুফিয়া কামাল শায়েস্তাবাদের নামকরণ প্রসঙ্গ উলেখ করেছেন :

> শায়েস্তাবাদ নামকরণের কথাই বলি। তখনকার দিনে দিল্লী লক্ষ্ণৌ এলাহাবাদ বা যে কোন জায়গা থেকেই হোক নওয়াব সুবাদের আসা-যাওয়া নৌকা যোগেই চলত। নওয়াব শায়েস্তাখান দিল্লী থেকে ঢাকা আসার পথে এক সন্ধ্যায় ঝড়ের মুখে পড়ে অন্ধকার রাত্রে কোনো রকমে একটি চরের উপর আশ্রয় নিলেন। সেখানে দেখলেন কয়েকজন মানুষ, তারা 'নাইয়া'। ... সেই নাইয়াদের সাহায্যে সেই চরে আশ্রয় নিলেন। তখন ভোর হতে বেশী দেরী নেই। ভোর হতে সেখানে আজান দিয়ে লোকজনসহ নামায আদায় করলেন। পরে জানলেন নাইয়ারাও ঝড়ের আভাস দেখে আশ্রয়

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯৩-৫৯৪

[১] লুৎফর রহমার রিটন (সম্পা.), *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫

> নিয়েছে। নওয়াব শায়েস্তা খান নাইয়াদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে সেখানে লাখেরাজ জমি দিলেন বসবাস করার জন্য। তাঁরই নামে নতুন সে চরের নাম হল শায়েস্তাবাদ।[২]

নওয়াব শায়েস্তা খানের প্রথমা কন্যা পরীবানুর সাথে সুফিয়া কামালের নানার পূর্বপুরুষের বিয়েতে পানদান খরচা স্বরূপ এই শায়েস্তাবাদ পরগণা যৌতুক দিয়েছিলেন। পরীবানুর সন্তান-সন্ততিই ছিল শায়েস্তাবাদের প্রথম বাসিন্দা এবং সেখানকার গোরস্তানে পরীবানুই প্রথম সমাধিস্থ হন। পরীবানুর সমাধি সম্পর্কে ঐতিহাসিক সত্যতার পরিচয় তুলে ধরেছেন সুফিয়া কামাল। লালবাগে পরীবানুর সমাধিতে শায়িত যিনি তিনি শায়েস্তা খানের কন্যা নন– এ বিষয়ে ড. এনামুল হক প্রামাণ্য প্রবন্ধ লিখেছেন বলে সুফিয়া কামাল অভিমত প্রকাশ করেছেন।

ইংরেজ আমলে অত্যাচারিত জমিদারদের দুদর্শা বর্ণিত হয়েছে গ্রন্থটিতে। তবে শায়েস্তাবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে সুফিয়া কামাল নিরূপণ করেছেন এভাবে :

> ইংরেজ শাসনামলে বড় বড় মুসলিম পরিবারের নওয়াব আমীররা যে কীভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন ইতিহাসে সে কথা লেখা আছে। তাই লাখেরাজ শায়েস্তাবাদ পরগণার জমিদারের কাছ থেকেও খাজনা আদায় করে নিতে ইংরেজ সরকার দেরী করেনি। কিন্তু তবুও নদী পার হয়ে শায়েস্তাবাদে কোনো ইংরেজ কর্মচারীর ঢুকবার অধিকার ছিলনা। আমরা ছোটবেলায় তা দেখেছি। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট যেই আসুক আগে লোক পাঠিয়ে চিঠি লিখে জানিয়ে তবে আসতে পারত। আমার নানা শান্ত দরবেশ প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু তার ছোট ভাই দুটি সাহসী ছিলেন। খাজনা দাবী করার সময়ে তিনিই এই প্রথা প্রচলন করেন যে খাজনা দিবেন। কিন্তু ব্যাটাদের কেউ যেন এসে শায়েস্তাবাদের মাটিতে পা না দিতে পারেন। নদীর ওপারে একটি গাছের তলায় ধামা ভরে টাকা ঢেলে দেওয়াতেন নায়েবকে দিয়ে। সরকারী লোকেরা সে টাকা নিয়ে যেত। আমরা সেই নায়েব বাবুর বংশধর নায়েব বাবুর কাছে একথা শুনেছি।[৩]

ইংরেজদের সম্পর্কে আরো তথ্য রয়েছে গ্রন্থটিতে :

> সিপাহী বিদ্রোহের সময় আমার নানা অনেক ইংরেজদের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। নিজেদের প্রতি ইংরেজদের অত্যাচারের কথা ভুলে বা ক্ষমা ও দুঃস্থজনকে রক্ষা করা ইসলামের নীতি এই কথা মনে করেই। কিন্তু আবার এই স্বদেশী আন্দোলনে ইংরেজ সরকার শায়েস্তাবাদ পরিবারের উপর বিরূপ হয়ে কৈফিয়ৎ তলবও করেছিলেন। আমার মামারা তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বাড়ীতে চরকা তাঁত বসিয়েছিলেন। বিলাতী নুন চিনির বদলে দেশী নুন চিনি খাওয়া প্রচলন করলেন।[১]

এ-গ্রন্থে সুফিয়া কামাল অলৌকিক কিছু কাহিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর স্মৃতি থেকে; যা বর্তমান যুগে বিশ্বাসের পরিপন্থী বলেই তিনি মনে করেন। কিন্তু ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সে

---

[২] *সুফিয়া কামাল রচনা সংগ্রহ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৭৫

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৭৫-৫৭৬

[১] *সুফিয়া কামাল রচনা সংগ্রহ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৭৯

ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করার লোভ তিনি সামলাতে পারেননি। সে ধরনের ঘটনা সম্পর্কে তাঁর সচেতন-অভিমত তুলে ধরা হলো :

> আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করি আর বিজ্ঞান যে দিনে দিনে আমাদের কাছে অদৃশ্য জগতের নিত্য নতুন খবর এনে দিচ্ছে সেটাও সত্য ... কিন্তু তবু বিজ্ঞানের বাইরেও অনেক কিছু সেকালে যা ছিল একালেও তা আছে কিনা তা অনুসন্ধান কেউ করে বলে জানিনা। অলৌকিক ঘটনা বলতে যা বুঝায় আমার বাল্যজীবনে তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ বহুবার হয়েছিল। জানিনা এ যুগে তা বিশ্বাস হবে কি না।[২]

সুফিয়া কামাল 'জিন' সম্পর্কিত দুটো ঘটনার উলেখ করেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়। এছাড়াও অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন দুটি। এরকম একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল সুফিয়া কামালের ছেলেবেলায়। তখন সুফিয়া কামালের নানা জীবিত ছিলেন না এবং সুফিয়ার বয়স দেড় বৎসর। ঘটনাটি সুফিয়া কামাল বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> আমার নানা যখন মারা যান তখন আমার দেড় বছর বয়স। নানাকে দেখিনি বললেই হয়। তার ছবি দেখেছি অবশ্য। ছোটবেলায় আমার একটা অভ্যাস ছিল একা একা অতবড় বিরাট বাড়ীতে অসংখ্য বন্ধ ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ানো। আর প্রায়ই হারিয়ে ফেলতাম। তখন দেখতাম নানার মত দাঁড়িওয়ালা একজন আমাকে সে ঘুপচি পথ থেকে অন্দরের গেটে এক বারান্দায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে যেতেন। আম্মা বা অন্যরা খুঁজে খুঁজে হঠাৎ পেয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেন কোথায় গিয়েছিলাম। যদি বলতাম ওই কামরায় গিয়েছিলাম, সবাই আশ্চর্য হয়ে বলতেন ওখানে ত কেউ যায় না। কি করে গেলাম? এলামই বা কী করে? আমি নাকি বলতাম নানা দিয়ে গেলেন। শুনে সবাই হাসতেন। কিন্তু ভয় পেতেন না বরং খুশী হতেন।
>
> শুনতাম নানার সাথে নাকি জ্বিন-এর বন্ধুত্ব ছিল এবং শর্ত ছিল নানার বংশধরদের উপকার ছাড়া কোনো অপকার হবে না কোন জ্বিন এর দ্বারা। শায়েস্তাবাদ পরিবারের আনন্দজনক ঘটনায় সে মূর্তি আনন্দ হাস্য জড়িত মুখে দেখা দিতেন। বিষাদে দুঃখে বিমর্ষ মলিন মুখ মূর্তিও অনেকে দেখেছেন। এসব এ যুগে হাস্যকর শোনাবে। কিন্তু আমি লিখে রাখলাম। হয়ত আগামী কোনো যুগে আবার এ নিয়ে কেউ গভীর গবেষণাও শুরু করতে পারেন। দুনিয়ায় আশ্চর্য বলে কথা আছে। কিন্তু অসম্ভব বলে কোন কথা নেই।[১]

অলৌকিক আরেকটি ঘটনার কথা উলেখ করেছেন সুফিয়া কামাল এ গ্রন্থে। তখন তিনি ছিলেন অল্পবয়সী, কলকাতায় অবস্থান করছিলেন মায়ের সাথে খালার বাড়িতে। এক রাত্রে হগ মার্কেটে আগুন লাগাতে তার শিশুমন ভয় পেয়ে কেঁদে উঠেছিল। কারণ হগ মার্কেটের পুতুলগুলোর জন্য তার কান্না পাচ্ছিল। পরে সে ঘটনার আধ্যাত্মিক কথা তিনি জেনেছিলেন। হগ্ মার্কেটের পাশে এক সাধু এসে বসলে তাকে ঘিরে জনতার উৎসাহ, ভক্তি, অর্চনা, সবই চলতে লাগল।এতে

---

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৭২

[১] *সুফিয়া কামাল রচনা সংগ্রহ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৭৪-৭৫

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন মার্কেটের এক শোকেস-ওয়ালা দোকানদার। তিনি পুলিশ ডেকে সাধুকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে সাধু তাকে অভিশাপ দেয় এই বলে যে– 'আচ্ছা বেটা। আমি যাচ্ছি। কিন্তু তুমিও তো যাবে।' এই বলে সাধু কোন পথে অদৃশ্য হয়ে গেলেন কেউ দেখতে পেলো না। সেই রাতেই হগ্ মার্কেটে আগুন লেগে সেই শো-কেসওয়ালা দোকানদারের দোকান পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে আশেপাশের সব দোকানই অক্ষত রইল। এ ঘটনা সম্পর্কে সুফিয়া কামাল মন্তব্য করেন–

> তখকার দিনের সব দৈব ঘটনা এবং আধ্যাত্মিক শক্তি সাধনার কথা লোকমুখে শুনে যে কত ভয় ভীতি ভরা ভক্তি শ্রদ্ধার ভাব উদয় হয়েছে। জানিনা এসব ঘটনা সত্যি কতখানি। তবে সে কালের মানুষের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সাধু-সাধক জনকে অবহেলা করলে বা তাঁদের সাথে অশ্লিষ্ট ব্যবহার করলে ভালো হয় না। সাধু-সাধক, ফকীর-দরবেশকে আমরা ছোটবেলা থেকে ভক্তিভাজন মাননীয় বলে মেনে এসেছি। আমাদের পরিবার আবার ছিল পীর পরস্তি বা মাজার পরস্তির বিরোধী। মাজার মানত করা, শিরনী দেওয়া, চাদর-চড়ানো ইত্যাদি কর্ম' বেদাত' বলে গণ্য হতো।[২]

অন্য ঘটনাটি ছিলো সুফিয়া কামালের মামার দাই মায়ের পুত্রবধূকে নিয়ে। সেকালে সন্তানকে 'দাই' রেখে দুগ্ধপান করানো আভিজাত্যের গৌরব বলেই মানা হতো। সেই দাইমার সন্তানকে মামা বলেই ডাকতেন সুফিয়া কামাল। একবার সেই মামার স্ত্রী মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে দেখেন তার মাথার চুল জটা পাকিয়ে বেশ লম্বা হয়ে গেছে। সে থেকে তিনি অন্যরকম ব্যবহার করতেন। কারো সঙ্গে মিশতেন না, কেবল গোসল করে সময় কাটাতেন। নিজ হাতে রেঁধে খেতেন এবং তার ঘরে কাউকে ঢুকতে দিতেন না। এভাবে মাস পার হয়ে গেলে সুফিয়ার মামা একদিন সে স্ত্রীকে সংসারের কর্মক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে ফিরিয়ে আনার ব্যর্থ চেষ্টা করে অনেক টানা- হেঁচড়া করলে প্রায় সপ্তাহখানেক পর সে মামা মৃত্যুবরণ করেন মামীকে বিরক্ত করার জন্য। সুফিয়া কামালের ভাষায় :

> এর পর সেই মামী আমাদের পরিবারে আশ্রয় নিয়ে এলেন। অত লম্বা চুল তার সব জট বেঁধে কি রকম যে হয়ে গেছল। বহু বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। আমাকে কাঁথা সেলাই করতে, পাখা বুনতে, হোগলা বুনতে শিখিয়েছিলেন। কাউকে ধরা ছোঁয়া দিতেন না। স্ব-পাকে খেতেন। ছোট বাচ্চাদের অসুখ বিসুখ হলে সবাই তাকে ডাকত। ঝাড় ফুঁক দিয়ে দিলে ভালোও হত। কিন্তু আরও আশ্চর্য কাণ্ড দেখতাম তিনি যাকে দেখে ঝাড়ফুঁক দিতেন না সে ভালোও হতো না। একে অলৌকিক বলব বা কি বলব, বিজ্ঞান কি এর সন্ধান রাখে?[১]

এ প্রসঙ্গে সুফিয়া কামাল তাঁর এক দূর সম্পর্কীয় ডাক্তার মামার অলৌকিক ক্ষমতার কথাও স্মরণ করেছেন :

---

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৭১

[১] *সুফিয়া কামাল রচনা সংগ্রহ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৭৩

আমার একজন দূর সম্পর্কের ডাক্তার মামা ছিলেন। রেঙ্গুন ঘুরে এসে বাড়ীতে সখের ডাক্তারী আর এই বাগান নিয়ে তিনি এতই মশগুল হয়ে গেলেন যে রাত্রে সবাই ঘুমালেও তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতেন কোন গাছে কোন ফুলটা ফুটল, না বুঝি কী কথাটা কয়ে উঠল। তিনি নানারূপ ভেষজ বৃক্ষলতার চাষও করতেন। কোন পাতার কি গুণ কোন গাছের হাওয়ায় কত উপকার তিনি তা আমাদের বলতেন। একে ত আমাদের পরিবারের ভাষা ছিল উর্দু, তারপর বহুদিন বিদেশ কাটিয়ে নানা ভাষায় জগাখিচুড়ি করে মালীদের যখন বকতেন তখন আমরা খুব মজা পেতাম। এই ডাক্তার মামা ছিলেন ঢাকারই এক প্রসিদ্ধ পরী বংশের সন্তান। তার পূর্ব পুরুষ নাকি এসেছিলেন বাগদাদ থেকে। তিনি একটি দোয়া জানতেন, পানিতে সেই দোয়া পড়ে ফুঁক দিয়ে যে কোন কলেরা রুগীকে খাওয়ালে সে ভাল হয়ে যেত। আমি ছোটবেলায় নিজেই তা দেখেছি। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রযুগে একথা হয়ত প্রলাপ বলে ধরা হবে।[২]

তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় বিবাহ-প্রথা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করেছেন সুফিয়া কামাল। সে সময়ের রীতি-নীতি তাঁর জবানিতে উল্লেখ করা হলো:

সে কালে বড় পরিবার বিশেষ করে সৈয়দ পরিবারের বিয়ে শাদী নিজেদের পরিবারের মধ্যে হওয়ার প্রথা ছিল। আজকাল যেমন মেয়ে দেখানোর রেওয়াজ চালু হয়েছে সেকালে সে কথা ত চরম অপমান ও বেইজ্জতি বলেই গণ্য হত। তাই মামাত চাচাত খালাত ফুফাত ভাইবোনের মধ্যেই বিয়ের ব্যাপার সীমাবদ্ধ ছিল। এতে করে সম্পত্তিও বাইরে যেত না অন্য কারুর হাতে। আরও থাকত বংশগত সৌন্দর্য ও সোহবত তাজিম আদব কায়দা রক্ষার ব্যবস্থা। অবশ্য এটা ভালো কি মন্দ তা তখনকার যুগে মোটেই বিচার করা হতো না। এরই মধ্যে বংশে উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রী না থাকলে অনেক সন্ধান অনেক বিবেচনা করে মেয়ে বা ছেলেকে বাইরে বিয়ে দিত। প্রাণান্ত হতে হত। আর তখন সৈয়দ বংশের ছেলে বা মেয়ের জন্য বড় বড় জমিদার বা চাকুরেরা হন্য হয়ে থাকত। সৈয়দ বংশের ছেলে পেলেত পায়ের ধুলা দিয়ে যেন ধন্য হত ছেলের শ্বশুরকুল। আর সৈয়দ বংশের মেয়ে নিয়েও বড় সম্মানে শ্বশুরকুল বৌকে প্রাধান্য দান করতেন। এমনি করে আমার নানার কাছে ভিক্ষার মতো চেয়ে নিয়ে আমার এক মামা সৈয়দ মাহমুদ হোসেনকে উলানিয়ার জমিদার তার মেয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন। ... মেদিনীপুরে সোহরাওয়ার্দী পরিবারে স্বপ্নাদেশ হয়েছিল একটি সৈয়দের মেয়েকে বধূরূপে পরিবারে আনতে। আমার আম্মা এক চাচাতো ভাইয়ের মেয়েকে বহু সাধ্য সাধনায় বিয়ে করিয়ে নিয়েছিলেন।[১]

নওয়াব বাড়ির অন্তঃপুরবাসিনীদের উৎসবের চালচিত্র সম্পর্কে অবহিত করেছেন সুফিয়া কামাল তাঁর এই গ্রন্থে। নিম্নে তা উল্লেখিত হলো :

ফাল্গুন মাস পড়লেই কাপড় রাঙ্গাবার ধুম পড়ে যেত। সেও যেন এক উৎসব। শেফালী ফুল, কুসুম ফুল, বাসন্তী রং, গুলাই আনার রং, হালকা নীল সবুজ গোলাপী রং, ঘরেই তৈরি হত। কুসুম ফুলই চোলাই করে সোডা সাজি মাটি লেবুর রস দিয়ে নীল সবুজ রং করা হত। গোসল অজু করে পাক

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৬৪

[১] *সুফিয়া কামাল রচনা সংগ্রহ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৭১-৫৭২

> সাফ হয়ে তবে রং চোলাইয়ের ঘরে ঢুকতে হত। কাপড় রং করা হয়ে গেলে সবাই মিলে সেই রং নিয়ে খেলে হাসি কলরবে মেতে উঠতেন। ঠাট্টা সম্পর্কের দুলাভাই নানা-নাতীরাও এতে অংশ নিতে পারতেন। রং করা শাড়ীতে-কাপড়ে আবার আতর লোবানের ধোঁয়া দিয়ে 'বাসাও' করা হত। সারাদিনের পর আসরের নামাযের সময় সেই শাড়ী পরে সবাই যখন একসাথে হতেন তখন সত্যিই স্বপ্নপুরীর শাহজাদীদের কথা মনে পড়ত। আমার আম্মার চুল ছিল পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত। সেই চুল আলনায় হাওয়া করে শুকিয়ে নেয়া হত। তারপর চুল বাঁধার পালা, কত যে মানুষ ছিল, একজন একজনের খোঁপা বেণী এক এক রকম করে বেঁধে দিতেন। গরমের দিনে খাটের উপরই সবাই সারাদিন নামায সেরে নিতেন। তারপর চলত চা পানের পালা। সারাদিন যে সব পিঠা, হালুয়া মোরব্বা তৈরী হত বাইরে খানসামা আর ভিতরে চাকরানীরা বড় বড় রূপার ছেনি ভরে তা পৌঁছাত। কিন্তু মেহমান এলে বেগম-বিবিদের এ আয়েশ আর থাকত না। সে সন্ধ্যায়ই হোক আর রাতই হোক। খালি বাবুর্চির হাতের খানা-নাশতা মেহমানকে দিতে বে-ইজ্জুতি মনে হত বলে তখনি আবার নতুন করে খাবার তৈরি করতে হত। চা-শরবত পান এ সবই অন্দর মহল থেকে যাওয়া চাই।[২]

সুফিয়া কামালের শিশুকালেই জমিদারের ভগ্নদশা শুরুহয়। বিপুল ঐশ্বর্য জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ সবই ক্রমশ ক্ষয়ে যেতে থাকে। কালাবদরের করাল গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় শায়েস্তাবাদের নওয়াব পরিবার। জীবনস্মৃতিকথায় সে বর্ণনা এসেছে এভাবে :

> ধন-জন-বল যেন জোয়ারের জল–এ কথা আমার জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছি অতি কঠোর তিক্ত তীব্র এবং তীক্ষ্ণভাবে। জোয়ারের উপচানো সুখের দিন দুর্দিনে ভাটির টানে কখন যে সরতে শুরু করেছে তা টের পাইনি। অবশ্য টের পাওয়ার বয়স তখন হয়নি। শুধু দেখতাম ঢাকা-কোলকাতা-বরিশাল থেকে লোকজন আসছে যাচ্ছে আর শুনতাম এর মৃত্যু সংবাদ, ওর মৃত্যু সংবাদ– আর বিরাট বাড়ী ঘর লোকের বিষাদে বিমর্ষ, ম্লান, চারিদিকে অঝোর কান্না, তুহিন শীতল স্তব্ধতা। নওয়াব শায়েস্তা খানের দুহিতার গোরস্থান তাঁর বংশধরদের গোরে গোরে ভরে উঠল, আর বিরাট প্রাসাদ শূন্য হতে লাগল। রাক্ষসী কালাবদরও এগিয়ে এল তার লোল জিহ্বা বিস্তার করে। ... রাক্ষসী পদ্মার অন্য বাহু 'কালাবদর' সমস্তই গ্রাস করেছে। আজ উত্তাল তরঙ্গ সেই স্বর্ণভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত। ... শায়েস্তাবাদ গ্রাস করেছে কালাবদর।[১]

একালে আমাদের কাল স্মৃতিকথায় সুফিয়া কামাল পরিবারের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন–'এ আমার জীবনী নয়। শুধু বিস্মৃতির স্মৃতি থেকে যা পারি সে কালের কথা বলেছি। সেকালের পরিবারের আচার ব্যবহারের কথাই লিখব।' সুফিয়া কামাল সেকালের জীবনাচরণ, বিনোদন, বিবাহ প্রথাসহ প্রায় সব বিষয় উপস্থাপন করেছেন। তবুও তাঁর বিস্তারিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রচিত না হওয়ায় আক্ষেপোক্তি করেছেন দ্বিজেন শর্মা। সুফিয়া কামালকে লিখিত এক পত্রে সে তথ্য পাওয়া যায়। ৩০.১২.১৯৮৯ তারিখে লিখিত পত্রটির কিয়দংশ উল্লিখিত হলো :

---

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৬৪

[১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৬৭

বেগম সুফিয়া কামাল

পরম শ্রদ্ধেয়া,

আপনার চিঠি ও বইগুলির জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা। 'একালে আমাদের কাল' অনেক আগেই পড়েছি, মতি দিয়েছিলেন, একটা আলোচনাও সংবাদে বেরোয় 'তিনি বাঙালির সাহস', লিখেছিলাম মস্কো থেকেই, আমি সংবাদের সেই সংখ্যাটি পাইনি, আপনি দেখেছিলেন কি?

... আপনি যে বিস্তারিত আত্মজীবনী লিখলেন না, সেটা আমাদের জন্য, সারা জাতির জন্য একটা বড় ক্ষতি হল। ... ত্রিকালজ্ঞ অর্থাৎ যাঁরা বৃটিশ আমল, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ দেখেছেন ও এই পর্যায়গুলি বিষয়গতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন– আপনিও সেই ত্রিকালজ্ঞদের একজন। সেই অর্থে আপনার আত্মজীবনী আমাদের জন্য প্রয়োজন ছিল। ---

ইতি দ্বিজেন।[২]

একালে আমাদের কাল সুফিয়া কামালের স্মৃতিবিজড়িত গ্রন্থ। স্মৃতিচারণধর্মী এ গ্রন্থে সুফিয়া কামালের বর্ণনভঙ্গিমা কখনো কখনো হয়ে উঠেছে গীতময় ও চিত্রময় :

সেই ত জীবন - সেই স্বপ্ন ছন্দ সুর ব্যথা, আর তার সাথে শুরু দু:খ-অভাব-অনটনের। ব্যথার যে কত রূপ তা কি এখনোও জানতে পেরেছি? হারিয়ে পাওয়া পেয়ে হারানো। চাওয়া-পাওয়া-দেওয়া এ সবই তো ব্যথা-বিজড়িত সুখ-দু:খ অশ্রুজল সিক্ত, স্মৃতির সুরভিতে সুরভিত। কখনও কোন দূর দূরান্ত থেকেও এরা ভেসে এসেছে। ভোলা ত যায় না, অথচ ধরেও কি রাখা যায়?'

জীবনাভিজ্ঞতাকে স্মৃতিরসে সিক্ত করতে গিয়ে সুফিয়া কামাল তাঁর বর্ণনাকে করে তুলেছেন অলংকারমণ্ডিত। কয়েকটি অলংকৃত বর্ণনা–

১. হঠাৎ শ্রাবণ রাতের শ্রাবণ ধারার মত একে একে অনন্তের ডাকে পরিণত অপরিণত বয়সে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেননি। (স. ক. র. স.-৫৫৯)

২. মাটিকে বাদ দিয়ে ফুলগাছের যেমন কোন অস্তিত্ব নেই আমার মাকে বাদ দিয়ে আমারও তেমন কোন কথা নেই। (স. ক. র. স.-৫৬০)

৩. নির্বাসিতা হাজেরার মত মহিয়সী আমার মা, আমাকে জড়িয়ে ধরে বাণবিদ্ধ কপোতীর মতো লুটিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। (স. ক. র. স. পৃষ্ঠা- ৫৬২)

৪. রাক্ষসী পদ্মার অন্য বাহু 'কালাবদর' সমস্তই গ্রাস করেছে। (স. ক. র. স. পৃষ্ঠা-৫৬৫)

৫. রাক্ষসী কালাবদরও এগিয়ে এলো তার লোল জিহ্বা বিস্তার করে। (স. ক. র. স. পৃষ্ঠা-৫৬৭)

৬. শূন্য বিরাট ভবনে পক্ষীমাতার পক্ষতলে রইলাম আমি একা। (স. ক. র. স. পৃষ্ঠা-৫৬৮)

৭. তখন আমার পরম সহিষ্ণু সর্বংসহা ধরিত্রীমাতার মতোই সবরদার মা সাবেরা খাতুন মৃত-প্রায় সন্তানের শিয়রে বসে বড় বোনকে সান্ত্বনা দিতেন। (স. ক. র. স. পৃষ্ঠা-৫৭০)

৮. থাকবে একটা স্মৃতিসৌধ তাঁর পায়রাবন্দ গ্রামে, সবাই দেখবে যে, ওখানে থেকে একটা পায়রাবন্দের বন্দিনী পায়রা উড়ে এসে সারা দুনিয়াতে এখন ওনার নাম। (স. ক. র. স. পৃষ্ঠা-৫৯০)

[২] ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *সুফিয়া কামাল*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১৪-৪১৫

৯. সে অবরোধ ঘুচিয়ে যাবার উপায় ছিল? বন্দিনী খাঁচার পাখীর শুধু পাখা ঝাপটানোই সার হয়েছে। (স. ক. র. স. পৃষ্ঠা-৫৯১)

১০. অকপট মলিন তাঁদের স্নেহ মমতার কথা আমার স্মৃতিতে অমূল্য রত্নের মতো উজ্জ্বল। (স. ক. র. স. পৃষ্ঠা-৫৯১)

গ্রন্থটির ভাষা সহজ, সরল ও আবেগস্পর্শী। অতীতের সুখ-স্বাছন্দ্য, হাসি-কান্না, বিরহ-বেদনা ও রোমাঞ্চকর বর্ণনায় এ ভাষা নদীর কল্লোলধ্বনির মতোই কখনও গম্ভীর, বিষাদে মৃদুময়, কখনো আনন্দ উচ্ছলতায় উদ্বেলিত।

একালে আমাদের কাল আত্মজীবনীগ্রন্থে সুফিয়া কামাল মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় অঙ্কন করেছেন তাঁর কালের কথা, বিশেষত তাঁর শৈশবের কথা। একটি খণ্ডিত সময়কালের হাসি-কান্না, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার বিশ্বস্ত রূপায়ণে এ স্মৃতিকথা হয়ে উঠেছে একটি বিশেষ সময়কালের বিশ্বস্ত দলিল। বাংলা স্মৃতিকথা-সাহিত্যে এটি একটি মূল্যবান সংযোজন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দিনপঞ্জিধর্মী রচনা

সুফিয়া কামালের দিনপঞ্জিধর্মী রচনা *একাত্তরের ডায়েরী*। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালে। প্রকাশ করেছেন মালেকা বেগম। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। ঢাকার 'জাগৃতি প্রকাশনী' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে। কবি গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন– 'একাত্তরের শহীদদের উদ্দেশ্যে'।

গ্রন্থটির ভূমিকায় কবি লিখেছেন, 'ভূমিকা নয়, রক্তে লেখা শোক'। 'রক্তে লেখা শোক' শিরোনামে কবি একাত্তরের দুঃসহ প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> একাত্তরের ডায়েরীর সক ক'টা পাতা ভরে তুলতে পারিনি, অনেক কথাই রয়ে গেছে অব্যক্ত। ডায়েরী পেয়েছিলাম ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে। ভেবেছিলাম '৭১- এই শুরু করবো।
> এর মধ্যে ঘটে গেল '৭০ এর ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস। যেতে হলো দক্ষিণ বঙ্গে রিলিফের কাজে। ডায়েরীটা হাতে নিয়ে গেলাম। নিঃস্ব মানুষের শোকে দুঃখে শরিক হয়ে ঢাকায় ফিরে কিছুদিন পরেই মানুষের সংগ্রামের মিছিলে অংশ নিলাম। ২৫ মার্চ শুরু হলো পাক সামরিক বাহিনীর মারণযজ্ঞ। অনেক কিছুই দেখলাম, শুনলাম বাসায় বসে বসে। সব কথা লেখা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা লেখা হয়নি যা বলা প্রয়োজন। তাই এ মুখবন্ধ।
> মুক্তিযুদ্ধে এদেশের কোটি কোটি কিশোর, যুবক, তরুণ-তরুণী যোগ দিয়েছিল। শহীদ হয়েছে ত্রিশ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা এবং সম্ভ্রম হারিয়েছে তিন লক্ষ নারী। তাদের উদ্দেশ্যেই আমার ডায়েরীটা উৎসর্গ করলাম।[১]

মুক্তিযুদ্ধকালে সুফিয়া কামালের দেশপ্রীতি, স্বাজাত্যবোধের প্রামাণ্য স্বাক্ষরবাহী গ্রন্থ *একাত্তরের ডায়েরী*। শত্রুনিধনে লিপ্ত দেশ-সন্তানদের মঙ্গল কামনায় তিনি জননীর মতোই মমতাময়ী, সাহসী, নির্ভীক ও অকুতোভয়। তাঁর এই ভূমিকা মূল্যায়নে শ্রদ্ধেয় আনিসুজ্জামানের মন্তব্য উল্লেখ্য :

> ভাষা আন্দোলনে আছেন তিনি, আছেন তিনি মুক্তিযুদ্ধে। দেশ ছাড়েননি– সকলে যখন তার নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন, তখন তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের রসদ জোগাচ্ছেন। এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের যারা হত্যা করেছেন, তাদের বিচার চেয়েছেন, বিচারের দাবিতে সবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ... জাতির প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন অভিভাবকের মতো। কর্তব্যবোধ থেকে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও সাধ্যের অতীত কাজ করেছেন। তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন সকলের প্রতি।[২]

---

[১] সুফিয়া কামাল, একাত্তরের ডায়েরী, তৃতীয় প্রকাশ, জাগৃতি প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ঢাকা, ২০০৭, পৃষ্ঠা-৬
[২] সৈয়দ শামসুল হক (সম্পা.), *জননী সাহসিকা : বেগম সুফিয়া কামাল :* শেষ প্রণতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮

সকলের প্রতি ভালোবাসার নির্ঝর-প্রস্রবণধারা নিহিত ছিলো তাঁর অন্তরে, বিশেষত, গুণী-সন্তানদের জীবনাশঙ্কায় তিনি সতত উদ্বিগ্ন, দেশমাতার সন্তানদের হারানোর বেদনায় যেমন দগ্ধ তেমনি সাহসিকা। তাঁর স্মৃতিচারণ :

> স্বাধীন বাংলা গড়ার জন্য যারা ছিল অমূল্য সম্পদ– সেই মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, শহীদুল্লাহ কায়সার, আলতাফ মাহমুদ, ডাঃ আলিম চৌধুরী, ডাঃ মোর্তুজা এ রকম আরো সোনার ছেলে মেয়েরা রাজাকার আলবদরের হাতে শহীদ হয়েছে। এদের কথা আমি কি করে ভুলি!
>
> মুনীরের কথা ভুলতে পারি না। প্রত্যেক সভা শেষে মুনীর আমার কাছে এসে দাঁড়ায়; 'চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি'– কণ্ঠ আর শুনিনা। ... ভুলবো কি করে গিয়াসউদ্দিনের কথা? মাথায় গামছা বেঁধে লুঙ্গি পরে গিয়াস প্রায়ই রাতে চুপিসারে পেছনের পথ দিয়ে দেয়াল টপকে আসতো রিক্সাওয়ালা সেজে। চাল নিয়ে যেত বস্তায় করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য।[১]

*একাত্তরের ডায়েরী*তে সুফিয়া কামাল ৩০ ডিসেম্বর ৭০ থেকে দিনলিপি লিখতে শুরু করেছেন এবং সমাপ্তি টেনেছেন ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ। ৭১-এর জানুয়ারি থেকে লেখা শুরু করার ইচ্ছে থাকলেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে রিলিফের কাজে যাওয়ার সময় ডায়েরিটা সাথে নেন এবং সেদিন অর্থাৎ ৩০ ডিসেম্বর ৭০ থেকেই দিনলিপি লেখা শুরুকরেন। ৭১-এর প্রতিটি দিনের ঘটনা তিনি ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করতে পারেননি। কেবল মার্চ এবং এপ্রিল মাসের প্রতিটি দিনের কর্মপ্রবাহ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। 'অনেক কথাই রয়ে গেছে অব্যক্ত'- গ্রন্থের ভূমিকাংশে এ অপারগতার কথা স্বীকার করেছেন তিনি। তাই এ দুটো মাস ব্যতীত অন্যান্য মাসের পূর্ণাঙ্গ রোজনামচা পাওয়া যায়নি।

ডায়েরির প্রথম পাতাটা তিনি লিখেছিলেন রাত ১১ টায় ভি. এম. জলকপোত-এ বসে। রিলিফের কাজে ৪৫ জন মহিলাসহ বরিশালগামী লঞ্চে রওয়ানা হন ধানখালির উদ্দেশে। যাত্রাপথেই চর বিশ্বাস ও চর সাগস্তিতে রিলিফদ্রব্য শেষ হয়ে যাওয়ায় ধানখালি সেদিন আর যাওয়া হয়নি। ১ জানুয়ারি ৭১-এ তিনি ধানখালি পৌঁছে রিলিফদ্রব্য বিতরণ করেন তিনি। সুফিয়া কামাল ২ হাজার মানুষকে তা বিতরণ করেন। দুর্গত মানুষজন তাঁর প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল এবং আনুগত্যে অবনত। সুফিয়া কামালকে উদ্দেশ্য করে তাঁদের উক্তি ছিল এরকম– 'সুফিয়া কামাল আসেনি; মা ফাতেমা এসেছে।' জনগণের ভালোবাসায় আপ্লুত মানবতাবাদী কবি তাঁর অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন এভাবে–

> কত মানুষ এসে দেখে গেল, দোয়া করে গেল আমাকে। দেশের মানুষ চেনে, ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে– এর চেয়ে গৌরবের আর কী আছে। (এ. ডা. ১০)

[১] সুফিয়া কামাল, একাত্তরের ডায়েরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬-৭

বরিশালবাসীকে রিলিফদ্রব্য বিতরণ করতে গিয়ে তিনি অন্তর্জ্বালা অনুভব করেছেন। কারণ তিনিও বরিশালের মানুষ। স্বভূমির-মানুষের দুদর্শার চিত্র অবলোকন করে তিনি আশাহত– "ধানের দেশ-গানের দেশ বরিশাল। তার মানুষ আজ মুষ্টি ভিক্ষা নিয়ে বাচ্চা কাচ্চার প্রাণ বাঁচাবার প্রয়াস পাচ্ছে।" আ-শৈশব বরিশালের জল-হাওয়ায় লালিত সুফিয়া কামাল গর্ববোধ করেন তার প্রিয় বরিশালকে নিয়ে। গ্রন্থের প্রথমেই তিনি তাঁর পরিচিতি নির্ণয় করেছেন বরিশালকে কেন্দ্র করে। পরিচিতিটি উল্লেখ্য :

> আমার পরিচয়
>
> 'আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল হল লাঠির ঘায়
>
> ওই যে মায়ের ভয়ে ভয় করে না, মায়ের নামে গান গেয়ে যায়।
>
> রক্ত বইছে শতধার
>
> নাইকো শক্তি চলিবার
>
> এরা মার খেয়ে কেউ মা ভোলে না
>
> সহে অত্যাচার।
>
> এত পড়ছে লাঠি ঝরছে রুধির
>
> তবু হাত তোলে না কারু গায়।'
>
> সেই বরিশাল, অশ্বিনী কুমারের বরিশাল, শায়েস্তাবাদের নওয়াবদের বরিশাল– সেই বংশের সেই বরিশালের মেয়ে আমি। জন্ম থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের আবহাওয়ায় মানুষ। ১৯১১তে জন্ম। আজ ১৯৭১-এ বেঁচে আছি, ঘরে বাইরে, অন্তরে, বাহিরে, দেহে মনে, সংসারে সমাজে, নানা সংগ্রামে বিক্ষত হয়েও। বাংলাদেশ স্বাধীন হোক। বাঁচুক মায়ের বাছারা। (এ. ডা. ৮)

একাত্তরের ডায়েরী রোজনামচায় বরিশালের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। লেখক সংঘের বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস' উপলক্ষে প্রধান অতিথির ভূমিকায় আমন্ত্রিত হয়ে কবি করাচি ভ্রমণে যান। জানুয়ারি ৩০ তারিখ হতে ফেব্রুয়ারির ৬ তারিখ পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানে অবস্থান করেন। ফেব্রুয়ারির ২ তারিখে কায়েদে আজমের মাজার দর্শনে যান তিনি। সেখানে চীনের উপহৃত ঝাড়বাতি দর্শনে কবির মনে জাগ্রত হয় শৈশবস্মৃতি। এরূপ বিরাট ঝাড়বাতি তিনি দেখেছেন শায়েস্তবাদে জমিদার নানা বাড়িতে। তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে–

> মিসেস তাহের জামিল চায়ের দাওয়াত দিয়েছিলেন নাজিমাবাদ কলোনীতে। সেখান থেকে ফিরবার পথে কায়েদে আযমের মাজারে দেখে এলাম চীনের উপহার বাতির ঝাড়। বিরাট বটে। কিন্তু ওর চেয়ে কত সুন্দর আমাদের শায়েস্তাবাদের মসজিদে ছিল। সব গেছে। (*এ. ডা.* ১৪)

পাকিস্তানে অবস্থানকালে কবি রেডিওতে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। বেডিওতে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটির উর্দু তরজমা প্রচার করা হয়।

অকুতোভয় সাহসী বাঙালি ব্যক্তিত্বের উল্লেখ রয়েছে তাঁর রচিত দিনলিপিতে। ফেব্রুয়ারি ২৭, ১৯৭১ শনিবারের দিনলিপিতে বরেণ্য ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন–

> বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন উপলক্ষে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সাহেবের দাওয়াতে আজ সন্তোষ হয়ে এলাম। ... অর্ধসমাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় তার উদ্বোধন! ড. কাজী মোতাহার হোসেন মূল সভাপতি, প্রধান অতিথি হাশেম সাহেব সস্ত্রীক একদিন আগেই গিয়েছিলেন। জনসমাবেশ প্রচুর। ... অদ্ভুত মাওলানার প্রাণশক্তি। সন্তোষের ইতিহাস বর্ণনা করা হল ১ ঘন্টা, তারপরও আধ ঘন্টা ধরে তার ভাষণ। অক্লান্ত কর্মী হিসাবে এই লোকটাকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। মুগ্ধের মতো লোকেরা তার ভাষণ শুনল। স্মৃতিশক্তিও প্রখর। কবে কখন কোন তারিখে কোথায় কি কাজ করেছেন তা অনর্গল বলে গেলেন। পায়ে হেঁটে সারা বাংলাদেশ বেড়িয়েছেন, চাষীদের দুঃখদুর্দশা উপলব্ধি করেছেন। এখনও প্রচুর কৃষক তার মুরিদান, তারাই এত লোক খাওয়ার জন্য চাল ডাল মাছ তরকারী যোগাল, রাঁধল, খাওয়াল। এ এক বিরাট ব্যাপার। (*এ. ডা.* ১৬)

একাত্তরের ডায়েরী গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম আভাস প্রতিফলিত হয়েছে মার্চ ১, ১৯৭১ সোমবার; রাত ১০টার দিনলিপিতে। দিনলিপিটি উল্লেখ্য :

> বিক্ষুব্ধ বাংলা। ভুট্টো সাহেব পরিষদে যোগ দিবে না সিদ্ধান্তে পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী রইল। ১২ টায় এ খবর প্রচারিত হওয়ায় স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল। অনার্স পরীক্ষা ২ তারিখ আর ৬ তারিখে শেষ হওয়ার আশাও গেল। আজ ইন্টারমিডিয়েট কলেজে মেয়েরা শহীদ মিনার উদ্বোধন করার জন্য আমাকে নিয়ে গেল, কিন্তু গোলমালে সব বন্ধ হয়ে গেল। শেখ মুজিবুর রহমান, মাওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান আরও অনেক নেতাদের এক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কাল ঢাকায় হরতাল, পরশু সারা দেশব্যাপী হরতাল ঘোষণা করা হয়। (*এ. ডা.* ১৪)

উত্তাল মার্চের সকল ঘটনাই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে গ্রন্থটিতে। পুরো মাস জুড়েই ঘটেছে পাকিস্তানিদের স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ড। ট্রেন চলাচল বন্ধ, বিদ্যুৎ-পানির লাইন বিচ্ছিন্ন, বিহারিদের ঔদ্ধত্যে বাঙালিদের বিড়ম্বনা, জ্বালানো-পোড়ানোর মতো নারকীয় বীভৎসতার বর্ণনা দিনলিপিতে স্থান পেয়েছে। এর প্রতিবাদে সোচ্চার দেশনেতারা। ৩ মার্চ ৭১-এর ভাষণে মুজিবের নির্দেশকে সমর্থন করে তিনি লিখেছেন–

> বিকালে পল্টনে ছাত্রদের শোক সভায় লক্ষ লোকের সমাবেশে শেখ মুজিব নিজের আদেশ প্রচার করেছেন। সমস্ত অফিস কারখানা বন্ধ করে দিতে ব্রিগেডিয়ারকে বলেছেন। সে দেশ রক্ষার জন্য বেতন নিচ্ছে, এখানে জনতার উপর গুলী না চালিয়ে বর্ডারে গিয়ে দেশ রক্ষার কাজ করুক। সাবাশ! এইত চাই! জনতা উন্মাদ হয়ে স্বাধীন পূর্ব বাঙলা করছে। ৭ তারিখ পর্যন্ত হরতাল (*এ. ডা.* ১৭)

৭ মার্চ ১৯৭২ রবিবার : রাত ৯ টার দিনলিপিতে শেখ মুজিবের স্মরণীয় বক্তৃতা, যা নতুন একটি দেশকে নির্মাণের সূচনা-ভিত্তি ছিল, তার বর্ণনা যথাযথভাবে এসেছে। ৯ মার্চ ৭১-এ মাওলানা ভাসানীর বক্তৃতায় অখণ্ড পাকিস্তানের বিভাজন, সংবিধান আলাদা এবং রাষ্ট্রদূত দুজন দুদেশে অবস্থান করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি।

মার্চের ভয়াবহ পরিস্থিতির মাঝেও কবি ছিলেন কর্মব্যস্ত। উদ্বোধন করেছেন মহিলা পরিষদের সংগ্রাম কমিটির নতুন কয়েকটি শাখা। জিগাতলা, রায়ের বাজার, পলাশী ব্যারাক স্কুলে শাখা উদ্বোধন করার পর পরিষদের মহিলারা মিছিল করে শেখ মুজিবের বাড়ি এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

দিনলিপিতে শেখ মুজিবুরের জন্যে উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হয়েছে বারবার। কবি এই মহান নেতার মঙ্গল কামনায় প্রার্থনারত। মুজিব সম্পর্কে তাঁর অভিব্যক্তি লক্ষণীয় :

১. (মার্চ ৮, ১৯৭১ সোমবার) আল্লাহ মুজিবুর রহমানকে সুস্থ ও দীর্ঘায়ু করুন, এই প্রার্থনা। (*এ. ডা.* ৮)

২. (মার্চ ১৭, ১৯৭১ বুধবার) মুজিব বন্দী জনগণের মতামতে, ইয়াহিয়া বন্দী সেনাবাহিনীর হাতে। আজ মুজিবের ৫২ বৎসরের জন্মদিন। আল্লাহ হায়াত দেন। জয়ী হোক বাংলাদেশের ছেলে। (*এ. ডা.* ২০)

৩. (এপ্রিল ১২, ১৯৭১ সোমবার, রাত ৯টা) আজ অবজারভারে বন্দী দেশনেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি দেখা গেল। হোক বন্দী, তবু যেন বেঁচে থাকে। মেঘ কেটে যাচ্ছে, আবার সূর্য উঠবে। আল্লাহ যেন তাঁর দীর্ঘ পরমায়ু দেন। (*এ. ডা.* ২৮)

৪. (আগস্ট ১০, ১৯৭১ মঙ্গলবার, রাত ৯টা) আজ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার সভা বসেছে কি প্রহসন। কার বিচার কে করে। (*এ. ডা.* ৫১)

৫. (আগস্ট ২১, ১৯৭১ শনিবার, রাত ৯টা) ... আমার সন্তান আমার দেশ, দেশের মাটি, মাটির মানুষেরা সামরিক নির্যাতন বন্যা, মহামারীতে আর কত মরবে? আল্লাহ তাদের ভালো কর। রহম কর। মুজিবের হায়াত দাও। বাংলাদেশের ভালো কর। (*এ. ডা.* ২৪)

দেশ-সন্তানদের মঙ্গলকামনায় সুফিয়া কামাল নিজ জীবনকে উৎসর্গ করতেও দ্বিধা করেননি। রোজনামচায় সে আর্তি ধ্বনিত হয়েছে, প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মাতৃরূপ; জননী সাহসিকা :

ক. (মার্চ ৩০ মঙ্গলবার : রাত ১০টা) মন অস্থির। নামায পড়ি, কোরান পড়ি, মন-অস্থির। সমস্ত দেশ জ্বলে পুড়ে মরে নিঃশেষ হয়ে যাবে। এ যে কোন জালেমের জুলুম বুঝতে পারি না, আতঙ্কে আশঙ্কায় মানুষের রাতদিন কাটছে। আমার ভয় নেই, ভাবনা কেবল এদের জন্য, নিজের মৃত্যু ত কাম্য। (*এ. ডা.* ২৪)

খ. (এপ্রিল ২৩, ১৯৭১ শুক্রবার : রাত ১০টা) গতরাতে নাকি ইন্ডিয়া রেডিওতে আমার মৃত্যু সংবাদ দিয়েছে। আমরা শুনিনি, কিন্তু আজ ভোর ছটা থেকে যত লোক পেরেছে ফোন করেছে, এসেছে, খবর নিয়েছে। আহা যদি আমার প্রাণের বিনিময়ে একটিও প্রাণ বাঁচত, কত সার্থক এ-জীবন হত। আমি ত বাঁচতে চাই না কিন্তু নিঠুর, কঠোর আমাকে যে বাঁচিয়েই রেখেছে, আরও কি লীলার জন্য কে জানে! (*এ. ডা.* ৩১)

গ. (এপ্রিল ২৯, ১৯৭১ বৃহস্প্রতিবার : রাত ১১ টা) নিত্য দুঃখের পুনরাবৃত্তি যা লিখতে ভালো লাগেনা। আমার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদে এত লোক অস্থির। আহা! যদি আমার মৃত্যু দিয়েও কিছুমাত্র ভালো হত এ দেশের কি তৃপ্তি ছিল তার জন্য। কিন্তু আমার মরণ নেই। আরও কি কি যে দেখব জানি না। এত অত্যাচার, এত হিংসা, এত হত্যা, তবুও আমার মন আশা করছে মঙ্গলের, কল্যাণের। (*এ. ডা.* ৩২-৩৩)

ঘ. (মে ৪, ১৯৭১ মঙ্গলবার : রাত ১০টা) আমার বাঁচার খবরে ভারত থেকে আমেরিকা পর্যন্ত এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে। বেঁচে আছি কিন্তু কি দরকার ছিল আমার এ থাকার। কত গুণী, জ্ঞানী, সাধু, সংসারী, কবি, শিল্পী, গায়ক আজ হত প্রাণে, গৃহহীন। আমার মৃত্যু দিয়ে যদি কিছুও বাঁচত, এ জীবন সার্থক হত। (*এ. ডা.* ৩৪)

ঙ. (মে ১৩, ১৯৭১ বৃহস্প্রতিবার : রাত ৯টা) আজ ঘরে ঘরে আমার মতো অনেক বুক খালি করা মায়েরা আছে। আমার চোখের পানি ও কবেই শুকিয়ে গেছে ওদেরও চোখ বুক আজ শুকনো। সব মায়েদের বুকের ধনের বিনিময়েও কি আল্লাহ বাংলার সব অবশিষ্ট সন্তানদের জয়লাভ করতে দিবেন না। নিশ্চয়ই দিবেন। (*এ. ডা.* ৩৬)

চ. (জুলাই ৩১, ১৯৭১ শনিবার : রাত ১১টা)

কে আছে সৌভাগ্যবতী আমার মতন

এক পুত্রহীনা হয়ে শত পুত্র ধনে

লভেছি, সৌভাগ্য মোর। শতেক দুহিতা

সারা বাংলাদেশ হতে ডাকে মোরে মাতা

জননী আমার। ...

আমার বাছার রক্তের সাথে কত সে মায়ের বাছা

বাঁচিয়া বাঁচার বিপুল ভুবনে মোর সব সন্তানে

বক্ষ বহ্নির হাসির পুষ্পে ফুটাইব সযতনে

শতেক জনার মা ডাকায় মোর শান্তি লভুক মন

কে আছে সৌভাগ্যবতী আমার মতন! (*এ. ডা.* ৪৯)

সুফিয়া কামাল তাঁর দুই সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে উৎসর্গ করেছেন। সুলতানা কামাল (লুলু) এবং সাঈদা কামাল (টুলু) দেশের জন্য যেমন, ঠিক তেমনি দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করেন।

প্রায় ছয় মাস যাবৎ কবি তাঁর কন্যাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এসময় কন্যাদের সঙ্গে সকল সন্তানদের জন্য উৎকণ্ঠায় দিনাতিপাত করতেন তিনি। দিনলিপিতে কন্যাদের কথা স্মরণ করেছেন বারবার :

> ডিসেম্বর ১৫, ১৯৭১ বুধবার আজ ৬ মাস হল' আমার পাখীরা আমার কোলছাড়া। আল্লাহ নেগাহবানী করছেন। সর্ব দুঃখের দাহন নিয়ে আজও আল্লাহর কাছেই আবার মাথা নোয়াই। ফিরে আসুক বাংলার বুকে শান্তি। আসুক ফিরে মুজিব। আসুক যার যার বুকের ধনেরা আজও বেচেঁ আছে তারা মায়ের কোলে। আমার বাছারাও যেন ফিরে আসে। (*এ. ডা.* ৬৬-৬৭)

'জননী সাহসিকা' সুফিয়া কামাল দেশপ্রেমের উদ্দীপনা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে উৎসর্গ করেছেন তাঁর কন্যাদের। ভীরুমাতার ন্যায় সন্তানকে বুকে আগলে রাখেননি। এই সাহসী মাতার কর্মকে মূল্যায়ন করেছেন সুলতানা কামাল। তিনি তাঁর মায়ের স্বরূপকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন এভাবে :

> তার ঘৃণা তীব্রভাবে ধাবিত হয় যুদ্ধাপরাধীদের স্বাধীনতার শত্রুদের আর স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠীর প্রতি। '৭১ এ একটুও তার দ্বিধা হয়নি পাকিস্তানি সেনাদের সরাসরি বলে দিতে যে, বাংলাদেশে গণহত্যা হয়নি সে রকম কোনও বিবৃতিতে তিনি স্বাক্ষর করবেন না। এই যে, দৃঢ়তায় ঋজুতায় অসত্য অন্যায়কে ঘৃণা করা আবার কোমলতা ও মমত্বে, সত্য, সুন্দর, স্বাধীনতাকে ভালোবাসা, সবার মুক্তির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাওয়া–এর পূর্ণ চিত্র ধরা সম্ভব নয় এই অল্পপরিসরে। এ থেকেই আমাদের অনেকের পথ চলা–যারা তার মনের মধ্যে ইচ্ছে হয়ে লুকিয়ে ছিলাম তার অটল অধ্যবসায় আর বিরামহীন কর্মের প্রতিজ্ঞায়।[১]

সুফিয়া কামাল তাঁর পর্যবেক্ষণশীল দৃষ্টিসহযোগে অবলোকন করেছেন যুদ্ধের ভয়াবহতা, পাকিস্তানিদের নির্মম বৈরিতা। *একাত্তরের ডায়েরী*, গ্রন্থটির প্রতিটি খাতায় প্রতিফলিত হয়েছে যুদ্ধকালীন বীভৎসতা, জ্বালাও-পোড়াও-দমননীতির রূঢ়তা। পাকিস্তানিরা দেশের সর্বত্র বোমাবাজি, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যাসহ নানাবিধ অপকর্মে লিপ্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়িও এই নৃশংসতা থেকে মুক্ত নয়। মুসলমানদের পবিত্র জায়গা শাহজালালের দরগাও এ ধ্বংসলীলা থেকে রেহাই পায়নি। ঘৃণ্য এ-শত্রুদের বিরুদ্ধে সুফিয়া কামাল নিন্দাবাদ করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে পাকিস্তানি নির্মমতার সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগও যেন এ দেশবাসীর ওপর সমানতালে হামলা চালাচ্ছে। প্রবল শিলাবৃষ্টিতে আমের গুটি ঝরে গেছে। রেডিও বন্ধ। কখনো প্রচণ্ড গরম অসহনীয় করে তুলেছে জীবনযাত্রা। কেরোসিন, সরষের তেল, চিনি দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যে পরিণত হওয়ায় জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়েছে। জীবন হয়েছে দুর্বিষহ। শত্রু পক্ষের প্রতি তাঁর বিষোদগার উচ্চারিত হয়েছে এরকম কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করা হলো :

---

[১] সুলতানা কামাল, আমার সকল কর্মে সকল যজ্ঞে আলোর মত মিশে আছেন আমার মা, উদ্ধৃত, সৈয়দ শামসুল হক, *জননী সাহসিকা বেগম সুফিয়া কামাল : শেষ প্রণতি*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৪-৬৫

ক. (মার্চ ২৭, ১৯৭১ শনিবার : রাত ১০টা) সন্ধা ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত রায়ের বাজারে মিলিটারী ধ্বংসলীলা চলছে। সমস্ত ঢাকা সামরিক শাসনে সন্ত্রস্ত। হাট বাজার নেই। বৃষ্টি নেই, সব পুড়ে যাচ্ছে। অভাবী, সহায়হীন দুঃস্থ মানুষের জীবন। এদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চলছে, তার জওয়াব আল্লাহর কাছে কারা দেবে ? কি দেবে? (*এ. ডা.* ২৩)

খ. (মার্চ ২৮, ১৯৭১ রবিবার) সারা ঢাকা–সারা দেশ আতঙ্কিত। এই যদি পাকিস্তান বান্দাদের ভাগ্যে আছে, তবে কেন পাকিস্তান হয়েছিল? বিজাতির দমনে অতীষ্ঠ হয়ে মুসলমানরা সর্বহারা হয়ে পাকিস্তান এনেছিল। আজ পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতিই পাকিস্তান বাসীদের বুকে গুলি চালাচ্ছে; অসহায়, নিরস্ত্র, নির্বোধ মানুষের বুকে। (*এ. ডা.* ২৪)

গ. (এপ্রিল ৫, ১৯৭১ সোমবার : রাত ৮টা) রেডিও পাকিস্তান থেকে শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা চলছে বলে ঘোষিত হচ্ছে। কত মায়ের বুক খালি করে সোনার সংসারকে ধ্বংস করে চলছে এখনও, আর শান্তির কথা বলছে! নির্লজ্জ! এদের আত্মসম্মানও নেই। (*এ. ডা.* ২৬)

ঘ. (এপ্রিল ১৭, ১৯৭১ শনিবার : রাত ১০) ... বড় দুঃখ বড় শোকের ব্যাপার, মেহেরুন নেসা, তার মা, দুই ভাইকে হত্যা করা হয়েছে। আল্লাহ যেন এই নিষ্পাপ অসহায়দের রক্তের বিনিময়েই বাংলাদেশকে স্বাধীন করেন। আর কত রক্ত কত প্রাণ দিতে হবে। বাংলার লাখ লাখ মানুষ কাদের হাতে কোন মোনাফেকের হাতে মরছে। আল্লাহ কি দেখছে না। (*এ. ডা.* ২৯)

ঙ. (মে ১২, ১৯৭১ বুধবার : রাত ৯টা) আজ মীরপুরের অদূরে আমিননগরে গোলা চালিয়ে বহু লোক মেরে ধান ক্ষেত পুড়িয়ে দিয়ে জালিমরা আরও গ্রামে গ্রামে হানা দিয়েছে। কাকে মারছে ওরা? নিজেরা এক অক্ষর কলেমা দরুদ জানে না। মদে মাৎসর্য্যে বিভোর। তারা আবার বাঙালীদের কাফের বলে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে। (*এ. ডা.* ৩৬)

ছ. (মে ২২, ১৯৭১ শনিবার : রাত ১০টা) আজ সারাদিন ঢাকার আকাশে প্লেন উড়ল না। গত ২ দিন ধরে ভীষণভাবে চেকিং হল, কলেমা পড়িয়ে এমন কি উলঙ্গ করে মুসলমান কি না পরীক্ষা করা হয়েছে। গতকাল অনেক রাত অবধি মিলিটারী গাড়ী চলেছে, আজ সবই অস্বাভাবিক স্তব্ধ। শয়তান কোন জাল বুনছে, কে জানে! দিন দিন অত্যাচারও সীমাহীন। (*এ. ডা.* ৩৮)

পাশবিক নিষ্ঠুরতার সীমাহীন ক্রূরতায় বলী হয়েছে দেশের অগণন বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক। সুফিয়া কামাল সাহস জুগিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধাদের, সমর্থন করেছেন শত্রুনিপাতকারীদের। তিনি হারিয়েছেন স্বজন, প্রতিবেশী, সন্তানপ্রতিম দেশপ্রেমিকদের, কন্যা-জামাতা কাহ্হারকে হারিয়ে কবির শোক তাই হয়ে উঠেছে অপ্রতিরোধ্য। শত্রু নিধন-কামনায় তিনি তাই সতত সোচ্চার। তবুও তার 'শ্রেষ্ঠধন' কে হারাবার শোকার্তি ধক্ষনিত হয়েছে দিনলিপিতে :

(নভেম্বর ১৭, ১৯৭১ বুধবার) আজ সকাল ৮টায় হারালাম আমার শ্রেষ্ঠধনকে। আমার বাপ, আমার দুলুর জীবনের সাথী, আমার আদরের গৌরবের ধন জামাই কাহ্হার চাটগাঁয় রেডিও অফিসে যাবার পথে গুলী খেয়ে আজ চিরতরে ছেড়ে গেল তার দুলুকে, তার সন্তানদের, তার মা বোনকে, আমাকে। আজ ৫টা থেকে ঢাকায় কারফিউ। কোনো মতেও একটা টিকেট পেলাম না। আমার বাবার মুখখানি শেষ দেখা দেখতে চাটগাঁ যাবার জন্য। ফোন। শুধু ফোনে ফোনে খবর পেলাম সব শেষ। বেলা

> ২টায় শাহ গরিবুল্লার মাজারে আমার বাবা শুয়ে থাকল গিয়ে। আলাহ! তুমি আছ ত? কি করলে? কি চেয়েছিলাম তোমার কাছে? এই তোমার বিচার? এই তোমার দান? (*এ. ডা.* ৬৪-৬৫)

বুদ্ধিজীবী হত্যার ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন সুফিয়া কামাল। মুক্তিযুদ্ধের শেষপর্যায়ে পাকিস্তানি অপশক্তি পরাজয়ের ঘৃণ্য- রোষে বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার কুচক্রান্তে লিপ্ত হয়; নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যত হয়। দেশমাতৃকার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যার উদ্দেশে ধরপাকড় শুরু করে তারা। এ অস্থির সময়কে তিনি ধারণ করেছেন এভাবে –

> (ডিসেম্বর ১৮, ১৯৭১ শনিবার) ভয়ানক বীভৎস শত্রুরা বাংলাদেশকে শোকাকুল, শোকাতুর, আতঙ্কিত, শঙ্কিত করে বদর বাহিনী হাজার লোককে এখন হত্যা করে চলেছে। মুনীর চৌধুরী, রফিক, গিয়াস, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডাঃ রাব্বি, ডাঃ আজাদসহ আরো অনেক মহিলাসহ ২৪০ জনের দেহ এখন পাওয়া গেছে। গত ১ সপ্তাহ ধরে কারফিউ দিয়ে দিয়ে জালেম হারামজাদারা এই কাণ্ড করেছে। আল্লাহ তুমি কি এখনও কিছু করবে না? শেষ হবে না তোমার রক্ত পিপাসার? শহীদুল্লাহ কায়সার, সিরাজউদ্দীন হোসেনও নাকি নেই। একি শুনছি দেখছি ? (*এ. ডা.* ৬৭)

মেধাবী সন্তানদের হারানোর ক্ষতিপূরণ অসম্ভব, সে উপলব্ধিতে স্নাত হয়ে তাঁর মনঃকষ্ট তিনি মুদ্রিত করেছেন ডায়েরির পাতায় :

> (ডিসেম্বর ২৩, ১৯৭১ বৃহস্প্রতিবার) ১৯৬৯ সনের পর আজ আবার এই টেলিভিশন অফিসে গেলাম। কি বললাম, মনে নেই। বুক মাথা যেন খালি– শূন্য বাংলার সুসন্তান শিক্ষিত, অভিজ্ঞ ওরা আজ নেই। আমি ওদের মতো করে কি আজকাল কথা বলতে পারি। ওরা থাকলে কি আনন্দে, হর্ষে পরিপূর্ণতায় এ দিনটি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। আল্লাহ! কেন কেড়ে নিলে ? (*এ. ডা.* ৬৮)

যুদ্ধের বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে অস্থির-উৎকণ্ঠায় দিনাতিপাত করেছেন কবি, সে উৎকণ্ঠা স্বপ্নেও ফিরে ফিরে এসেছে। *একাত্তরের ডায়েরী* গ্রন্থটিতে স্বপ্ন-প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত, কবির কন্যাদ্বয়ের জন্য উৎকণ্ঠার ভাবনাগুলো স্বপ্নে ঠাঁই পেয়েছে। কেবল কন্যা নয়, তাঁর স্বপ্নে আবির্ভূত বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ। যেমন : অক্টোবর ৩১, ১৯৭১-এর দিনলিপিতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে স্বপ্নে দেখার বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। এবং বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে মহানবীকে স্বপ্ন দেখার বিষয়টিও স্মরণ করেছেন।

একাত্তরের ডায়েরী মূলত একজন দেশপ্রেমিকের দেশপ্রেমের স্মারকগ্রন্থ। নির্ভেজাল স্বাজাত্যবোধ ও দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ তার দিনলিপিতে স্পষ্ট। কালাতীত মহিমায় উত্তীর্ণ তাঁর স্বদেশ-প্রেমমূলক উক্তিগুলো নিম্নরূপ :

ক. (জুন ২৭, ১৯৭১ রবিবার : রাত ১০টা) এখন আমি এ দেশ ছেড়ে বেহেশতেও যেতে রাজী নই। আমার দেশ আমার দেশের মানুষেরা শান্তি পাক, সোয়াস্তি লাভ করুক – এ দেখে যেন আমি এই মাটিতেই শুয়ে থাকতে পারি। (*এ. ডা.* ৪২)

খ. (জুলাই ২, ১৯৭১ শুক্রবার : রাত ১১টা) ওগো নিষ্ঠুর দরদী। আর কত দুঃখ দিবে। ঘুচাও তোমার রুদ্র রূপ। দেশকে, তোমার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে বাঁচাও। রহম কর রহমান। তোমার নামের সার্থকতা বজায় রাখ। আবার সানন্দা হই। (*এ. ডা.* ৪৩)

গ. (জুলাই ১০, ১৯৭১ শনিবার : রাত পৌনে ৯টা) দেশের মানুষই যদি না রইল, তবে কাকে নিয়ে দেশ। (*এ. ডা.* ৪৫)

ঘ. (আগস্ট ২১, ১৯৭১ শনিবার : রাত ৯টা) আমার সন্তান, আমার দেশ, দেশের মাটি, মাটির মানুষেরা সামরিক নির্যাতন, বন্যা, মহামারীতে আর কত মরবে? আল্লাহ ভাল কর। (*এ. ডা.* ৫৩)

ঙ. (সেপ্টেম্বর ৪, ১৯৭১ শনিবার : রাত ১১টা) অতীব সত্য, মুক্তি আসবে একদিন তোমার রহমতে। আপনজনেরা এত অত্যাচার সহ্য করছে। দেশের সোনার ছেলেমেয়েরা আজ কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওদের মুক্তিযুদ্ধে সাহস বুদ্ধি দাও। (*এ. ডা.* ৫৫)

চ. (ডিসেম্বর ৬, ১৯৭১ সোমবার) আমার যাদুধনদের বুকের রক্তে রাঙা এ মাটি। বড় পবিত্র। (*এ. ডা.* ৬৫)

দৃঢ়চেতা মানসিকতার অধিকারী সুফিয়া কামাল নতি স্বীকার করেননি অপশক্তির কাছে। পাকিস্তানিদের পক্ষ হয়ে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত হবার জন্য হাত মেলাননি। যুদ্ধকালে আইয়ুবের স্বৈরাচারী শাসনের পক্ষে মিথ্যে প্রচারণা রেডিওসহ সকল প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত হলেও দেশবাসী তা বিশ্বাস করেনি। কেননা, বাঙালির সঙ্গে বিশ্ববাসী বিবিসি, ভোয়া, ইন্ডিয়ান রেডিও থেকে সত্য ঘটনা জানতে পেরেছে। এ পর্যায়ে কিছু বিপথগামী মানুষ পাকিস্তানিদের পক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজ শুরু করে। এদের একজন সুফিয়া কামালকে মোটা অঙ্কের ঘুষ দিয়েও স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে পারেননি। *একাত্তরের ডায়েরীর* দিনলিপিতে কবি সে ন্যাক্কারজনক ঘটনার কথা লিখে রেখেছেন। তাঁর লেখনিতে যা প্রকাশরূপ পেয়েছে তা নিম্নে উল্লেখিত হলো:

(মে ২৩, ১৯৭১ রবিবার) আজ সকালে রেডিও থেকে সৈয়দ জিল্লুর রহমান, হেমায়েত ও অন্য একটি লোক এসেছিল। গত সপ্তাহে ঢাকার যে ৫৫ জন শিল্পী সাহিত্যিক দেশের নিরাপত্তা রক্ষার ও মৃত্যুর মিথ্যা প্রচারের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন তাদের সাথে নাম স্বাক্ষর করতে এসেছিল ওরা। দেইনি আল্লাহ ভরসা। (*এ. ডা.* ৩৮)

ক. ডিসেম্বর ১৪, ১৯৭১ মঙ্গলবার) আশা করছি রাত যত গভীর হচ্ছে ভোরের আলো ততই এগিয়ে আসছে। জয় হোক সর্বহারাদের। যুদ্ধ বিরতি আলোচনা শুরুহয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের পর শত্রু পক্ষের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছে। ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ। মায়ের দুধ খেয়েছিল। ও সুকন্যা। আজ আশায় গৌরবে বুক ভরে উঠেছে, সব হারিয়েও

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অনেক বড়। আল্লাহ যেন এ আশায় বাধ না সাধেন। ওগো অকরুণ দাতা। অনেক দিয়েছ, অনেক নিয়েছ। বাংলাদেশের আজাদী দাও এবার। (*এ. ডা.* ৬৬)

খ. (ডিসেম্বর ১৫, ১৯৭১ বুধবার) জোর দিয়ে ভারত যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিচ্ছে। সন্ধ্যা ৫টা থেকে আগামীকাল সকাল ৯টা পর্যন্ত সময় নির্ধারিত হয়েছে। সোভিয়েত থেকে জোর হুমকি চলছে, আল্লাহ যেন এবার রহমত করেন। (*এ. ডা.* ৬৭)

মুক্ত বাংলার বুকে কবির কর্মময় দিনগুলো গ্রন্থের শেষে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২৬, ১৯৭১-এ তিনি দিল্লীর সাংবাদিক ভট্টাচার্যকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন। ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ আকাশবাণীর প্রতিনিধি দ্বীপেশ ভৌমিক ও যুগান্তরের সহ সম্পাদক এসে কবির সাথে দেখা করেন। শ্রীমতী গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে কবির কবিতার প্রতিলিপি ইন্ডিয়ান বেতারে প্রচার করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

২৯ ডিসেম্বরের দিনলিপিতে কবি কবিতাটি রচনা করেছেন। এই দিনের বিশেষ ঘটনা উল্লেখিত হয়নি। ডিসেম্বর ৩১-এর দিনলিপির মধ্য দিয়েই গ্রন্থটির সমাপ্তি টানা হয়েছে। এ দিনলিপিতে কবি বছর-শেষের বেদনায় আপ্লুত হয়েছেন –

বছর আজ শেষ, কি যে যন্ত্রণা বুকের মধ্যে। ৩টায় বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টির সভায় ২১ নং পুরানা পল্টনে গেলাম। মনি সিং ও অন্যান্য কমরেডের সাথে দেখা হল। আমাকেও কিছু বলতে হল, বললাম কি বললাম জানি না। ১৯৭১ শেষ হয়ে গেল, জানি না। আগামী কালের দিন কিভাবে শুরু হবে। (*এ. ডা.* ৭০)

একাত্তরের ডায়েরী পাঠকালে পাঠক যেন স্বচক্ষে মুক্তিযুদ্ধকেই অবলোকন করবেন। প্রতিটি দিনের সংঘটিত ঘটনার ভয়াবহতা, নির্মমতা, নৃশংসতায় পাঠক একীভূত হয়ে পড়বেন। সুফিয়া কামালের এ গ্রন্থ নতুন প্রজন্মের নিকট প্রত্যক্ষ একটি মুক্তিযুদ্ধ।

একাত্তরের ডায়েরী গ্রন্থটিতে যুদ্ধকালীন ঘটনাপুঞ্জ বর্ণনার মাধ্যমে কবির গতিশীল ভাষা, উপমা-অলংকার প্রয়োগ লক্ষণীয়। কয়েকটি দিনের দিনলিপিতে কবি গদ্যভাষার পরিবর্তে কবিতার চরণ রচনা করেছেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা উন্মোচনে তিনি ব্যবহার করেছেন রুক্ষ শব্দ, তীক্ষ্ণ উপমা। মূলত, পরিবেশ-প্রতিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তিনি নির্মাণ করেছেন প্রয়োজনানুগ উপমা-অলংকার :

কান্না যে হায় পান্না হয়ে বাজে গানের মতো। (*এ. ডা.* ১৪)

গ্রন্থটিতে পাকিস্তানিদের স্বৈরাচারী আচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দসমূহ প্রয়োগ করেছেন সুফিয়া কামাল। পৈশাচিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকায় এদের ক্ষেত্রে কবির ব্যবহৃত শব্দসমূহ যেমন– জালেম, নির্লজ্জ, মোনাফেক, পিশাচ দল, মীরজাফরের দল, পশু, দানব, অসুর, মূঢ়, মূর্খ,

ঘৃণিত পশু, দস্যু বর্বর, অধম, দানব প্রভৃতির যথাযথ প্রয়োগ সার্থকতা পেয়েছে। এদের অত্যাচারের সীমাকে 'কুফরি জুলমাত' (পৃষ্ঠা-৪১) হিসেবে বর্ণনা করেছেন কবি।

একাত্তরের ডায়েরী একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। একটি বিশেষ সময়কে উপজীব্য করে রচিত রচনাটিতে কবির আত্মোপলব্ধি, হৃদয়ভার একজন মুক্তিকামী মানুষের প্রতীক হিসেবে প্রতিবিম্বিত। চলিত গদ্য- ভাষার দৃঢ়তা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, দেশপ্রেম, স্বাজাত্যবোধ, সমাজ ও স্বদেশ সচেতনতা এসবের সম্মিলিত সমবায়ে *একাত্তরের ডায়েরী* হয়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শিশুতোষ রচনা

ইতল বিতল

সুফিয়া কামালের শিশুতোষ গ্রন্থ দুটি : *ইতল বিতল* এবং *নওল কিশোরের দরবারে*। সুফিয়া কামাল রচিত গ্রন্থের ক্রমানুসারে *ইতল বিতলের অবস্থান* ৬ষ্ঠ, এবং *নওল কিশোরের দরবারে-এর* অবস্থান ত্রয়োদশ। *ইতল বিতল* ছড়াগ্রন্থটির নামকরণ সুফিয়া কামাল করেছিলেন *সোনা নয় রূপা নয়*। পরবর্তীকালে স্বামী কামালউদ্দীন খানের সঙ্গে পরামর্শক্রমে এর নাম হয় *ইতল বিতল*। ছড়াগুলোর নামকরণ হয়েছে প্রথম পঙ্‌ক্তিকে শিরোনাম করে। গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ছড়ার সংখ্যা চব্বিশটি। শিশু সাহিত্যিক এখলাসউদ্দিন আহমদের বিশেষ অনুরোধে সুফিয়া কামাল তাঁর ধানমন্ডির বাসায় বসে একরাতেই *ইতল বিতলের* সবগুলো ছড়া রচনা করেন। গ্রন্থটিতে নির্ধারিত কোন সন তারিখের উল্লেখ নেই, তবে সুফিয়া কামালের বর্ণনানুসারে 'ইতল বিতল' ১৯৫৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেন– 'সব খোকা-খুকুদের'।

শিশুমন কল্পরাজ্যের আলোয় খেলা করে। কোমল ও নরম মনের ভাবনাগুলো বিকশিত হয় উপযুক্ত পরিবেশ ও পঠনপাঠনের মাধ্যমে। সুফিয়া কামালের ছড়া শিশুমনের বিশেষ উপযোগী। ছড়া বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন। এর ছন্দময় দোলা ও ধ্বনি-মাধুর্য চিরকালই মানুষের মনে সহজেই অনুরণিত হয়। শিশুদের জন্য সুফিয়া কামালের আন্তরিক প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় তাঁর 'কচিকাঁচার মেলা' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। শিশুমনের কৌতূহলী ভাবনাগুলোকে অনুধাবনে আন্তরিক ছিলেন তিনি। পারিবারিক পরিমণ্ডলে স্বজনদের মুখে শোনা গল্প– আমির হামযা-হাতেম তাই, রত্নদ্বীপ; এবং আরবি, ফারসি, উর্দু ও ইংরেজি গল্প-কবিতা তাঁর শিশুমনে যে মুগ্ধতার আবেশ ছড়িয়ে দিয়েছিল তারই রস-নির্যাস এ-সমস্ত ছড়া। সুফিয়া কামাল তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন :

> তাঁর মুখেই (সুফিয়া কামালের বড় মামা) আমরা যত বাইরের দুনিয়ার খবর পেতাম। রাত্রের এশার নামাযের পর তিনি বাংলা উপন্যাস পড়ে মামানী-খালাআম্মাদের শোনাতেন। ভালো সংস্কৃত জানতেন তিনি। 'মেঘদূত', 'রাজতরঙ্গিণী', 'রঘুবংশ' পড়ে কি সুন্দর বাংলা করে শোনাতেন। আমি তখন খুবই ছোট, তবুও তাঁর পড়ার মাধুর্যটুকু এখনও যেন মনে গুঞ্জরণ করে। তার মুখে প্রথম প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'রত্নদ্বীপ' আমরা শুনি। আর যত রকম ইংরেজী, বাংলা, আরবী, উর্দু, ফার্সী গল্প কবিতা তিনি আবৃত্তি করে গল্প পড়ে শোনাতেন। সব রকমের খবরের কাগজ, মাসিক ত্রৈমাসিক সাপ্তাহিক দৈনিক পত্র-পত্রিকা তাঁর কাছে আসত। একবার বম্বে ক্রনিকল থেকে তিনি অদৃশ্য জানোয়ার 'বূনিপ'-এর কথা শোনালেন। আর আমার শিশুমন বহুদিন ধরে সেই অদৃশ্য জানোয়ারের ভয়ে, বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিল। কি রকম ভয়ে ভয়ে যে থাকতাম। আমার দুধ-মামা

আমার এই ভাব লক্ষ্য করে অনেক করে তবে আমার কাছ থেকে সব কথা শুনে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন : ও সব গল্পের কথা, ও রকম জানোয়ার আছে নাকি? আর থাকলেও এদেশে আসতে পারবে না। কেননা এটা সূর্যের দেশ, আলোর দেশ। ও সব জানোয়ার অন্ধকার দেশে হয়ত থাকতে পারে, আলোর দেশে নয়।[১]

তাঁর ছেলেবেলার প্রিয় শিশুসাহিত্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি এই সব পড়ি। আর 'শিশু' বলে একটা পত্রিকা বেরুতো। তারপর এলো 'সন্দেশ'। আমাদের জীবনে সন্দেশই আনন্দ এনে দিয়েছে, লেখার প্রেরণা জুগিয়েছে। শিশুদের মনের খোরাক জুগিয়েছে পত্রিকা। আজ পর্যন্ত এই বুড়ো বয়সে আমি এখনো সন্দেশ পড়ি।[২]

স্বরচিত ছড়া সম্বন্ধে তিনি বলেছেন :

ছড়া আমি লিখতাম না। এখলাস উদ্দীন বলে একটা ছেলে আছে ও-ই এসে আমাকে বললো আপনি একটা ছড়া দিবেন। আমি বই বের করবো। আমি বললাম, আমি কোনদিন ছড়া লিখিনি।

বলে না, এই কথা বললে হবে কেন? বই যখন লিখতে পারেন, তাহলে ছড়াও লিখতে হবে। আমি কালকে আসবো। একরাতে আমি ১২টা ছড়া লিখেছিলাম। এই নিয়ে ও একটা বই বের করলো।[৩]

ইতল বিতল সুফিয়া কামালের প্রথম ছড়াগ্রন্থ। গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত ছড়াগুলো শিশুর নিত্যদিনের আনন্দের খোরাক নিয়ে রচিত। বাংলা প্রকৃতি ও নিসর্গ থেকে আহরিত উপকরণই হচ্ছে এসব ছড়ার উপাদান; যেমন- গাঙ, বর্গা, পুঁটিমাছ, পুষি, কাঠবিড়ালী, ব্যাঙাচি, কাক, টিকটিকি, মোরগ, কাকড়া, মাছ, লালপলাশ, বিষ্টি, আতা গাছ, আম গাছ, পান পাতা প্রভৃতি।

প্রথম ছড়াটি এদেশের পুকুর ও জলাভূমিতে নিত্য দৃশ্যমান বিষয় নিয়ে রচিত :

পুঁটি মাছের ফট্ ফটানি
সারাপুকুর ভরে
তাইনা দেখে বগামামার
পরাণ কেমন করে,
বগামামার ধলা গা
ব্যাঙের পোনা ধরে খা।

শিশুমন প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে বোধ করে নিবিড় একাত্মতা । এই বোধই প্রকাশ পেয়েছে সুফিয়ার অধিকাংশ ছড়ায়। এরকম একটি ছড়া :

হুথুমা থুম ভুতুম ডাকে

---

[১] *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৬৬
[২] সাক্ষাৎকার : টইটম্বুর পরিবার, মার্চ ১৯৯২
[৩] প্রাগুক্ত

রাত বিরেতে গাছে
বিড়াল হয়ে একটা ভুতুম
টুলুর কাছে আছে।
দুধ খায় ভাত খায়
খায় মাছের কাঁটা
কুচকুচে তার গায়ের বরণ
চোখ দুটো তার ভাঁটা (৩)

প্রাচীন কিছু প্রচলিত ছড়ার চরণ ব্যবহার করেছেন সুফিয়া কামাল তাঁর কয়েকটি ছড়ায়। যেমন :

১. চিরল চিরল তেঁতুল পাতা
তেঁতুল বড় টক
মিষ্টি রেখে তেঁতুল খেতে
খুকুর বড় শখ। (ছড়া-৫)

২. বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
খোকন মনির পায়ে নূপুর
বিষ্টি পড়ে ঝিরঝিরিয়ে
খোকন ওঠে শির্‌শিরিয়ে
বিষ্টি পড়ে ঝর্ ঝর্
ওরে খোকন আয়রে ঘর
বিষ্টি পড়ে ঝুপ্ ঝুপ্
খোকন ঘুমায় চুপ্ চুপ্। (ছড়া-১৯)

শিশুর অবুঝ মন জীবজন্তুর সঙ্গে সখ্যভাব অনুভব করে। সুফিয়া কামাল শিশুতোষ ছড়া রচনায় সে দৃষ্টিকোণকেও প্রাধান্য দিয়েছেন। নিম্নে বর্ণিত ছড়াগুলোতে তারই স্বাক্ষর বিদ্যমান :

১. আগে যায় কাঠবেড়ালী
পিছে যায় বেঁজি
মাঝে খুকুর পাল্‌কি চলে
নয় সে হেঁচি পেঁজি। (ছড়া-৭)

২. ব্যাঙাচী ব্যাঙের পোনা
বাস রে কতো-যায় না গোনা
নাক নেই কান নেই
আছে চারটে ঠ্যাঙ
তাই নিয়ে দিন রাত্তির
করে গ্যাঙর গ্যাঙ। (ছড়া-১০)

৩. কাক বলে কা কা
হুতুম বলে থুয়া
শেয়াল বলে আমার সাধের
হুক্কা কেয়া হুয়া? (ছড়া-১১)

৪. গাধা এলো গান শোনাতে
কে বাজাবে বাঁশী
বলে ছুঁচো, আমার নানী
তাকেই নিয়ে আসি।
ছুঁচোর নানী কাঠ বিড়ালী
ল্যাজ উঁচিয়ে বেড়ায় খালি। (ছড়া-১২)

৫. টিকটিকিটা হতো বুঝি
গাঙ কুমিরের মামা
চারপেয়ে তাই দেয়াল বেয়ে
করছে উঠা নামা
কাঁকড়ার যে মাক্ড়া খালা
তৈরী করে সুতো
শখ হলো সে পরবে পায়ে
হিল্ তোলা এক জুতো।
বাপরে সে কি হিলের শব্দ
টিকটিকিটা হলো জব্দ। (ছড়া-১৩)

৬. ব্যাঙ নাচে ব্যাঙাচী নাচে
ঝিঁ ঝিঁ বাজায় বাজনা
জোনাকীরা জ্বালায় আলো
নিয়ে চলে খাজনা।
বনের রাজা সিংহ মহারাজ
উদবিড়ালের নানীর সাথে
বিয়ে যে তার আজ। (ছড়া-২৩)

ছড়া রচনায় সুফিয়া কামাল কখনও খনার মতোই প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করেছেন। তেমনি একটি ছড়া :

আতার পাতা তিতা তিতা
পানের পাতা ঝাল–
আতার পাতায় উকুন মারে
পানে করে লাল। (ছড়া-৬)

প্রকৃতিকে অনুষঙ্গ করে ছড়া নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন সুফিয়া কামাল, যেগুলো কেবলই হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ আনন্দের উৎস :

লালপলাশের পাখনা মেলা
বোশেখ মাসের দিন
চিল শকুনের গলা শুকায়
রোদে গা চিন্ চিন্
গুবরে পোকা গুব গুবিয়ে গুড় গুড়িয়ে আসে
পাখনা ছড়ায় গা মেলে দেয় শুকনো গরম ঘাসে
হঠাৎ সন্ধ্যাকালে–
উচ্চিংড়ে লাফিয়ে উঠে
চিম্‌টি কাটে গালে। (ছড়া-১৬)

ইতল বিতল গ্রন্থের নামাঙ্কিত ছড়াটি নিম্নরূপ :

ইতল বিতল গাছের পাতা
গাছের তলায় ব্যাঙের ছাতা
বিষ্টি পড়ে ভাঙে ছাতা
ডোবায় ডুবে ব্যাঙের মাথা। (ছড়া-৮)

সুফিয়া কামালের জনপ্রিয় এবং স্কুল পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত শিশুতোষ ছড়াটি নিম্নে উল্লিখিত হলো :

গোল করোনা গোল করোনা
ছোটন ঘুমায় খাটে
এই ঘুমকে কিনতে হলো
নওয়াব বাড়ীর হাটে,
সোনা নয় রূপা নয়
দিলাম মোতির মালা
তাইতে ছোটন ঘুমিয়ে আছে
ঘর করে উজালা। (ছড়া-২১)

ইতল বিতল ছড়া গ্রন্থটিতে স্বরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন :

ইতল বিতল। গাছের পাতা (৪+৪)
গাছের তলায় ব্যাঙের ছাতা (৪+৪)

অধিকাংশ ছড়ার পর্ব সংখ্যা দুই কিন্তু ১৬ সংখ্যক 'লাল পলাশের পাখনা মেলো' ছড়াটিতে পর্ব সংখ্যা-৪, যেমন :

গুবরে পোকা। গুব গুবিয়ে। গুড় গুড়িয়ে। আসে (৪+৪+৪+২)
পাখনা ছড়ায়। গা মেলে দেয়। শুকনো গরম। ঘাসে (৪+৪+৪+২)

শব্দালঙ্কারের প্রাধান্য লক্ষণীয় নিম্নোক্ত চরণগুলোতে :

১. গাঙের পানি ছল ছলায়
খোকন সোনা কলকলায় (*ইতল-বিতল*-ছড়া-২)

২. চিরল বিরল তেঁতুল পাতা (*ই. বি.* ছড়া-৫)
ইতল বিতল গাছের পাতা (*ই. বি*-৮)

৩. কাঁকড়ার যে মাকড়া খালা (*ই. বি*-১৩)

৪. গুবরে পোকা গুব গুবিয়ে গুড় গুড়িয়ে আসে (*ই. বি*-১৬)

৫. রান্না ঘরে কান্না শুনি
হান্না নাকি রাঁধছে (*ই. বি*-২৪)

ছড়া নিয়ে ছড়া, স্থানের নামকরণ সম্পর্কে ছড়া, পুষির মাছ খাওয়া, টেলিন কিসে খুশী প্রভৃতি বিষয়ে নির্মিত ছড়াগুলো শিশুমনের আনন্দ-উচ্ছ্বাসকে পরিপূর্ণ করার নিমিত্তেই রচিত। ছড়াকার হিসেবেও সুফিয়া কামালের সার্থকতা উজ্জ্বল। গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী আত্মজীবনীতে মানবমনের জটিল ও দ্বন্দ্বমুখর জিজ্ঞাসা, সরলতা, বিশ্বাস অর্থাৎ মানবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে উন্মোচনের পাশাপাশি সুফিয়া কামাল শিশুমনের সহজ আনন্দ, সহজাত উচ্ছ্বাসকেও রূপায়িত করেছেন *ইতল বিতল* ছড়াগ্রন্থে। ছড়াকার ও শিশুসাহিত্যিক এখলাসউদ্দিনের প্রেরণায় এই ছড়াগ্রন্থটি রচিত না হলে শিশু কিশোররা হয়তো সুফিয়া কামালের এই অসাধারণ সৃজন-প্রতিভার পরিচয়টি কখনোই জ্ঞাত হতো না। সুফিয়া কামালের মনন-চেতনায় যে কল্লোলিত নির্ঝরের প্রাণবান ধারা নিহিত ছিলো তা এ গ্রন্থের মধ্যেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

নওল কিশোরের দরবারে

নওল কিশোরের দরবারে সুফিয়া কামালের দ্বিতীয় শিশুতোষ রচনা। এ গ্রন্থে কবিতাসংখ্যা ১৮। গ্রন্থটি কবি উৎসর্গ করেছেন– 'শিশু কিশোরদের জন্য'। মূলত কিশোরদের নবচেতনায় উজ্জীবিত করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই কবিতাগুলো রচিত হয়েছে। কবিতার বিষয়-বৈচিত্র্যে কিশোর-উপযোগী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। দেশপ্রেমের শপথ, বিজ্ঞানের বিজয়বার্তা, স্বাধীনতার মুক্ত আহ্বান, ঐক্যের সুসংহতি, জাগরণস্পৃহা প্রভৃতি বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত কবিতাগুলো কিশোর মনের স্বপ্ন ও কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ক হয়েছে।

এদেশের শিশু-কিশোরদের দৃঢ়-মানস-গঠনে সুফিয়া কামালের নিরন্তর প্রয়াস কেবল ছড়া-কবিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী প্রজন্ম গঠনে তিনি অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সেক্ষেত্রে জীবদ্দশায় তিনি বিভিন্ন সংগঠন, সভা ও সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, শিশুদের কচি ও কোমল মনে দেশপ্রেমের বীজ বপন করতে না পারলে শিশুরা জাতির সম্পদরূপে গড়ে উঠতে পারবে না বরং দেশের বোঝা হিসেবে পরিণত হবে। সে লক্ষ্যেই তিনি এদেশের শিশুদের মানস-বিকাশের নিমিত্তে ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'কচি কাঁচার মেলা'। শিশু মনের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগাতে এই মেলার অবদান ছিলো অপরিসীম। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুফিয়া কামাল বলেন :

> এদেশের শিশুদের মধ্যে এতো প্রতিভা লুকিয়ে আছে তা 'কচি কাঁচার মেলা' জন্ম না নিলে প্রকাশ পেতো না। এই সেমিনার শিশু মনের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্বকীয়তা প্রকাশের সুযোগ দিয়েছে।[১]

এই মেলার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন :

> সত্যিকার আদর্শমূলক ও নতুন যুগের উপযোগী প্রগতিশীল শিশু সংগঠন এদেশে ছিল না। কচিকাঁচার মেলা নতুন চেতনা ও গতিশীল ভাবধারা নিয়ে আমাদের দেশের মাটিতে শিকড় গেড়েছে। এদেশের শিশুদের হাজার হাজার সমস্যা। এসব সমস্যা সংগঠনভাবে মোকাবেলা করার জন্যই আমরা কচি কাঁচার মেলা গড়ে তুলেছি।[২]

কচিকাঁচার মেলা সম্পর্কে তিনি ছিলেন আশাবাদী। সেজন্য তিনি বলতে পেরেছিলেন– 'আমি বহুদিক দিয়ে বহুজনের দানে ধন্য কিন্তু 'কচিকাঁচার মেলা আমার গৌরবের।' সংগঠনটির জন্মবিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৯৫৬ সালে পুরনো ঢাকার তারাবাগের বাড়িতে আমতলায় বসে গঠিত হয় কচি-কাঁচার মেলা' সংগঠনটি। এর জন্ম বিবরণ তিনি বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> আমার বাড়ির আঙ্গিনায় এক অঙ্কুর মেলি শাখা
> দিকে দিকে আজ ছড়ায়েছে তার প্রীতির পেলব মাখা
> পুষ্পসুরভী, ফল ফসলের আনন্দ ভরা আশা
> গৃহ ও পথের কচি কিশোরের মাঝে নিয়ে ভালবাসা
> পূর্ব দিগন্ত হতে পশ্চিম অয়নে যাত্রা তার
> বাংলার শিশু, মাটি মাখা দেহে জাগিয়েছে দুর্নিবার।[৩]

---

[১] মালেকা বেগম (সম্পা.), *রাজপথে জনপথে সুফিয়া কামাল*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৫-৮৬

[২] শামসুজ্জামান খান, স্বর্ণযুগের দিনগুলি, গৌরবোজ্জল তিন যুগ [১৯৫৬-৯২], কেন্দ্রীয় কচি কাঁচার মেলা স্মরণিকা, পৃষ্ঠা-১৯

[৩] আমাদের মেলা: কচি কাঁচার মেলা জাতীয় সম্মেলন স্মরণিকা, ১৯৭৯

কেন্দ্রীয় কচি কাঁচার মেলা সম্পর্কে শামসুজ্জামান খানের স্মৃতিচারণমূলক বর্ণনা ছিলো এরকম–

> কেউ কেউ বলেন 'স্বর্ণ-যুগ'। কথাটা বোধহয় ঠিকই। কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলার সে সময়টাকে আমিও স্বর্ণযুগ বলার পক্ষপাতি। ১৯৫০ সালে যে দশক শুরু হয়েছিল, তার মাঝামাঝি সময়ে অক্টোবরের এক নিরিবিলি বিকেলে তারাবাগের নির্জন কুটির প্রাঙ্গণে একটা স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল। নাকি একটা তাজা প্রাণবন্ত ফুল ফুটেছিল। যদি ফুল বলি তো তার ছিল পাঁচটি পাপড়ি। পাঁচটি পাপড়িকে আশ্চর্য দক্ষতা ও নিখুঁত নৈপুণ্যে এক সঙ্গে গেঁথে একটা ফুলের অবয়ব দিয়েছিলেন আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ পূর্ব বাংলার পাঁচজন খাঁটি বাঙালী। বেগম সুফিয়া কামালের মাতৃহৃদয়ের দরদী স্পর্শে যে ফুল প্রাণ পেয়েছিলো, তাকে দীঘল জীবন ও অপূর্ব প্রাণরস আহরণের শক্তি দিয়েছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ, ডক্টর আব্দুল্লাহ আল-মুতী ও দাদাভাই।
>
> সেই পাঁচটি পাপড়ির একটি ফুলই আমাদের সংগঠন : কচিকাঁচার মেলা। মেলার পাঁচটি শাখাই তো পাঁচটি পাপড়ি। সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, সমাজসেবা ও খেলাধূলা-এই সবগুলো পাপড়ির নিখুঁত বিন্যাস ও সম্মিলিত বিস্তার মেলার সকল শক্তি ও সম্ভাবনার মূল কথা।[১]

'কচিকাঁচার মেলা' সংগঠন থেকে একটি মাসিক শিশু সাহিত্য পত্রিকা 'কচি ও কাঁচা' ১৯৬৪ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের পর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। পাকিস্তানি শাসনামলে সংগঠনটি সরকারি রোষানলের শিকার হয়েছে অনেকবার। বিশেষত, সংগঠনটির বিভিন্ন তাঁবুর নামকরণ প্রসঙ্গে (উদয়ন, স্ফুলিংগ, অভিযাত্রী, অগ্রগামী) ক্ষিপ্ত হন জনৈক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ১৯৬৪ সালে এর অনুদান বন্ধ করে দেয়া হয়। ভৈরবে অধ্যাপক অজিত গুহকে প্রধান অতিথি করা হলে মেলার আবাসদানকারী ভৈরবের পাকিস্তান হাউজের মালিক লতিফ সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে সেখান থেকে 'কচিকাঁচা'র মেলার অফিস উঠিয়ে দেন। তিন যুগ ধরে টিকে থাকা এই সংগঠনটিকে নানা বিড়ম্বনার শিকার ও বৈরিতার রোষানলে পতিত হতে হয়েছে। কেবল দেশপ্রেম, উদ্যোক্তাদের মানসিক সাহসের জোরে এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

> কচি কাঁচার মেলার দীর্ঘ ৩৬ বছরের গৌরবের ইতিহাসের সাথে সুফিয়া কামালের গৌরবও মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।[২]

সোভিয়েত ইউনিয়নে ভ্রমণকালে সে দেশের শিশুদের সঙ্গীত শুনে ও দেখে সুফিয়া কামাল নিজ দেশের শিশু সংগঠন 'কচিকাঁচার মেলা' কে স্মরণ করেন এবং বলেন :

> প্রথমেই এলো শিশুরা– পাইওনিয়র হাউসের শিশুর দল। ফুলের মত সুন্দর। সারি বেঁধে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে। চোখ জুড়িয়ে মন জুড়িয়ে শিশুর দলের ছেলেমেয়েরা একসাথে যখন এল তখন আমার মনে পড়ল আমার দেশের 'কচিকাঁচার কথা'। কত প্রচেষ্টা আমরাও করেছি। এই

[১] শামসুজ্জামান খান, স্বর্ণযুগের দিনগুলি, গৌরবোজ্জ্বল তিন যুগ (১৯৫৬-৯২) কেন্দ্রিয় কচি কাঁচার মেলার স্মরণিকা, পৃষ্ঠা-১৯

[২] *ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, সুফিয়া কামাল*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩৩

পর্যায়ে উন্নীত হতে যে আমাদের কতকাল লাগবে। আল্লাহ্ই জানেন। আর জানেন দাদাভাই রোকনুজ্জামানের ভাগ্য।[১]

শিশুর বিকাশ সাধনে সুফিয়া কামাল সচেতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে জাতিকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। বর্তমানে সেরূপ উদ্যোক্তার অভাব অনুভব করে সুফিয়া কামাল স্মৃতিচারণ করে আক্ষেপ করেছিলেন এভাবে :

এখন আমার দুঃখ হয়, সেদিনের মহিলারা নিজের নিজের সন্তান নিয়ে সম্মেলনে বা শিক্ষাশিবিরে যোগ দিয়েছেন। সুশৃঙ্খলভাবে সন্তানদের পরিচালিত করেছেন, আজকাল আর তেমনটি করে কাউকে কাছে পাওয়া যায় না। সেই পরিবেশও নেই। নিরাপত্তাহীন এই দেশের মাঠ ময়দান আজ ছেলেমেয়েদের আনন্দ-কাকলীতে ভরে ওঠে না। তাদের অবসর অপরাহ্ণ কাটে টিভির সামনে বসে, যান্ত্রিক বিনোদনে। শরীরচর্চার সুযোগ নেই, বাড়ীর চার দেয়ালের মধ্যেই তাদের জগৎ বন্দী।[২]

সুফিয়া কামাল ভবিষ্যৎদ্রষ্টা রূপে জাতির অমঙ্গলকে চিহ্নিত করে চিন্তিত ছিলেন। শিশু-কিশোরদের সঠিকভাবে পরিচালিত করতে অপারগ হলে জাতি ধ্বংসের মুখে পতিত হবে। তাই তিনি শিশুদের জন্য সঠিক দিক-নির্দেশনাও প্রদান করেছেন তাঁর ছড়া ও কবিতায়। *নওল কিশোরের দরবারে* সে নির্দেশনারই স্বাক্ষর বহন করে।

এ গ্রন্থের প্রথম কবিতাটিতে সুফিয়া কামাল কিশোরচিত্তের কল্যাণকামী ভাবনাকে রূপায়িত করেছেন। কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা হলো :

ছোট মানুষ ছোট্ট হাতে ছোট্ট লিখন লেখে
ছোট্ট মনের বড্ড আশার ছবিটি যায় এঁকে।
সুমুখ পানের দীঘল পথে জ্বেলে আশার আলো,
সকল জনকে পথ দেখাবে সবায় বেসে ভালো।
ফুলের মতো নদীর মতো মাটির মতো মন
আমার দেশের ছেলেমেয়ে করেছে এই পণ।
(ছোট্ট মনের বড্ড আশা)

'খেলাঘর' কবিতাতে সুফিয়া কামাল শিশুদের সাথে একাত্ম হয়ে শিশুদের আনন্দ ভাগ করে নিতে চান:

খেলাঘরের ঘরের মাঝে
দুনিয়া এসে জড়ো,
খেলুড়েরা এক একজন
কেউ-কেটা নয়-বড়ো।

[১] *সুফিয়া কামাল রচনা সংগ্রহ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫২৫
[২] গৌরবোজ্জ্বল তিন যুগ, প্রবন্ধ, সুফিয়া কামাল, পৃষ্ঠা-৫

* * *

তাইত এলাম খেলাঘরে
বয়েস ভুলে গিয়ে
ভুলব হেথায় 'বড়'র জ্বালা
ছোট সাথী নিয়ে। (খেলাঘর)

'নওল কিশোরের দরবারে', তোমরা আমীর নওয়াব বাদশা' 'নওল কিশোর কিশোরীরা', 'আশায় বক্ষ বাঁধি', 'কপোতেরা দিবে হানা'– প্রভৃতি কবিতায় কিশোরদের প্রতি কবির দৃঢ় প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে। কারণ কবি জানেন এই কিশোররাই ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জাতির কর্ণধার । তাই তিনি কিশোরদের দুরন্ত সাহসী, বিজয়ী ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারকরূপে চিহ্নিত করেছেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তুষ্ট করার অনাবিল প্রত্যাশা থেকে কবি লিখেছেন :

বেতার হইতে সেতার বাজিল,
শুনাইল কত গান–
তা'তেও তোমরা হলে নাকো খুশী,
করিয়াছ অভিমান।
তোমাদের তরে আলাদা কবিতা
গল্প লিখিলে তবে
মনোমত যদি হয় এ কপালে
তোমরা তুষ্ট হবে।
বড় সোজা নয় রুষ্ট হইলে
তুষ্ট করিতে চাওয়া
ভয়ে ভয়ে তাই ছাড়িয়া দিলাম
বেতার অফিস যাওয়া।
এতদিন পরে নতুন বছরে
আবার এলাম চলি
কী কারণে– তাই আড়ালে থাকিয়া
দূর হতে শোনো বলি;
আমাদের যুগে আমরা যখন
খেলেছি পুতুল খেলা,
তোমরা এ যুগে সেই বয়সেই
পড়ালেখা কর মেলা। (নওল কিশোরের দরবারে)

কিশোরদেরকে কবি সম্মানিত করেছেন তাঁর কবিতায় :

তোমাদের তরে কবিতা লিখিব
সে কি আর সোজা কাজ !

তোমরা আমীর নওয়াব বাদশা
ক্ষুদে ক্ষুদে মহারাজ।
* * *
শির উঁচু করি তোমরা দাঁড়ালে
ছোট হয় হিমালয়,
তোমাদের চলা পথের যে ধূলা
ঝড়েরে হারায়ে বয়। (তোমরা আমীর নওয়াব বাদশা)

সময়ের বহমান ধারায় শিশুচিত্তে সংযোজিত হয় জ্ঞান, যুক্তি ও প্রজ্ঞা। ক্রমশ তারা সত্য ও কল্পনার মধ্যে প্রভেদ করতে শেখে। এই ভাবনাটিকে উপজীব্য করে সুফিয়া কামাল রচনা করেছেন কবিতার পঙ্‌ক্তি। যেমনঃ

বসন্তে সব কচি পাতায়
চৈতি হাওয়ার কাঁপন লাগে,
কাঁচা ঘুমের মাঝখানেতে
নতুন দিনের স্বপন জাগে।
ঘুমপাড়ানি গান থেমে যায়,
প্রশ্ন আসে হরেক রকম :
কোকিল কেন কু- কু ডাকে,
পায়রা কেন বকম বকম ?
* * *
আজকের দিনে খোকাখুকু
রূপকথায় আর ভোলে নাকো
তাদের কাছে সত্যি কথার
জবাব দিতে তৈরী থাকো। (তবু কিছু গল্প ছড়া)

স্বাধীনতার রূপকার যাঁরা, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনসহ স্বাধীনতার গান গেয়েছেন তিনি কয়েকটি কবিতায়, শিশু-মনস্তাত্ত্বিক হিসেবে সুফিয়া কামালের পর্যবেক্ষণ শক্তি কত বেশি যথাযথ, তা চিহ্নিত হয়েছে কবিতাগুলোতে। 'উঠলো বেজে বাঁশী', 'সবুজ পাতারা', 'মুকুলের বুকে বুকে' কবিতাগুলোতে স্বাধীনতা, মুক্তি ও বিজয়ের জয়গান করা হয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

১. খোকন-খুকুর জন্মদিনে
সবার মুখে হাসি
বাংলাদেশের জন্মদিনেও
উঠলো বেজে বাঁশী।
* * *
আজাদ দেশের আলো হওয়ায়

Dhaka University Institutional Repository

আজাদ শিশুর দল
সূর্য-চন্দ্র-তারার আলোয়
করছে যে ঝলমল।(উঠলো বেজে বাঁশী)

২. আঁধার হতে আলোক পানে
মেলছে তারা আঁখি
মেলছে ডানা আলোর পানে
মুক্ত আলোর পাখী।
সবুজ শাখায় সবুজ পাতা
জানায় ইশারা;
আজ আজাদী ! মুক্তি দিবস
বাধা বন্ধ হারা। (সবুজ পাতারা)

৩. আজ তবে এসো বাহিরিয়া
সবুজ পতাকা হাতে নিয়া
দুর্বার যে প্রাণশক্তি ভরে
অন্ধকার হতে মুক্ত করে
এনেছে জীবন–
মুক্ত আনন্দের স্বাদে চেতনার প্রথম স্পন্দন।
দিকে দিকে জাগাইয়া সাড়া
এই দিনে এনেছিল যারা
তাদের স্মরণে
পতাকা উড়ায়ে দাও তোরণে তোরণে। (মুকুল বুকে বুকে)

সুফিয়া কামাল শিশু-কিশোরদের উপমিত করেছেন 'ফুলকি'র সাথে, যা ক্ষুদ্র কিন্তু অসাধারণ আলোক–দ্যুতি, এবং যা পরিবেশ ও প্রতিবেশকে করে তোলে আলোকিত, কিশোররাও তেমনি। দুর্বলের পাশে সবল হয়ে দাঁড়াবে এই আলোর ফুলকি। নজরুল ইসলাম কিশোরকে বলেছেন 'সকাল বেলার পাখি'। সুফিয়া কামাল বলেছেন এভাবে :

ঘন আঁধারের রাতে
এতোটুকু ফুল্‌কি
যতটুকু পারে দেয়
আলো। আর ভুল কি?
* * *
আলো হোক্ এতটুকু!
তবু সে তো আলো, তাই
উজ্জ্বল হয়ে তার
উঠতে তো বাধা নাই। (ফুলকি)

ঈদ বিষয়ক দুটি কবিতা 'নীল আকাশে চাঁদের নাও' এবং 'মাটির চাঁদেরা'। কবিতাগুলোতে উৎসবময় দিনে ধনী দরিদ্রের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে নবীন কিশোরদের অগ্রগামী হওয়ার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে :

১. তিরিশ দিনের রোজার পরে
ঈদ আসছে কাল
নীল আকাশে চাঁদের নাও–
খুশীর টাল মাটাল!
ছোট চাঁদের মিষ্টি হাসি
সৃষ্টি ভরে সুখে
কচি-কাঁচা ঝাঁপিয়ে পড়ে
খুশীতে ম'ার বুকে। (নীল আকাশে চাঁদের নাও)

২. খুঁজে দেখ আজ তোমাদের মতো
সকল ঘরে
ঈদের খুশীর হাসির আলোক
দিল কি ভরে ? ...
সবার খাবার ভাগ করে খাও
সবার সাথে,
তোমার মুঠির কিছুখানি দাও
অন্য হাতে। (মাটির চাঁদেরা)

একতা ও সাম্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ সুফিয়া কামাল সমবায় উৎসব উপলক্ষে রচনা করেন 'মিলিত সেবা ও সাম্য প্রীতিতে' কবিতা। এ কবিতাটিতে মানবতার, একতার, সফলতার বর্ণনা রয়েছে। একই বোধের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'একতা' কবিতাটির মধ্যেও। কবিতা দুটোর কয়েকটি চরণ তুলে ধরা হলো :

১. শতেকের সাথে শতেক হস্ত
মিলায়ে একত্রিত
সব দেশে সব কালে কালে সবে
হয়েছে সমুন্নত। ...
মানব জীবন! শ্রেষ্ঠ, কঠোর
কর্মে সে মহীয়ান,
সংগ্রামে আর সাহসে প্রজ্ঞা
আলোকে দীপ্তিমান।
(মিলিত সেবা ও সাম্য প্রীতিতে)

২. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালু কণা
সৃজে পর্বত,
পদে পদে গড়ে উঠে
প্রসারিত পথ।
তৃণে তৃণে শ্যাম করে
উষর প্রান্তর
বিন্দু বিন্দু বারি লয়ে
বহিছে সাগর।
পুষ্পে পুষ্পে গাঁথা হয়
জয় ও যশমালা
অঞ্জলি ভরিয়া দানে
পূর্ণ করে ডালা।
... ...
সমবেত শক্তি নিয়ে
যে জাতি মহান
সমগ্র বিশ্বের মাঝে
লভে সে সম্মান। (একতা)

'একতা' কবিতাটি সুফিয়া কামালের জীবনাভিজ্ঞতারই ফসল। দেশবিভাগ, বিদেশ ভ্রমণ, একাত্তরের যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনার সমবায়ে তাঁর পরিণত মানস একতার অপ্রতিরোধ্য-শক্তিকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। আর এই একতার শক্তিকে কিশোর-মনে রোপিত করা দেশ ও দশের জন্য জরুরি– এই বোধেই কবিতাটি কিশোর-গ্রন্থে সংকলিত করেছে তিনি।

জাগরণমূলক কবিতা 'নওল কিশোর কিশোরীরা', 'আশায় বক্ষ বাঁধি, 'কপোতেরা দিবে হানা'। সুফিয়া কামাল আজীবন অন্যায় ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে মানুষকে জাগাতে চেয়েছেন। তাঁর গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনীতে তারই ছায়াপাত ঘটেছে। কিশোরদেরও তিনি সেই ব্রতে দীক্ষিত করতে চান :

১. নয়া যামানার নওল কিশোর
গান গেয়ে উঠো জাগি,
মুমূর্ষু ধরা সুন্দর হোক
নবীন পরশ লাগি। (নওল কিশোর কিশোরীরা)
* * *

২. বারে বারে আসে আঁধি,
তবুও নবীন সূর্যালোকের আশায় বক্ষ বাঁধি।
জাগি নিশীথের শেষে,

নবীন নওল কিশোর কিশোরী
তোমরা দাঁড়াবে এসে।(আশায় বক্ষ বাঁধি)

৩. সত্য যেখানে মানুষের মনে মুক্তি-জ্ঞানের শিখা
জ্বলিয়া জ্যোতির্লিখা
জাগিছে অনির্বাণ
শ্বেত কপোতেরা এনে দেবে সেই
নব পথ সন্ধান।(কপোতেরা দিবে হানা)

নওল কিশোরের দরবারে কাব্যগ্রন্থটিতে দুটো ছড়ার সন্নিবেশ লক্ষ করা যায়। *ইতল বিতল* ছড়া-গ্রন্থে যে ছড়াগুলো অন্তর্ভুক্ত তা থেকে এ-দুটো কিছুটা ভিন্নমাত্রার। মধুর রসে ভরা ছড়া দুটিতে সামঞ্জস্যহীন কথামালা জুড়ে দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বৈচিত্র্য,– যা কিশোর-পাঠকের আনন্দের খোরাক হিসেবে অতুলনীয়।

নওল কিশোরের দরবারে কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোতে প্রাধান্য পেয়েছে স্বরবৃত্ত ছন্দ। অধিকাংশ কবিতার চরণই ৪ পর্বে বিন্যস্ত। যেমন :

১. ছোট মানুষ। ছোট হাতে। ছোট লিখন। লেখে, ৪+৪+৪+২
(ছোট মনের বড্ড আশা)

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ লক্ষণীয় বেশ কয়েকটি কবিতায় :

১. আজ তবে এসো। বাহিরিয়া ৬+৪
সবুজ পতাকা। হাতে নিয়া ৬+৪
(মুকুলের বুকে বুকে)

২. আজ সকলেই। বাদশা আমীর।
ঈদের দিন। ৬+৬+৫

বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উপমা নির্মাণে সুফিয়া কামাল সিদ্ধহস্ত। শিশু-কিশোরের মনোগ্রাহী ও হৃদয়গ্রাহী ভাষা, শব্দ, উপমা-অলঙ্কার নির্মাণে গ্রন্থ দুটি পেয়েছে বিশেষ মাত্রা। নিচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখিত হলো।

অর্থালঙ্কারের প্রয়োগ রয়েছে নিম্নোক্ত চরণগুলোতে :

১. ফুলের মতো নদীর মতো মাটির মতো মন.
(ছোট মনের বড্ড আশা :*নওল কিশোরের দরবারে*)

২. আযাদ দেশের শৃঙ্খল টুটা
তোমরা মুক্ত পাখী। (তোমরা আমীর নওয়াব বাদশা : *নওল কিশোরের দরবারে*)

৩. আকাশের চাঁদ ডুবে যায় যাক
তোমরা হাসে
মাটির চাঁদেরা। (মাটির চাঁদেরা : *নওল কিশোরের দরবারে*)

বস্তুত, সুফিয়া কামাল শিশু-কিশোরদের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ দুটি রচনা করলেও তার মূল উদ্দেশ্য ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের বিকাশ সাধন। সে প্রচেষ্টারই সার্থক রূপায়ণ *ইতল বিতল* ও *নওল কিশোরের দরবারে* কাব্যগ্রন্থদ্বয়। তিনি শিশুদের ভালোবাসতেন এবং শিশুদেরকে বিশেষ কতগুলো প্রতীকী অর্থে আখ্যায়িত করেছেন যেমন–তিনি শিশুদের বলেছেন–ফুলকি, শ্বেত কপোত, ভোরের পাখি, সবুজ পাতা, মাটির চাঁদ, কচি কাচাঁ। বস্তুগত সীমার উর্ধ্বে উঠে মানসিক বিকাশসাধন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের লক্ষ্য হবে এবং তারা সাধনা ও শক্তির সমন্বয়ে গড়ে তুলবে দেশ ও জাতিকে; সুফিয়া কামাল সেই দিক নির্দেশনাই রেখে গেছেন তাঁর গ্রন্থ দুটিতে। বাংলা শিশুসাহিত্যে সুফিয়া কামালের অবদান অপরিসীম এবং তাঁর শিশুতোষ রচনা যথার্থই কালজ এবং কালোত্তীর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯) এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের আদর্শিক প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে তিনি একদিকে যেমন নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার থেকেছেন, অন্যদিকে তেমনি সাহিত্যসাধনায় প্রয়োগ করেছেন তাঁর অকৃত্রিম নিষ্ঠা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবর্জিত, কিন্তু স্বশিক্ষায় সুশিক্ষিত সুফিয়া কামাল সাহিত্যচর্চায় সক্রিয় ছিলেন দীর্ঘকাল; রচনা করেছেন কবিতা, গল্প, শিশুতোষ কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, আত্মজীবনী ও দিনলিপি। তাঁর কর্মপ্রবাহ ও রচনাসম্ভার তাঁকে এক বিশিষ্ট মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করেছে।

সুফিয়া কামালের প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ *কেয়ার কাঁটা* (১৯৩৭)। এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে ১৫টি ছোটগল্প। গল্পগুলোর বিষয় আটপৌরে। গল্পের নারী চরিত্রগুলো দীপ্তিময়, উজ্জ্বল। নারীর প্রাজ্ঞতা, স্থিরতা, ধীরতা ও সততার পরিচয়ে গল্পগুলো সমৃদ্ধ। নর-নারীর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, সামাজিক ও পারিবারিক বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রভৃতির টানাপোড়েনে ক্ষত-বিক্ষত চরিত্রগুলো একসময় শুদ্ধ জীবনবোধে কীভাবে স্থিত হয়েছে– তা প্রায় প্রত্যেকটি গল্পে বিন্যস্ত করেছেন সুফিয়া কামাল। বিষয় ও প্রকরণে গল্পগুলো মধুর ও সার্থক। এগুলো বাংলা গল্পধারার বিশিষ্ট সম্পদ।

সুফিয়া কামালের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ১১টি, তন্মধ্যে দুটি শিশুতোষ– *ইতল বিতল* (১৯৬৫) ও *নওল কিশোরের দরবারে* (১৯৮১)। এ কাব্যদ্বয়ে তিনি শিশুচিত্তের কল্পনাদীপ্ত কৌতূহলকে উজ্জীবিত করেছেন। এদেশের ফুল-ফল, পাখ-পাখালি, নদী-গাঙ প্রভৃতি পরিচিত বিষয় অনবদ্য ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করেছেন তিনি। শিশুমনের কৌতূহল নিবৃত্তিতে এ দুটো কাব্যের তাৎপর্য অসামান্য।

শিশুকাব্য ব্যতীত অন্যান্য কাব্যে স্থান পেয়েছে মানবমনের অনুভূতি-নির্ভর প্রেম, বিরহ, প্রকৃতি-চেতনা। তিরিশোত্তর কবিদের মতো নৈরাশ্যে সমর্পিত না হয়ে তিনি নির্মল বিশুদ্ধ জীবনের স্তবকীর্তন করেছেন। প্রেম তাঁর কাব্যে জীবন-প্রেরণার প্রতীক; বিরহ নৈরাশ্য নয়, উত্তরণের পন্থা। প্রকৃতির আশ্রয়ে প্রেম ও বিরহভাবনা ব্যক্ত করেছেন কবি। *সাঁঝের মায়া* (১৯৩৮), *মায়া কাজল* (১৯৫১), *মন ও জীবন* (১৯৫৭)– এ কাব্যত্রয়ে অনুরণিত প্রেম-বিরহভাবনা পরবর্তী সময় পরিসরে জগত ও জীবনমুখী ভাবনায় প্রসারিত। *উদাত্ত পৃথিবী* (১৯৬৪) ও *দীওয়ান*(১৯৬৬) কাব্যগ্রন্থে প্রেম-বিরহ-প্রকৃতি চেতনার পাশাপাশি জাগরণমূলক কবিতা সংযোজিত হয়েছে। *প্রশস্তি ও প্রার্থনা* (১৯৬৮) এবং *অভিযাত্রিক* (১৯৬৯)

কাব্যগুলোতে মানবকল্যাণ, বীরধর্ম, স্বদেশপ্রেমের মাহাত্ম্য ধ্বনিত হয়েছে। সে সাথে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিকতামূলক কবিতাও রচিত হয়েছে। *মোর যাদুদের সমাধি পরে* (১৯৭২) কাব্যটিতে প্রধানত শহীদ-মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে।

এই এগারোটি কাব্যগ্রন্থ ব্যতীত আরো ৫৬টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে *অগ্রন্থিত কবিতা* শিরোনামের কাব্য। এ কাব্যের কবিতাগুলোতে কবির জীবনাভিজ্ঞতার পরিপক্ব ছাপ লক্ষণীয়।

সুফিয়া কামালের গদ্যবিষয়ক অন্যতম রচনা ভ্রমণকাহিনী *সোভিয়েটের দিনগুলি* (১৯৬৮)। ৮ই মার্চ ১৮৬৭ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল উইমেনস ডে'-তে পূর্ব পাকিস্তানের মহিলা প্রতিনিধি হিসেবে আমন্ত্রিত হন সুফিয়া কামাল। তিনি ৬ মার্চ থেকে ২৩ শে মার্চ পর্যন্ত রাশিয়াতে অবস্থান করেন। স্বদেশের বাইরে ভিন্ন সমাজ-পরিবেশে উপস্থিত হয়ে সুফিয়া কামাল অর্জন করেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা। মহিলা সমাবেশে নেত্রী নীনা পাপোভা, মহাকাশচারিণী ভ্যালেনতিনা তেরেশকোভার সাথে পরিচয়-আলাপ, এরূপ বহুবৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতায় বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হন তিনি। সোভিয়েত রাশিয়ায় নারীদের অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সন্তানের দায়িত্বভার সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সমন্বিত উদ্যোগ স্বচক্ষে অবলোকন করে সুফিয়া কামাল একদিকে যেমন আনন্দিত হয়েছেন; অন্যদিকে স্বদেশের পশ্চাৎপদতায় হয়েছেন বেদনা-বিচলিত এবং সে সঙ্গে প্রত্যাশা করেছেন স্বদেশের শান্তি-সাম্য-উন্নতি। *সোভিয়েটের দিনগুলি* বাংলা গদ্য সাহিত্যে ভ্রমণ বিষয়ক শাখাকে সমৃদ্ধিশালী করেছে নিঃসন্দেহে।

একালে আমাদের কাল (১৯৮৮) সুফিয়া কামালের আত্মজৈবনিক গ্রন্থ। জীবনের উত্থান-পতনের অনিবার্য সত্যচিত্র মুদ্রিত হয়েছে এ গ্রন্থে। সুফিয়া কামালের কবি হয়ে ওঠার কাহিনী, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সান্নিধ্যলাভ, কালাবদরের নির্মমতায় শায়েস্তাবাদের নানাবাড়ির বিলুপ্তি প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে স্মৃতিচারণধর্মী এ গ্রন্থে। গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত অলৌকিক কয়েকটি প্রসঙ্গ। এই গদ্যরচনাটির ভাষা কবিত্বময় ও আবেগপূর্ণ। গ্রন্থটি একটি বিশেষ সময়কালের বিশ্বস্ত প্রতিচিত্র।

একাত্তরের ডায়েরী (১৯৮৯) সুফিয়া কামালের দিনপঞ্জিধর্মী গদ্যসাহিত্য। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়প্রবাহ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন এ গ্রন্থে। গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। ১৯৭০ সালের ৩০ ডিসেম্বর হতে ১৯৭১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের ঘটনাপ্রবাহ লিপিবদ্ধ করেছেন সুফিয়া কামাল। যুদ্ধের নির্মমতা, ভয়াবহতা, বীভৎসতা, পাশবিকতা প্রদর্শিত

হয়েছে তাঁর এ দিনলিপিতে। কবির জীবনাশঙ্কা, হানাদার বাহিনীর নজরদারি সর্বস্তরের মানুষের উপদ্রুত জীবনযাপন অকপট সরল বর্ণনায় কবি বর্ণনা করেছেন এ গ্রন্থে। কবির ভাষা ও বর্ণনার গুণে গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে অনবদ্য। একাত্তরের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গ্রন্থটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আলোচ্য গ্রন্থসমূহ

বর্ণক্রম-অনুসারে

অগ্রন্থিত কবিতা : *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ* : প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০০২, পৃ. ১-৩৮

অভিযাত্রিক : *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ* : প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১-২৪০

ইতল বিতল : *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ* : প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩-৩৬৯

উদাত্ত পৃথিবী : *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ* : প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৯০

একাত্তরের ডায়েরী : তৃতীয় প্রকাশ, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭

একালে আমাদের কাল : *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ* : প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৭-৫৯৪

কেয়ার কাঁটা : *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ* : প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩-৫১৫

নওল কিশোরের দরবারে : *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ* : প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১-৩৯১

দীওয়ান : *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ* : প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-১৪৭

প্রশস্তি ও প্রার্থনা : *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ* : প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯-২০০

মৃত্তিকার ঘ্রাণ : *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ* : প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১-২৯৫

মোর যাদুদের সমাধি পরে : *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ* : প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭-৩২০

সাঁঝের মায়া : সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩৮

সোভিয়েটের দিনগুলি : *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ* : প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৭-৫৫৬

স্বানির্বাচিত কবিতা সংকলন : সুফিয়া কামাল, দ্বিতীয় প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থ

আনিসুজ্জামান : বাঙালি নারী : সাহিত্যে ও সমাজে, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ২০০০

আনিসুজ্জামান : মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৬৯

আবদুল কাদির (সম্পা.) : রোকেয়া রচনাবলী, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৯৯

আবদুল মান্নান সৈয়দ : বেগম রোকেয়া, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৮৩

আবুল কাসেম ফজলুল হক : *আধুনিকতাবাদ ও জীবনানন্দের জীবনোৎকণ্ঠা,*প্রথম প্রকাশ, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৩

আবুল কাসেম ফজলুল হক : *বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও উত্তরকাল,* প্রথম প্রকাশ,প্রথম প্রকাশ, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৮

নীরদচন্দ্র চৌধুরী : বাঙালী জীবনে রমণী, পঞ্চদশ মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ১৪১০

ফরিদা আখতার, সীমা দাস সীমু ও সাইদা আখতার (সম্পা.) : *শত বছরে বাংলাদেশের নারী,* দ্বিতীয় সংস্করণ, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা ২০০৩

বিনয় ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, প্রথম ওরিয়েন্ট লংম্যান সংস্করণ, কলকাতা ১৯৭৩

বেবী মওদুদ (সম্পা.) : নারী নেতৃত্ব, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পারিজাত প্রকাশনী, ঢাকা ২০১০

মালেকা বেগম (সম্পা.) : *রাজপথে জনপথে সুফিয়া কামাল,* প্রথম প্রকাশ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৭

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (অনূদিত): বাংলাদেশের মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৬৯

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (আধুনিক যুগ), একাদশ মুদ্রণ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা ২০১০

মুহম্মদ শামসুল আলম : *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্যকর্ম,* প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০০৯

মোরশেদ শফিউল হাসান : *বেগম রোকেয়া : সময় ও সাহিত্য,* প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৮২

মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ (সম্পা.) : রোকেয়া মানস ও সাহিত্য মূল্যায়ন, প্রথম প্রকাশ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ২০১৪

লুৎফর রহমান রিটন (সম্পা.) : সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ, প্রথম প্রকাশ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ২০০০

সন্তোষ গুপ্ত (সম্পা.) : *বেগম সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ,* প্রথম প্রকাশ, সমুদ্র প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা ২০০১

সাঈদ-উর রহমান : পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১৯৮৩

সেলিনা খালেক ও আয়েশা খানম (সম্পা.) : *মহিলা সমাচার,* সুফিয়া কামাল সংখ্যা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা ২০০০

সেলিম জাহাঙ্গীর, ড. : *সুফিয়া কামাল,* বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৯

সেলিম জাহাঙ্গীর, ড. : *সুফিয়া কামাল,*দ্বিতীয় প্রকাশ, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র, ঢাকা ২০০৭

সৈয়দ শামসুল হক (সম্পা.) : *জননী সাহসিকা বেগম সুফিয়া কামাল* : শেষ প্রণতি, প্রথম প্রকাশ, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা ২০০০

হারুনার রশীদ ভূঁইয়া (সম্পা.) : *বেগম রোকেয়া রচনাসমগ্র,* প্রথম প্রকাশ, হাসি প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৪